বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে, গত কয়েক বছর যাবৎ পাঁচ শতাধিক উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ও-গুলি এক অসাধু জুয়া চোরের কাণ্ড। আমার লেখার জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহু লোক ওই নামে পুস্তক প্রকাশ করে আমার পাঠকবর্গকে প্রতারণা করছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

বিমল মিত্র

"মর্জি খুদা কী
খেল্ নসীব কা
ইজ্জৎ ইনসানো কী..."

সোমনাথ বললে—ভাই, যতো দিন যাচ্ছে ততোই দেখছি সমস্ত মানুষ কেবল একটা জিনিসের পেছনেই ছুটছে। সে জিনিসটা হচ্ছে—টাকা। যেদিন থেকে টাকা আবিষ্কার হয়েছে সেইদিন থেকেই অবশ্য এটা ছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটার পর থেকেই সব লোকের এই টাকার পেছনে ছোটবার নেশাটা দিন-দিন যেন আরো বেড়ে যাচ্ছে। দরকার থাক আর না-থাক আমার আরো টাকা চাই। আমার চেয়ে তোমার বেশি টাকা আছে, সুতরাং আমারও বেশি টাকা থাকা দরকার।

আমি বললাম—তোমাকে আমি গল্প শোনাতে বলেছি, তুমি অতো তত্ত্ব-কথা শোনাচ্ছো কেন? অতো তত্ত্ব-কথা তোমার কাছে কে শুনতে চেয়েছে?

সোমনাথ একজন সি-বি-আই অফিসার, তার কাছে অনেক 'কেস্' আসে। ঘুষখোর ধরতে গেলে তাকে অনেক লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। যখনই আমার গল্পের দরকার হয়েছে, তখনই আমি সোমনাথের শরণাপন্ন হয়েছি। সে কখনও আমায় নিরাশ করেনি। তাই এবারও আমি তার কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু গল্প শোনাবার বদলে সে আমাকে ওইসব তত্ত্ব-কথা শোনাতে লাগলো। আমি অধৈর্য হয়ে উঠলাম। বললাম—তোমার কাছে গল্প থাকে তো বলো। নইলে আমি বাড়ি চলে যাই—

সোমনাথ বললে—আরে, তুমি অতো রেগে যাচ্ছো কেন? গল্প তো বলবোই, কিন্তু গল্পের আগে তো একটা ভূমিকা থাকা দরকার। সেই ভূমিকা শুনেই তুমি রেগে গেলে?

বললাম—ভূমিকা-টুমিকার কথা তোমার ভাবতে হবে না। সে তোমায় বলতে হবে না। সে আমি গল্প লেখবার সময়ে নিজেই ঠিক

জায়গায় বসিয়ে নেব। তুমি স্রেফ গল্পের কাঠামোটা বলে যাও, আমি সেই কাঠামোর ওপর দরকার-মতো খড়-মাটি বসিয়ে নেব'খন—

সোমনাথ মানে সোমনাথ গাঙ্গুলী। ছোটবেলায় আমরা একই স্কুলে পড়েছি। তবে এক ক্লাশে নয়। সে যখন ক্লাশ ফোর-এ পড়তো, আমি তখন ক্লাশ নাইনে পড়তাম। তবে থাকতুম একই পাড়ায়, খেলা-ধুলো করতুম একই ক্লাবে।

পরে আমি চলে গেলাম লেখার দিকে, সে চলে গেল পুলিশের চাকরিতে। সেখান থেকে চলে গেল 'সি-বি-আই'তে। তার মানে 'সেন্ট্রাল ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন'-এ।

আগে সে আমাকে অনেক গল্প দিয়েছে। তার কাছে অনেক লোক নানা অভিযোগ নিয়ে আসে। সেই অভিযোগের যে সমস্তগুলোর প্রতিকার সে করতে পেরেছে, তা নয়। প্রতিকার করতে চেষ্টা করেছে মাত্র।

কিন্তু সেই গল্পগুলো পেয়ে গল্প-লেখক হিসেবে আমার লাভ হয়েছে।

এবারেও সেই সূত্রে তার কাছে আমার যাওয়া।

কিন্তু গিয়েই ওই টাকার কথা শুনতে হলো।

সোমনাথ বললে—গল্পের ভূমিকা শুনে তুমি ভয় পেয়ো না। দরকার হলে তুমি ওই ভূমিকাটা বাদও দিতে পারো। কিন্তু জেনে রেখো সব পাঠকই পাঠক নয়। সব লেখক যেমন লেখক নয়, পাঠকদের বেলাতেও ঠিক তাই। তবু লেখকদের চেয়ে পাঠকদের সংখ্যা বেশি হলেও যারা ভালো পাঠক তাদের রায়েই ভালো লেখকরা অমর হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করতো, আজ তারা কোথায় গেল?

তারপর একটু থেমে নিয়ে আবার বললে—এবার একটা বিচিত্র ঘটনা দিয়েই আমার গল্প আরম্ভ করি। শোন—

১১১

একদিন সন্ধ্যেবেলা এক ভদ্রমহিলা সোমনাথের বাড়িতে এসে হাজির।

সোমনাথের বাড়িতে তার আরদালি চারু থাকতো। সে অফিস থেকে তার মাইনে পেলেও কাজ করতো সোমনাথের কাজের লোক হিসেবে। বাজার করতো, দরকার হলে রান্নাও করতো, পোস্ট-অফিসে গিয়ে চিঠি ফেলে আসতো, ব্যাঙ্কে যেত, টেলিফোন-অফিসে যেত বিল্-এর টাকা শোধ করতে। দরকার পড়লে আবার তাকে ঘর ঝাঁট দিতেও হতো।

সেই আরদালি চারু এসে একদিন বললে—আপনার সঙ্গে একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন।

—মহিলা? কে মহিলা? নাম কী? কোথা থেকে এসেছে?

চারু বললে—তা তো জিজ্ঞেস করিনি!

সোমনাথ বললে—অ্যাদ্দিন আমার কাছে কাজ করছিস, আর এখনও এইসব জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলি? যা, জিজ্ঞেস করে আয়—

চারু জিজ্ঞেস করে এসে যা জানালে তাতে সোমনাথ বুঝলে যে মহিলাটি কলকাতার উত্তর-অঞ্চল থেকে এসেছে। একটা ঘুষের অভিযোগ শোনাতে চায় সোমনাথের কাছে।

সোমনাথ তার নিচের একতলার ঘরে গিয়ে দেখলে মহিলাটির বয়েস তিরিশ কি বত্রিশের মধ্যে হবে। মাথার সিঁথিতে সিঁদুর। তার মানে বিবাহিতা।

মহিলা সোমনাথকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে—আপনার নামই কি সোমনাথ গাঙ্গুলী?

সোমনাথ স্বীকৃতি জানাতেই মহিলাটি নমস্কার জানিয়ে বললে—আমার নাম মলিনা। মলিনাবালা দত্ত। আপনার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

সোমনাথ বললে—বলুন—

মলিনা দেবী বললেন—আমার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে।

—আপনার স্বামীর নাম কী?

মহিলাটি বললেন—সঞ্জয় দত্ত।

—তিনি কী করেন?

—তিনি ডাক্তার।

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলে—তিনি চাকরি করেন না, প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিশ করেন?

মলিনা দেবী বললেন—তিনি চাকরি করেন,…

—কোথায় চাকরি করেন?

—ট্রপিক্যাল মেডিকেল স্কুলে। তিনি যে-চাকরি করেন তাতে প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিশ করা বে-আইনী। কিন্তু লুকিয়ে-লুকিয়ে তিনি তাও করেন। আর বাড়তি টাকা আয়ের ওপর ইন্‌কাম-ট্যাক্সও দেন না। এটা তো অপরাধ। আমি চাই আপনি তাকে অ্যারেস্ট করুন—এন্‌কোয়ারী করুন—

সোমনাথ অনেক মানুষকে ঘুষ নেওয়ার অপরাধে গ্রেফ্‌তার করিয়েছে। ইন্‌কাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে অনেককেই সে ইন্‌কাম-ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টে জানিয়ে তাদের চাকরি খোয়াতে পেরেছে। কিন্তু এ-রকম অদ্ভুত কেস-এর সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে সে আগে কখনও আসেনি।

স্ত্রী হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ?

আর কীসের অভিযোগ? না, গভর্মেণ্টকে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ।

এ-রকম ঘটনা শুধু সোমনাথ কেন, বোধহয় পৃথিবীর কোনও অ্যাণ্টি-করাপশন্ অফিসারকেই শুনতে হয়নি।

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলে—আপনি আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে

অভিযোগ করছেন? আপনার স্বামীর সঙ্গে কি আপনার হিন্দু-বিবাহ মতে বিয়ে হয়েছে, না লাভ-ম্যারেজ হয়েছে আপনাদের?

মলিনা দেবী বললেন—না, হিন্দু-বিবাহ মতেই বিয়ে হয়েছে! আমাদের—

—আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন?

মলিনা দেবী বললেন—না—

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলে—আপনার নিজের বাবা-মা?

—না, তাঁরা আমার ছোটবেলাতেই মারা গেছেন।

—তাহলে আপনি কার সংসারে মানুষ হয়েছেন? কারা আপনার বিয়ে দিয়েছেন?

মলিনা দেবী বললেন—আমার কাকা-কাকিমা। তাঁরা এখনও বেঁচে আছেন। আমাদের বিয়েটা হয়েছিল ঘটকালি করে। একজন ঘটক এই পাত্রের খবর নিয়ে এসেছিল।

সোমনাথ বললে—আপনি স্ত্রী হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, সাধারণত এ-রকম বড়ো একটা ঘটে না। আপনার স্বামীর জেল হলে আপনার সংসার চলবে কেমন করে?

মলিনা দেবী বললেন—আমরা উপোস করে মরবো তবু অমন বদমাইশ স্বামীর শাস্তি হোক, আমি তাই চাই!

মহিলাটির কথা শুনে সোমনাথ খুব মুশকিলে পড়লো। সোমনাথের যে চাকরি তাতে এ-ধরনের কেস্ দিতে পারলে সেখানে তার মাইনে বাড়বে, সম্মান বাড়বে, হয়তো বেশ প্রমোশনও হবে। কিন্তু মানবতা বলেও তো সংসারে একটা জিনিস আছে। একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ডাক্তারের সর্বনাশ হোক, এটাও তো কাম্য হতে পারে না।

সোমনাথ বললে—আপনি মুখে আমাকে যা বললেন তা আপনি কাগজে লিখিতভাবে জানাতে পারেন?

মলিনা দেবী অক্লেশে বললেন—হ্যাঁ, কেন পারবো না? আমি তা লিখতেও পারি। আমি যা বলছি আপনাকে, তা একটা কাগজে লিখে নিন। তার নিচেয় আমার সই দিয়ে দেব—

সোমনাথ বললে—না, আপনি এত তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি হয়তো রাগের মাথায় এইসব কথা বলছেন। পরে ঠাণ্ডা মাথায় যখন ব্যাপারটা ভাববেন তখন হয়তো আপনার অনুতাপ হবে! তার চেয়ে আপনি বরং এখন বাড়ি ফিরে যান। বাড়ি ফিরে গিয়ে বেশ ভালো করে ভাবুন, তার পর আপনি অভিযোগটা লিখে নিয়ে আসবেন—

মলিনা দেবী একটু ভাবলেন। তারপর বললেন—আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন, তখন তাই-ই করি। আবার পরে একদিন আসবো।

সোমনাথ বললে—আপনার নাম, আপনার স্বামীর নাম আর বাড়ির ঠিকানাটা এই কাগজটায় লিখে রেখে যান। তাহলে আমার মনে থাকবে। আমাকে তো আরো অনেকের নাম-ঠিকানার হদিস রাখতে হয়, তাই আপনাদের নাম-ঠিকানা লিখে দিলে মনে রাখতে সুবিধে হবে!

মহিলাটি তাই-ই করলেন। সোমনাথের ডায়েরীতে তিনি নিজের আর স্বামীর নাম·আর বাড়ির ঠিকানা লিখে দিলেন।

তারপর ডায়েরীটা ফেরত দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

বললেন—তাহলে কবে আবার আমি আসবো?

সোমনাথ বললে—যেদিন আপনার খুশী।

তিনি বললেন—কোন্ সময়ে এলে আপনার সুবিধে হবে? এই সময়ে?

সোমনাথ বললে—হ্যাঁ, এই সন্ধ্যে সাতটা-আটটা হলেই কথা বলতে সুবিধে হবে।

এর পর ভদ্রমহিলা নমস্কার করে চলে গেলেন।

সোমনাথ ডায়েরীটা হাতে তুলে নিয়ে দেখলে। মলিনা দত্ত তার নিজের ঠিকানা লিখে দিয়ে গেছে—

ডাঃ সঞ্জয় দত্ত

১২/২এ মধু গুপ্ত লেন, কলিকাতা।

ঠিকানাটা দেখেই সোমনাথের মনে পড়ে গেল কাশীপতির কথা। কাশীপতি সরকার। কাশীপতিও ওই অঞ্চলের লোক। সোমনাথের ইন্‌ফরমার। ওই কাশীপতির মতো আরো গণ্ডা গণ্ডা ইন্‌ফরমার আছে সোমনাথের। এক-একটা অঞ্চলের এক-এক জন ইন্‌ফরমার।

ইন্‌ফরমার মানে চর। গুপ্তচর। তারা সকলেই নিজের নিজের ব্যবসা বা কাজ-কারবার করে। কেউ করে দোকানদারি, কেউ-কেউ আবার বেকার।

মলিনা দেবী চলে যাওয়ার পরেও তার কথা অনেকক্ষণ ধরে সোমনাথ ভাবতে লাগলো। পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার এ কী ধরনের সৃষ্টি! এ কী ধরনের খেয়াল!

সোমনাথ ছোটবেলা থেকেই একটু স্পর্শকাতর লোক। কেউ একটু আদর করলে একেবারে গলে যেত, আবার কেউ একটু মুখ বেঁকালে একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিত। স্কুলের হেড্‌মাস্টার মশাইকে দেখলে আমাদের মতো সেও মাথা হেঁট করে পায়ে হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকাতো। কিন্তু হেড্‌মাস্টার মশাই যদি তার ভক্তি দেখে খুশী হয়ে তার তারিফ না করতেন তো সোমনাথ ক্ষুব্ধ হতো। অভিমান হতো সোমনাথের।

জীবনে যারা আদর-ভালোবাসা কম পায়, পুলিশের চাকরিতে তারা বেশি উন্নতি করে। কারণ তারা চারপাশের সবাইকে সন্দেহের দৃষ্টিতে ছাখে। তাদের কেবল মনে হয় তার চারপাশের সবাই যেন মুখোশ পরে আছে।

সোমনাথ একবার আমাকে বলেছিল—পুলিশের চাকরিতে

বেশিদিন থাকলে ভাই আমরা নিজেদের স্ত্রীদেরও সন্দেহ করতে আরম্ভ করি। এই-ই আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি—

১১১

কাশীপতি বেকার লোক।

কোনও রকমের চাকরি বা ব্যবসাও নেই তার। দিন-আনি-দিন-খাই গোছের অবস্থা। বাড়িতে বুড়ো বাপ আর মা আছে। কোনও বাঁধা রোজগার না-থাকাতে সে বিয়ে করতে পারেনি।

খবর দিতেই, সে বাড়িতে এলো।

কোনও বাঁধা আয় নেই বলে কাজের ওপর তার আন্তরিকতা আছে। অন্য কোনও আয় থাকলে আমার কাজে এমন করে সে আত্মনিয়োগ করতো না।

সংসারে সকলের পক্ষে এইটেই নিয়ম।

কাশীপতির শুধু একটাই নিবেদন ছিল আমার কাছে। নিবেদনটা হলো পুলিশের পাকা খাতায় তার নামটা ওঠানো। কারণ একবার পাকা খাতায় নামটা ওঠালে মাসের পয়লা তারিখে সে কম করেও সাতশো টাকা হাতে পেয়ে যাবে।

সেই কাশীপতিকেই ডেকে পাঠালাম।

খবরটুকু পেতে যা দেরি।

সে আসতেই আমি তাকে আমার কেস্টা বুঝিয়ে বললাম।

সেও আগ্রহ-ভরে সমস্তটা মন দিয়ে শুনলো।

বললে—ভালোই হলো, এ তো আমার বাড়ির কাছেই থাকে। আমি বেশি সময় নেবো না। কিছুদিনের মধ্যেই আপনাকে সব খবর বলে যাবো।

তারপর গলাটা একটু নিচু করে বললে—এবার আমার একটা পাকা চাকরি করে দেবেন তো স্যার?

বললাম—দেখি তুমি কেমন করে এ কেস্‌টা ট্যাকল্ করো। যদি সাকসেস্‌ফুল হও তখন মুখার্জি সাহেবকে তোমার জন্যে রেকমেণ্ড করবো—

একটু উৎসাহ দেবার জন্যে তার হাতে কিছু খুচরো টাকা গুঁজে দিলুম।

বললাম—নাও, এখন এই সামান্য কিছু নাও। যদি শেষ পর্যন্ত কালপ্রিট্‌কে বঁড়শিতে টেনে ওপরে তুলতে পারো, তখন তুমি যা চাইছো তাই-ই পাবে।

—ঠিক বলছেন তো স্যার ?

—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। তুমি যাও, এখন থেকেই ছিপ ফেলো—

কাশীপতি চলে গেল। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম, কাশীপতির যদি টাকার অভাব না থাকতো তাহলে সে টাকা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতো।

কিন্তু পাকা চাকরির দিকে যার লোভ, সে প্রাণ দিয়ে খাটবে—এ কথাটা আমার জানা ছিল।

কাশীপতি সেইদিনই ঠিকানাটা ভালো করে নজর দিয়ে লক্ষ্য করলে।

১২/২এ মধু গুপ্ত লেন। একটা দোতলা পুরনো বাড়ির দেয়ালের গায়ে ওই নম্বরটা লেখা রয়েছে দেখে মনে হয় বাড়িটা ষাট-সত্তর বছর আগে হয়তো তৈরি হয়েছে। ওপরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। রাস্তা থেকে কাউকে দেখা গেল না।

কাশীপতির আর দেরি সইলো না। সে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

ভেতর থেকে কে একজন সাড়া দিলে—কে ?

কাশীপতি বললে—ডাক্তারবাবু বাড়ি আছেন ?

দরজাটা খুলে যেতেই কাশীপতি দেখলে—একটা ছ'সাত বছরের

মেয়ে।

—কাকে চাই?

কাশীপতি আবার বললে—ডাক্তারবাবু বাড়ি আছেন?

মেয়েটি বললে—এ বাড়িতে ডাক্তারবাবু বলে তো কেউ থাকে না—পাশের বাড়ির দরজার কড়া নাড়ুন। ও-বাড়িতে ডাক্তারবাবু থাকেন।

কাশীপতি বললে—কিন্তু এই বাড়ির নম্বরই তো বারোর দুই-এর-এ—

মেয়েটি বললে—ও-বাড়ির নম্বরও বারোর দুই-এ—

কাশীপতি খুব পাকা লোক। তবু সে বুঝতে পারলে না দুটো বাড়ির নম্বর এক হয় কী করে?

মেয়েটি বললে—আগে দুটো বাড়ি একটাই ছিল। আধখানা বিক্রি হয়ে গেছে বলে ও-বাড়িটা আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু নম্বর বদলায়নি।

এতক্ষণে বোঝা গেল আসল কারণটা। এককালে যিনি এ-বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন তিনি কি আর জানতেন যে, তাঁর বংশধররা ওর আধখানা বিক্রি করে দেবে?

কাশীপতি তার পাশের বাড়িটাতে গিয়ে সদর-দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে।

আবার ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

—কে?

কাশীপতির সেই একই প্রশ্ন—ডাক্তারবাবু বাড়িতে আছেন?

দরজাটা খুলে গেল এবার। কাশীপতি দেখলে একটা ছ'সাত বছরের ফ্রক-পরা মেয়ে দরজা খুলে দিয়েছে।

মেয়েটি বললে—ডাক্তারবাবু তো বাড়িতে নেই।

কাশীপতি জিজ্ঞেস করলে—তিনি কোথায় গেছেন?

মেয়েটি বললে—তিনি ডাক্তারখানায় গেছেন—

কাশীপতি জিজ্ঞেস করলে—তাঁর ডাক্তারখানাটা কোথায়?

মেয়েটি বললে—তা তো জানি না—

কাশীপতি আবার জিজ্ঞেস করলে—তোমার মা বাড়িতে আছেন?

—হ্যাঁ।

—তোমার মাকে একবার জিজ্ঞেস করে এসো-না তোমার বাবার ডাক্তারখানাটা কোথায়। আমি তাহলে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতে পাবি।

কাশীপতির কথা শুনে মেয়েটি বোধহয় মাকে জিজ্ঞেস করতে গেল কোথায় বাবার ডাক্তারখানাটা।

খানিক পরেই মেয়েটা ফিরে এসে বললে—মা বললে, মা জানে না!

আশ্চর্য কাণ্ড! মা পর্যন্ত জানে না কোথায় বাবার ডাক্তারখানা। এ কি-রকম বাড়ি? কোথায় যেন গোলমাল আছে কিছু। নইলে তো এমন হওয়ার কথা নয়।

কাশীপতি আবার জিজ্ঞেস করলে—কখন বাড়িতে ফিরবেন ডাক্তারবাবু?

মেয়েটি বললে—বাড়ি ফিরতে বাবার অনেক রাত হবে। আমরা তখন সবাই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়বো—

কাশীপতি কথাটা শুনে কী-ই বা আর বলবে!

আর কিছু না বলে কাশীপতি তার বাড়ি চলে গেল।

ঌ ঌ ঌ

কাশীপতি আমাকে তার সেই প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথাটা বলে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোমার কী মনে হলো?

কাশীপতি বললে—আমার মনে হলো কোথায় যেন কিছু একটা

গোলমাল আছে।

বললাম—গোলমাল যে আছে তা তো আগেই বোঝা গেছে যখন ডাক্তার দত্তর স্ত্রী নিজে এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে। এ-রকম সম্পর্ক তো সাধারণত কোনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকে না।

তারপরে একটু ভেবে বললাম—এবার খবর নিও তো ডাক্তারবাবুর স্ত্রী কোথাও চাকরি করে কিনা। এমনও তো হতে পারে স্ত্রী মলিনা দত্ত হয়তো অন্য কোনও অফিসে চাকরি করে, ডাক্তারবাবু তার সেই চাকরি করা পছন্দ করে না।

কাশীপতি বললে—তাও হতে পারে। সেটা অসম্ভব কিছু নয়।

বললাম—তুমি সেটা লুকিয়ে একটু নজর রেখো—

আমার কাছে কথাটা শুনে কাশীপতি চলে গেল।

ডাক্তার সঞ্জয় দত্তের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা চায়ের দোকান আছে। সেই চায়ের দোকানের সামনের দিকের একটা চেয়ারে বসলে ডাক্তার দত্তর বাড়ির সদর দরজাটা দেখা যায়। দেখা যায় কে কখন বাড়িতে ঢুকলো, কিংবা কে কখন বাড়ি থেকে বেরোল।

কাশীপতি দু'একদিনের মধ্যেই চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলে।

এ-সব লাইনে যদি দু'পক্ষ সিগারেট-খোর হয় তাহলে ভাব জমাতে বেশি সময় লাগে না।

দোকানের মালিক মানিক মাঝ-বয়েসী লোক। একেবারে প্রথম দিন থেকেই কাশীপতির কাছে মানিক 'মানিক-দা' হয়ে গেল।

চায়ের দোকান ভোর পাঁচটা থেকেই খোলা রাখার নিয়ম। যারা চা-খোর তাদের ঘুম থেকে ওঠবার পরই চা চাই। অনেকের বাড়িতেই এই চা তৈরি হতে দেরি হয়। তাই চা-খোররা ভোর পাঁচটার পর থেকেই চা খেতে ভিড় করে। চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-গাছিও হয়। আর যখন খবরের কাগজটা দোকানে পৌঁছোয় তখন তো সেটা নিয়ে

কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আধখানা খবরের কাগজ একজনের দখলে, অন্য আধখানা আর একজনের দখলে।

এই হচ্ছে মানিকদার চায়ের দোকানের চালচিত্র। সেই ভোর পাঁচটা থেকে এমনি চলে রাত দশটা পর্যন্ত।

কাশীপতি ভোরবেলাই গিয়ে পৌঁছোয় সেখানে। ভোরবেলা না গেলে রাস্তার ধারের দিকে চেয়ার বে-দখল হয়ে যায়। তাতে বারোর-দুই-এ নম্বরের বাড়িটা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে অসুবিধে হয়।

সেই ভোর পাঁচটার সময়েই কাশীপতি গিয়ে সেই চায়ের দোকানে হাজির হয়। বলে—দাও মানিকদা, এক কাপ কড়া করে চা বানাও—

চা তৈরি হলেই কাশীপতির সামনের টেবিলের ওপর ধূমায়িত এক কাপ চা এসে হাজির হয়।

কাশীপতি পকেটের থেকে সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বার করে।

একটা নিজের জন্যে, আর একটা মানিকদার জন্যে।

—নাও মানিকদা, তোমার সিগারেট ধরিয়ে নাও—

মানিকদার সিগারেটের নেশা নেই। কাশীপতি সিগারেট খেতে পীড়াপীড়ি করে বলেই খাওয়া।

বলে—তুমি দেখছি আমায় সিগারেটের নেশা করিয়ে দেবে হে কাশীপতি—

কথাটা বলে বটে, কিন্তু সিগারেট নিতে আপত্তিও করে না। সিগারেটটা ধরিয়ে টানে, ধোঁয়াও ছাড়ে, আর দোকানের খুঁটিনাটি কাজও করে চলে সেই সঙ্গে।

মোটা-মোটা কাজগুলোর জন্যে আছে—হাজারি। হাজারির বয়েস কম; কিন্তু কাজ করবার মেজাজ আছে। হাজারি ফাঁকি দেয় না তার কাজে। তাকেও হাতে রাখে কাশীপতি। কখন কাকে দিয়ে কী উপকার হয় তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে?

মানিকদা বা হাজারি—দু'জনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো কাশীপতির নিজের কার্য-সিদ্ধি করা।

কাশীপতি রোজ ভোরবেলা গিয়ে নিজের চেয়ারটা দখল করে রাখে।

কাশীপতি এক কাপ চা খেয়ে আধঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিত। খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে নজর রাখতো ওই বারোর-দুই-এ নম্বর বাড়িতে কে বা কারা যাওয়া-আসা করে।

সকালবেলা প্রথমেই যে আসে সে বোধহয় ঠিকে-ঝি। সে সংসারের কাজ-কর্ম শেষ করে দুপুরবেলায় বাড়ি চলে যায়। যখন চলে যায় তখন প্রায় বেলা বারোটা-একটা। আর তারপর আবার আসে সাড়ে তিনটে-চারটের সময়। তখন সে উনুন পরিষ্কার করে বাড়ির বাইরে ছাই ফেলতে আসে।

আর তার আগে তার সকালবেলার ডিউটি বাজারে যাওয়া। বাজার থেকে তরি-তরকারি মাছ কিনে আনা।

আর সকাল যখন দশটা তখন একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক কোট-প্যাণ্ট পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

বোধহয় অফিসেই যায়। প্রথম দিন থেকে এই দৃশ্যটা রোজ নিয়ম করে দেখতো কাশীপতি।

কাশীপতি বুঝতে পেরেছিল ভদ্রলোকের নাম নিশ্চয় ডাক্তার সঞ্জয় দত্ত।

দু'একদিন দেখার পরই কাশীপতি ভদ্রলোকের পেছনে-পেছনে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ভদ্রলোক কোথায় যায় সেইটে জানা।

ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা কলেজ-স্ট্রীটের দিকে চলতে লাগলেন। গলি থেকে বেরিয়ে খানিকটা যেতেই পড়লো ট্রাম-রাস্তা। ট্রাম-রাস্তা পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে।

কিন্তু রাস্তা পার হওয়া অত সহজ নয়। চারদিক দেখে-শুনে বিচার

করে তবে রাস্তা পার হতে পারা যাবে।

শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক রাস্তাটা পার হলেন।

পেছন-পেছন কাশীপতিও পার হলো।

আর তারপর ?

তারপর ভদ্রলোক ফুটপাত ধরে উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। কাশীপতিও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলো।

আর তারপর 'ট্রপিক্যাল স্কুল অব্ মেডিসিন'-এর গেট পড়লো। সেই গেটের ভেতর ভদ্রলোক ঢুকে গেলেন।

কাশীপতি যা দেখবার দেখে নিলে। তারপর সেখান থেকে সোজা নিজের বাড়ি চলে গেল।

সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে এসে খবর দিলে। সে সেই মানিকের চায়ের দোকানে বসে বসে যা-কিছু দেখেছে সমস্ত বলে গেল।

বললে—ডাক্তারবাবুর অবস্থা খুব ভালো নয় বলে মনে হলো স্যার—

বললাম—কী সে বুঝতে পারলে যে ডাক্তারবাবুর অবস্থা ভালো নয় ?

—অবস্থা ভালো হলে বাড়িতে একটা ফুল-টাইম চাকর-ঝি নিশ্চয়ই কিছু থাকতো। শুধু একজন ঠিকে-ঝি আছে, সে বাজার করে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, কাপড়-চোপড় কাচে। কাজ-কর্ম ক'রে সে নিজের বাড়ি চলে যায়। ডাক্তারবাবু যদি বেশি টাকা উপায় করতো তাহলে কি একজন ঠিকে-ঝি দিয়ে কাজ-কর্ম চলতো ?

কাশীপতি মানিকের দোকানে বসে অনেক কাপ চা খেয়েছে। সে-খরচটা তো আমার জন্যেই করেছে সে !

তাই তাকে এই কাজটার জন্যে কুড়িটা টাকা দিলাম।

সে বললে—এ টাকাটা নিলুম বটে, কিন্তু আমার চাকরির কথাটা যেন ভুলে যাবেন না স্যার—

বললাম—শিগ্‌গিরই কিছু ভেকেন্সি হবে, তখন তোমার কথাটাও ভাববো,—

আমার কথা শুনে কাশীপতি আশ্বস্ত হলো। তারপর যাওয়ার সময় বলে গেল যে সে বরাবর ডাক্তারবাবুর বাড়ির ওপর নজর রাখবে।

১১১

কয়েকদিন পরে সত্যি-সত্যিই সেই ডাক্তারবাবুব স্ত্রী মলিনা দত্ত আবার একদিন সন্ধ্যের পর আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

আমার আরদালি চারু এসে খবর দিতেই আবার আমি আমার বৈঠকখানা ঘরে এসে দেখি সেই মহিলা এসে বসে আছেন।

আমাকে দেখে তিনি নমস্কার করলেন।

জিজ্ঞেস করলাম—কী খবর ?

মলিনা দেবী বললেন—আপনি বলছিলেন আমার স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ নিয়ে আসতে, আমি তাই এনেছি। এই দেখুন—

বলে একখানা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি কাগজটা পড়ে দেখলাম। হ্যাঁ, তিনি যা-যা বলেছিলেন ঠিক তাই-ই লিখে এনেছেন।

সমস্তটা পড়ে বললাম—আপনি যে আপনার স্বামী ডাক্তার সঞ্জয় দত্তের বিরুদ্ধে এইসব কথা লিখে এনেছেন, এইসব কথা কি সত্যি ?

মহিলাটি বললেন—হ্যাঁ, সব সত্যি।

—যদি আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ কোর্টে প্রমাণিত হয় তাহলে তো আপনার স্বামীর চাকরিও চলে যাবে, আপনার স্বামীর জেলও হয়ে যেতে পারে। তখন ? তখন কী করবেন ?

মহিলাটি বললেন—আমি সবরকম অবস্থার জন্যেই তৈরি হয়ে আছি—

বললাম—তাহলে আপনার সংসার চলবে কেমন করে ? সে-কথা

কি আপনি একবার ভেবেছেন ?

—হ্যাঁ, ভেবেছি। সমস্ত ভেবেচিন্তেই আমি আপনার কাছে এসেছি।

—আপনি আমার নাম-ঠিকানা পেলেন কী করে ?

মহিলাটি বললেন—আমি অনেকদিন ধরেই একজন পুলিশ অফিসারের খোঁজ করছিলুম। কিন্তু তা পাওয়া কি অতো সোজা। অনেক জায়গায় খোঁজ নিয়েছি। অনেক লোককে জিজ্ঞেস করেছি। শেষকালে অন্য লোকের মারফৎ আপনার ঠিকানাটা পেয়ে গেলাম।

আমি বড়ো চিন্তায় পড়লাম।

এতদিন এত লোককে ধরেছি, এত লোককে জেলে ঢুকিয়েছি। আমার হাতে শাস্তি পেয়ে অনেকের জীবনে সর্বনাশ নেমে এসেছে। কিন্তু এ-রকম মামলা তো আগে কখনও আমার হাতে আসেনি !

স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্মিণী। যে-মানুষ জীবনে স্ত্রীর ভালোবাসা বা সহযোগিতা পায়নি, তার মতো হতভাগ্য আর কে আছে ? আমি নিজেও তো একজন সংসারী মানুষ। সংসারী মানুষ মাত্রেই জানে জীবনে স্ত্রীর সহযোগিতার মর্ম কতো অমূল্য।

আর সেই আমি কিনা জেনে-শুনে একজন সংসারী মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবো ?

বড়ো মানসিক দোটানায় পড়লাম।

আমি জানি যে পুলিশের বিবেক থাকতে নেই। বিবেক থাকলে সেই পুলিশের জীবন এবং জীবিকা সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে। আমার জানা-শোনা যত বন্ধু ছিল সকলেরই তাই হয়েছে। তবু ঘটনাচক্রে এবং খানিকটা বাধ্য হয়ে পুলিশের জীবিকাই আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

কিন্তু জীবিকা এবং জীবনের সামঞ্জস্য করতে গিয়ে কতবার যে দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলবার মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছি তা

আমি ছাড়া আর কেউই টের পায়নি।

একবার একজন আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে কেঁদে পড়েছিলেন।

বলেছিলেন—আপনি বাঙালী হয়ে একজন বাঙালীর সর্বনাশ করলেন?

আমি এ-কথার কী জবাব দেব? আমি কি শুধুই বাঙালী? আমি কি মানুষ নই? আমার ওপরওয়ালা কি শুধু অবাঙালীদেরই গ্রেফতার করতে নির্দেশ দিয়েছে?

চুরিই তো আজকের পৃথিবীর বা আজকের মানুষের সমাজের বড়ো পাপ। এই পাপ এখনই যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে আমরা কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেব? কে আজকের মানুষদের বাঁচাবে? কী করে আমাদের দেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে?

আর ছোট চুরি বা বড়ো চুরির মধ্যে তফাৎটাই বা কোথায়? ওটা তো আয়তনের প্রশ্ন। দু'টাকা চুরি আর দু'কোটি টাকার চুরির মধ্যে কোনও নীতিগত ফারাক তো নেই। চুরিটা চুরিই—তা সে দু'-টাকাই হোক আর দু'কোটি টাকাই হোক।

সেই চুরি সম্বন্ধে ভারতীয় পেনাল-কোডে যে-কথাই লেখা থাকুক, আইনে যে-কথারই উল্লেখ থাকুক, নীতি-শাস্ত্রে দু'টাকা আর দু'কোটি টাকা চুরির মধ্যে কোনও তারতম্য নেই। নইলে ওই দু'টাকা চুরির আসামী বা অপরাধী যে একদিন দেশের প্রবীণ প্রধান-মন্ত্রীরও পকেট কাটতে চাইবে।

আমি আমার চাকরির ব্যাপারে এই দৃষ্টিকোণ দিয়েই অপরাধীকে দেখবার চেষ্টা করে এসেছি।

ভদ্রমহিলা তখনও বসেছিলেন।

তিনি বললেন—আর কিছু কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন?

আমি বললাম—না—

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—আবার কি আমাকে আসতে হবে ?

বললাম—ঠিক এখনই বলতে পারছি না। তবে মাসখানেক বাদে যদি সময় পান তো আসতে পারেন। যদি আরও নতুন কিছু পয়েণ্ট জানবার দরকার হয় তো তখন আপনার কাছ থেকে জেনে নেব—

ভদ্রমহিলা যাবার সময়ে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে গেলেন।

আমি তাঁর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে চেয়ে দেখেছিলুম ! ভদ্রমহিলা কি সামান্য অপ্রকৃতিস্থ ? মস্তিষ্কে কি কিছু গোলযোগ আছে ? নিজের স্বামী যদি চোর হয় তো তার বিরুদ্ধে কি পুলিশে অভিযোগ করে তাকে জেলখানায় পুরে শাস্তি দিতে হবে ?

পুলিশের চাকরিতে ঢুকে এ-রকম অনেক চরিত্রই দেখতে পাওয়া গেছে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও কোনও অভিযোগের ভিত্তি নেই।

তার জন্যে অকারণ অনেক সময় ব্যয় করা গেছে, অনেক কাগজ-কলম নষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড-শ্রম হয়ে গেছে।

একবার এক ভদ্রলোক বহু দূর থেকে অফিসে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য একজন বড়ো ব্যবসায়ীকে ধরিয়ে দেওয়া। অফিসে আসতেই তাঁর প্রায় দু'শো টাকা ট্রেন ভাড়া দিতে হয়েছে।

ব্যবসায়ীর অপরাধ কী ?

না, তিনি সব খাবার জিনিসে ভেজাল মিশিয়ে প্রচুর টাকা উপার্জন করেন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি যে তাঁকে ধরিয়ে দিতে চান, তাতে আপনার কী স্বার্থ ?

তিনি বলেছিলেন—তিনি ভেজাল জিনিস খাইয়ে মানুষ খুন করছেন, সেইটেই বন্ধ করা।

আমি বলেছিলাম—আপনার কি তাতে কোনও ক্ষতি হয়েছে ?

তিনি কি আপনার কোনও ক্ষতি করেছেন ? আপনি কি তাঁর দোকান থেকে ভেজাল জিনিস কিনেছেন ?

তিনি বলেছিলেন—না—

—তাহলে আপনি এত টাকা খরচ করে, এত পরিশ্রম করে এখানে এসেছেন কেন ?

ভদ্রলোক বলেছিলেন—তিনি আমাকে গালাগালি দিয়েছেন।

—কী গালাগালি দিয়েছেন ?

ভদ্রলোক বলেছিলেন—সে খুব অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়েছেন, সে-ভাষা আমি উচ্চারণ করতে পারবো না—

—কেন তিনি আপনাকে গালাগালি দিতে গেলেন ? আপনি কি কিছু অন্যায় করেছিলেন ?

ভদ্রলোক বলেছিলেন—না মশাই, তা নয়, আমরা রোজ একসঙ্গে তাস খেলি। সেই তাসখেলার সময়ে হেরে গিয়ে তিনি আমায় অকারণে গালাগালি দিলেন। আমিও মনে মনে ঠিক করলুম যে আমি তার প্রতিশোধ নেব—

আমি বলেছিলাম—আপনি সেই সামান্য কারণে এই দু'শো টাকা খরচ করে তার প্রতিশোধ নেবেন ? আপনার আসা-যাওয়াতেই তো প্রায় চারশো টাকা খরচ হয়ে যাবে। ভদ্রলোক বলেছিলেন—তা যাক —কিন্তু একে কি আপনি সামান্য কারণ বলেন ?

আমি আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—সত্যিই বলুন তো তিনি আপনার কে হন ?

ভদ্রলোক বলেছিলেন—তিনি আমার আপন ভায়রা-ভাই—

মনে আছে আমি ভদ্রলোককে খুব কড়া কথা শুনিয়েছিলাম।

বলেছিলাম—আপনার লজ্জা করে না নিজের আত্মীয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে ? যান, চলে যান এখান থেকে—

এক-কথায় ভদ্রলোককে আমি অফিস থেকে সেদিন তাড়িয়েই

দিয়েছিলাম। তারপর আর সে-ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি। হতে পারে তিনি আমার কাছ থেকে তাড়া খেয়ে অন্য কোনও উপায়ে তাঁর আত্মীয়ের শত্রুতা সাধন করেছিলেন। এ-সংসারে সব-কিছুই ঘটাই সম্ভব। বিশেষ করে বড়োলোক আত্মীয়দের সঙ্গে গরীব আত্মীয়দের ব্যবহারে!

ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পর ভাবলাম—এ-মহিলারও কি সেই-রকম কোনও ঘটনা আছে নাকি? কোনও রকম ঝগড়া বা কোনও রকম মনোমালিন্য? স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে মন-কষাকষি, সন্দেহ বা অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকাও অসম্ভব নয়।

যা হোক, ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে গেল। তার পরে আর ও-ব্যাপার নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিলাম।

১১১

সেদিন কাশীপতি ভোরবেলাই নিয়ম করে মানিকের দোকানে গিয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছিল।

—মানিকদা, নাও, একটা সিগারেট নাও—

হাজারি তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অতো ভোরে খদ্দের কম থাকে বলে হাজারিরও কাজ কম থাকে। যতো বেলা বাড়ে ততো তার কাজের চাপ বাড়ে। খবরের কাগজটা আসতে আসতে সাড়ে ছ'টা-সাতটা বেজে যায়। তখন খদ্দের আসতে আরম্ভ করে একজন-দু'জন ক'রে ক'রে।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছ'টার সময় ডাক্তারবাবুর ঠিকে-ঝি-টা এসে দরজার কড়া নাড়ে।

ভেতর থেকে যথারীতি দরজাটা কে একজন খুলে দেয়। তারপর ঝি-টা ভেতরে ঢুকে যায়। ভেতরে গিয়ে সংসারের কাজ-কর্ম করতে আরম্ভ করে বোধহয়। সে-সব বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

তারপর সকাল আটটার সময় ব।জারের থলি নিয়ে বাজার করতে যায় ঝি-টা। বাজার কাছেই।

ততক্ষণে মানিকদার চায়ের খদ্দেররা এসে দোকান জম-জমাট করে ফেলেছে। তখন খবরের কাগজের পাতাগুলো নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যায়। একজন একটা পাতা পড়ে শেষ কববাব সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোকটা সে-পাতাটা নিয়ে পড়তে শুরু করে।

নতুন কোনও খদ্দের এসে বলে—চা দাও ভাই এক কাপ। কড়া লিকার, চিনি কম—

এক এক জনের এক এক রকম বায়না। সকলের সব হুকুম তামিল করাই মানিকের কাজ। আর শুধু তো চা নয়, চায়ের সঙ্গে বিস্কুটও চায় অনেকে। সকালবেলার দিকে বিস্কুট-চা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।

কিন্তু বিকেলবেলার দিকে এসো, তখন ভেজিটেবল চপ, কাটলেট. মামলেট, সবকিছু পাবে মানিকদার দোকানে।

সেদিনও কাশীপতি দেখলে ডাক্তারবাবু ঠিক দশটার পর বাড়ি থেকে বেরোল। তার পেছন-পেছন কাশীপতিও বেরোল। প্রতিদিনকার মতো ডাক্তারবাবু সেদিনও ট্রাম-রাস্তাটা সাবধানে পার হলো। ডান-দিক বাঁ-দিক সব দিক দেখে পার হয়ে নিজের অফিসে ঢুকে পড়লো।

যেন ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ম করে চলা। কিন্তু ববিবারটা ব্যতিক্রম। সেদিন একটু দেরি করে বেরোয় ডাক্তারবাবু। অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ার পর।

কাশাপতির সন্দেহ হলো—ডাক্তারবাবু রবিবারের মতো ছুটির দিনে কোথায় যায়? নিজের চেম্বারে? তাহলে নিজের চেম্বারও আছে নাকি ডাক্তারবাবুর?

শুধু এ-খবরগুলো দিলেই তো হবে না। অফিসের পর ডাক্তারবাবু কোথায় যায় তাও দেখতে হবে। যতক্ষণ মানিকের চায়ের দোকানে

থাকে কাশীপতি ততক্ষণ ডাক্তারবাবুকে বাড়ি ফিরতে দেখা যায় না।

সেদিন কাশীপতি অফিস ছুটি হওয়ার সময়ে বাইরে গেটের উল্টো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলো।

অফিস ছুটি হওয়ার পর একে একে অনেকে গেট পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগলো। ডাক্তারবাবুর তখনও বাইরে আসবার নাম নেই।

কিন্তু কতক্ষণ ডাক্তারবাবু ভেতরে থাকবে? এক-সময়ে না এক-সময়ে তাকে তো বেরোতেই হবে। গেট তো আর দুটো নেই, একটাই। ওই একটা গেট দিয়েই বেরোতে হবে সকলকে।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারবাবু গেট দিয়ে রাস্তায় বেরোন।

বাড়ি আসতে গেলে গেট থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে আসতে হবে। মেডিকেল কলেজের সামনে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ডান-দিক বাঁ-দিক সব দিক দেখে ট্রাম রাস্তা পার হয়ে উল্টো দিকের মধু গুপ্ত লেনে ঢুকতে হবে।

কিন্তু তা করলে না ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু অফিস থেকে বেরিয়েই উত্তর দিকের ফুটপাথ ধরে চলতে লাগলো। মাঝখানে কলুটোলা স্ট্রীটটা পেরিয়ে সোজা হ্যারিসন রোডে গিয়ে পড়লো।

হ্যারিসন রোডের ওপর দিয়ে, ট্রাম-রাস্তা গিয়েছে পুব-পশ্চিম বরাবর। পুব দিকে শেয়ালদা স্টেশন আর পশ্চিম দিকে হলো হাওড়া যাওয়ার রাস্তা।

ডাক্তারবাবু পশ্চিমের ফুটপাথ ধরে হাওড়া স্টেশনের দিকে হেঁটে চলতে লাগলো। আশেপাশে আগে পেছনে অনেক লোক, অনেক বাস-ট্রাম, অনেক লরি, অনেক ট্রাক্, অনেক রিক্শা অনেক টেম্পো, অনেক ঠেলাগাড়ির দৌরাত্ম্য।

তবু ডাক্তারবাবুর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ডাক্তারবাবু সামনের দিকে চলেছে তো চলেছেই।

চলতে চলতে একটা রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে ঢুকলো।

কাশীপতি সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। উদ্দেশ্য আড়াল থেকে সব দেখা-শোনা।

ডাক্তারবাবু বললে—এক কাপ চা দেখি—

দোকানে খদ্দের ভর্তি। অফিসের ছুটির পর সব লোক রাস্তায় গিজ্-গিজ্ করছে কতক্ষণে তারা বাড়ির দিকে পা বাড়াবে।

দোকানদারের কর্মচারীরা সবাই তখন খদ্দেরদের আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত। খদ্দেরই হলো লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মীকে খুশী করতে পারলে দোকানের মালিকের লক্ষ্মীলাভ হবে, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীলাভ হবে কর্মচারীদেরও।

সামান্য এক কাপ চা খেতে এত দেরি?

কাশীপতি বুঝতে পারলে না কেন ডাক্তারবাবু এত সময় নিচ্ছে সামান্য এক কাপ চা খেতে।

একবার মনে হলো চায়ের সঙ্গে ডাক্তারবাবু আরো কিছু খাচ্ছে। হয়তো চপ কিম্বা কাটলেট্। সারাদিন অফিসে কাটাবার পর ক্ষিদে পাওয়াই তো স্বাভাবিক।

ডাক্তারবাবু সত্যি-সত্যিই কী খাচ্ছে তা দেখবার জন্যে কাশীপতি একবার দোকানের ভেতর ঢুকলো। না, কিছু খাচ্ছে না ডাক্তারবাবু। শুধু চা। আর কিছু নয়।

কাশীপতি বাইরে বেরিয়ে এসে আবার রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

যখন প্রায় আধঘণ্টা সময় কাটলো তখন ডাক্তারবাবু রাস্তায় নেমে পড়লো।

কাশীপতি ভাবলে হয়তো এইবার বাড়ির দিকে ফিরবে ডাক্তারবাবু।

কিন্তু না। বাড়ির দিকে না ফিরে ডাক্তারবাবু আবার পশ্চিম দিকে চলতে লাগলো। অর্থাৎ হাওড়া স্টেশনের দিকে।

কাশীপতি ভেবে অবাক হলো যে ডাক্তারবাবু হাওড়া স্টেশনে গিয়ে

ট্রেন ধরবে নাকি? ট্রেন ধরে কোথায় যাবে? কলকাতার বাইরে? কলকাতার বাইবে ডাক্তারবাবু চেম্বার করেছে নাকি?

পশ্চিম দিকে আরো অনেক রকমের আকর্ষণ আছে। তার মধ্যে প্রধান হলো বড়োবাজার। বড়োবাজারে কী নেই? সেখানে যদি ডাক্তারখানা করা যায় তাহলে অনেক রোগীর ভিড় হয়।

ডাক্তারবাবু বোধহয় ওখানেই ডাক্তারখানা করেছে বেশি পয়সার লোভে।

কিন্তু না, ডাক্তারবাবু বড়োবাজার পর্যন্ত গেল না। মাঝখান দিয়ে একটা বিরাট রাস্তা গিয়েছে। সেটা হলো চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। যার আগের নাম ছিল সেন্টাল অ্যাভিনিউ।

সেই চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে পৌঁছলে ডান দিকেও যাওয়া যায়, আবার বাঁ দিকেও যাওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু কিন্তু ডান-দিকে গেল না। গেল বাঁ-দিকে।

তাহলে বোধহয় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর ওপরেই ডাক্তারবাবু রোগী দেখবার চেম্বার করেছে।

কাশীপতি দেখতে পেলে ফুটপাথের ওপরে একজন লোককে ঘিরে অনেক লোকের ভিড় জমেছে।

অতো ভিড় কেন?

কাশীপতি দেখলে সেই ভিড়ের কাছে গিয়ে ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়ে গেল। উঁকি মেরে দেখলে ভেতরে কী হচ্ছে।

একটু পরে কাশীপতিও কাছে গিয়ে ভিড়ের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলে।

দেখলে একটা দেহাতী মানুষ জড়ি-বুটির ওষুধ বিক্রি করছে। সে এমন এক জড়ি-বুটি যা ব্যবহার করলে মানুষের সব অসুখ ভালো হয়ে যায়। বিশেষ করে পেটের রোগ।

তা কলকাতার সমস্ত লোকই তো পেটের রোগে ভোগে। তাই

সেই লোকটার কথাগুলো সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। আর সেই জড়ি-বুটি দামেও খুব সস্তা। মাত্র পাঁচ-সিকে। পাঁচ-সিকে পয়সা খরচ করে যদি ব্যাধি-মুক্ত হওয়া যায় তাহলে কে এমন বোকা আছে যে ডাক্তারের কাছে যাবে।

আর সেটাও বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হচ্ছে লোকটার গলায় একটা জ্যান্ত ময়াল সাপ জড়ানো আছে, অথচ লোকটাকে কামড়াচ্ছে না।

আসলে জড়ি-বুটির জন্যে অতোটা মানুষের ভিড় নয়, যতো সাপটার জন্যে।

লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছে লোকটা আর তার ফাঁকে ফাঁকে তার জড়ি-বুটি বিক্রি করছে। দেখে মনে হলো দুপুর থেকেই লোকটা ওই কারবার শুরু করেছে, তারপর সন্ধ্যে পর্যন্ত ওই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

কাশীপতি একবার গলায় সাপ-জড়িয়ে-থাকা মানুষটার দিকে দেখছে, আর একবার দেখছে ডাক্তারবাবুর দিকে।

যতক্ষণ জড়ি-বুটি বিক্রি হচ্ছিল ততক্ষণ ডাক্তারবাবু ওইখানে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভিড় পাতলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তল্পি-তল্পা গুটিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

তারপর ডাক্তারবাবু আবার ফুটপাথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে আরো দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলো।

ডাক্তাররা একটু ব্যস্তবাগীশ মানুষই হয়। বিশেষ করে কলকাতা শহরের ডাক্তাররা। তাদের কাছে সময় মানেই টাকা। সময় নষ্ট করা মানেই টাকা নষ্ট করা।

কিন্তু এ কি-রকম ডাক্তার ? অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি না গিয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে এটা-ওটা দেখে বেড়াচ্ছে, হেঁটে-হেঁটে সময় নষ্ট করছে। যদি নিজের কোনও চেম্বার থাকে তাহলে সেখানে গিয়ে বোসো না। সেখানে তোমার জন্যে অনেক রোগী অপেক্ষা করছে।

কাশীপতি তখনও ডাক্তারবাবুকে অনুসরণ করে চলেছে। ডাক্তারবাবু কোথাও দাঁড়াচ্ছে, কোথাও দোকানের শো-কেসের ভেতরের জিনিস-পত্র দেখছে। তারপর আবার চলছে।

চলতে চলতে একেবারে সোজা ধর্মতলা স্ট্রীটে পৌঁছে ডাক্তারবাবু চারদিকে চেয়ে কী-সব দেখতে লাগলো।

চারদিকে তখন মানুষের ভিড় আর বাস-ট্রাম-ট্যাক্সির এলোপাথাড়ি গতিবিধিতে একেবারে দম-বন্ধ-করা অবস্থা। ডান-দিকে ফুটপাথের ওপর তখন কোন্ পার্টির গরম-গরম বক্তৃতা চলছে মাইক্রোফোনে। সে-সব কেউ শুনছে, আবার কেউ শুনছে না। তাতে বক্তার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না।

ডাক্তারবাবু সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই-ই শুনতে লাগলো এক-মনে।

কাশীপতিও তাই শুনতে লাগলো। ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

এই শ্লোগান, এই লাউড্-স্পীকার, এই বক্তৃতা—এর মধ্যে শোন-বারই বা কী আছে আর এ-দৃশ্য দেখবার মধ্যেই বা কী নতুনত্ব আছে। কলকাতার লোকেদের কাছে এ দৃশ্য একঘেয়ে নীরস বৈচিত্র্যহীন। এ দৃশ্য দেখে দেখে কলকাতার লোকেদের চোখ পচে গেছে, এই শ্লোগান শুনে শুনে কলকাতার লোকদের কানে তালা ধরে গেছে।

তবু ডাক্তারবাবু সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। আর সেই বক্তৃতা শুনছিল।

কাশীপতির নিজেরই কেমন খারাপ লাগলো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। ও-সব শুনে বা দেখে কী লাভ হবে? তাড়াতাড়ি নিজের চেম্বারে গিয়ে বোসো না বাপু। তাতে তুমিও মুক্তি পাও, আমিও বাড়ি চলে যাই।

ডাক্তারবাবুর বোধহয় এতক্ষণে হুঁশ হলো, এতক্ষণে বোধহয় খেয়াল

হলো যে সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তখন ডাক্তারবাবু ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপর দিয়ে বাঁ-দিকে চলতে লাগলো।

তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে বেশ রাত হয়ে গেছে। সে-ফুটপাথে তখন আরো বহু লোকের ভিড়। আরো মানুষের আসা-যাওয়া। সবাই-ই কোনও না কোনও কাজে চলেছে। কেউ অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে, কেউ বা কোনও দোকানে কিছু কেনা-কাটা করতে যাচ্ছে।

তখন কাশীপতিরও হেঁটে-হেঁটে পা-জোড়া ব্যথা করতে আরম্ভ করেছে।

ডাক্তারবাবুব তখনও কোনও কাজ নেই। কোনও দোকানেও ঢুকছে না। যেন কলকাতা শহরে নতুন এসেছে। এসে শহরটা দেখে বেড়াচ্ছেঁ।

হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড় এসে গেল। ডাক্তারবাবু সেখানে এসে বাঁ দিকে ঘুরলো। তাবপর আবাব উত্তবমুখো চলতে লাগলো। তারপর হাঁটতে হাঁটতে একেবারে বউবাজার স্ট্রীট। ছানাপটি। সিনেমা ভেঙেছে। বহু দর্শক পিল্ পিল্ করে বেবোচ্ছে—

কাশীপতিও পেছন-পেছন চলেছে। ডাক্তারবাবু তো দেখছি আবার যেখান দিয়ে শুরু করেছিল, সেখানেই যেতে আরম্ভ করেছে। আবার সেই মেডিকেল কলেজ, আবার সেই মধু গুপ্ত লেন!

তাহলে চেম্বারটা কোথায় ডাক্তারবাবুব ?

এতক্ষণ অফিস থেকে বেরিয়ে ডাক্তারবাবু বাড়ি গেল না কেন? অতো কাছে বাড়ি, তবু কেন বাড়ি গেল না? বাড়িতে না গিয়ে এতখানি রাস্তা ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়ে কী লাভ হলো? তাহলে কি ডাক্তারবাবুর নিজস্ব কোনও চেম্বার নেই? তাহলে কি ডাক্তারবাবু অফিসের ছুটির পর প্র্যাক্‌টিশ করে না?

তাহলে কি ডাক্তারবাবু অফিসে চাকরি করার পর আর কিছু করে না? শুধু কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করে?

যখন ডাক্তারবাবু বাড়িতে পৌঁছে সদর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো তখন কে একজন ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে।

আর ডাক্তারবাবু বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কাশীপতি পাশের একটা বাড়ি থেকে ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ শুনতে পেল। ঘড়ির শব্দ গুনে কাশীপতি বুঝল যে রাত তখন এগারোটা।

১১১

সেদিন অফিসে এলো কাশীপতি।

একটা নিরিবিলি ঘরে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম —কী খবর? সব সত্যি?

কাশীপতি বললে—এখনও ঠিক বলতে পারছি না স্যার। রোজই অখিসের ছুটিব পর ওঁর পেছন-পেছন যাই। তিনি যেখানে যান, আমিও সেখানে যাই।

—তাঁর কোনও চেম্বার নেই?

কাশীপতি বললে—না—

—তবে যে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলে গেলেন তাঁর স্বামী অফিস থেকে বেরিয়ে প্রাইভেট-প্র্যাক্‌টিশ করতে যান।

কাশীপতি বললে—সব একদম বাজে কথা। আমি এতদিন ধরে রোজ ডাক্তারবাবুর পেছন-পেছন যাই আর চেম্বার থাকলে কি একবারও তাঁর প্র্যাক্‌টিশ করা দেখতে পেতুম না?

—তাহলে তিনি কী করেন?

কাশীপতি বললে—কী আর করবেন। অফিস থেকে বেরিয়ে তিনি উত্তরমুখো গিয়ে মহাত্মা গান্ধি রোড বরাবর হাঁটতে হাঁটতে একটা চায়ের দোকানে ঢোকেন। সেখানে চা খেয়ে নিয়ে আবার বেরোন। রাস্তায় যদি কোথাও লোকের ভিড় দেখেন তো সেখানে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্তটা দেখেন। সেটা দেখা শেষ হলে আবার ধর্মতলার দিকে হাঁটতে শুরু করেন। একেবারে সোজা চলে যান ধর্মতলা স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর মুখোমুখি। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি লেক্চার-টেক্চার কিছু হ'লে শোনেন। তারপর ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত যান। যদি কোথাও কোনও বই-পত্রের স্টল থাকে তো পত্র-পত্রিকাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখেন। আসল উদ্দেশ্য হলো সময় কাটানো। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করেন বাড়ির দিকে। তারপর ঘড়িতে যখন প্রায় রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটা বাজে তখন বাড়ির সদর দরজার কড়া নাড়েন, আর কে একজন এসে দরজা খুলে দিলে তিনি ভেতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দেন।

—তারপর ?

কাশীপতি বললে—তারপর আমি আর কিছু দেখতে পাই না।

জিজ্ঞেস করলাম—এইরকম ব্যাপার কতো দিন ধরে দেখলে তুমি ?

কাশীপতি বললে—গেল পনেরো দিন ধরে আমি এইরকমই দেখে আসছি। আমার মনে হয় ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর মাথায় কিছু গণ্ডগোল আছে।

ভাবলাম—তা হতে পারে। তা না হ'লে স্ত্রী হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে কেউ পুলিশের কাছে ওইরকম নালিশ করতে পারে ?

বললাম—তবু দেখ চেষ্টা করে, যদি কিছু খবর বার করতে পারো—

আমার কথা শুনে কাশীপতি বললে—আমি ওই ব্যাপারে লেগে রইলুম স্যার। কিন্তু দেখবেন আমার একটা পাকা চাকরি যেন হয়।

আমি আশ্বাস দিতে সে চলে গেল। কিছু টাকাও তাকে খরচ-খরচা বাবদ দিলাম।

পুলিশের চাকরিতে ঢোকার পর থেকে দেখেছিলাম যে টাকার ওপরেই সমস্ত মানুষের আকর্ষণ। টাকার ওপর মানুষের আকর্ষণ থাকা

এমন কিছু নতুন জিনিস নয়। ওটা সব পেশাতেই থাকে। কিন্তু পুলিশের চাকরিতেই যেন তার প্রভাবটা বেশি। বিশেষ করে থানার পুলিশদের। টাকার আকর্ষণে তারা হঠাৎ-হঠাৎ বাজারে গিয়ে হামলা করে, হঠাৎ-হঠাৎ বেশ্যাপাড়ায় গিয়েও হামলা করে। আর তার ফলে বিনা-পয়সায় আলু পটল মাছ ডিম যেমন পাওয়া যায়, তেমনি বেশ্যা-পাড়ায় হামলা করলে হাজার-হাজার টাকা আধ ঘণ্টার মধ্যে আমদানি হয়ে যায়।

এ কলকাতা শহরের পুলিশ-জীবনের চিরাচরিত ঘটনা। বংশ-পরম্পরায় এই রকম আমদানি পুলিশ লাইনে চলে আসছে। পুলিশের চাকরি পাওয়ার জন্য সেইজন্যেই মানুষের এত আগ্রহ।

কিন্তু আমাদের পুলিশের লাইনে আরো অন্যরকম আকর্ষণ আছে। হঠাৎ কারো বাড়িতে অতর্কিতে হামলা করে যদি লাখ লাখ টাকা পাওয়া যায় তাতে বাড়ির আর টাকার মালিক স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে যায়। ভয় পাওয়ার কারণ ওই কাঁচা টাকা। সব কাঁচা টাকা তো ইন্‌কাম-ট্যাক্সের অফিসে দেখানো হয় না, দেখানো হলে টাকার মালিকের 'পেনাল্‌টি' বা শাস্তি হয়।

সেক্ষেত্রে যদি সেই টাকার মোটা কিছু অংশ পুলিশকে দেওয়া হয় তো সেটা পুলিশের উপ্‌রি-লাভ। সেই উপ্‌রি-লাভটার জন্যে অনেকের পুলিশের চাকরি করা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কাশীপাতির বোধহয় সেই লোভটা ছিল। তাই আমার কেস্‌গুলো সে অতো মন দিয়ে করতো। তা এর পরেই একদিন সেই ডাক্তারবাবুর বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটলো।

১১১

১২/২এ মধু গুপ্ত লেন-এর বাড়িতে একদিন তাদের ঠিকে-ঝি-টা একটা লোককে ধরে আনলে।

ডাকলে—মা, মা, ও মা—

বাড়ির গিন্নী বোধহয় রান্নাঘরে তখন রান্না করছিল। করুণার ডকা শুনে বেরিয়ে এলো।

বললে—কী রে, কী বলছিস? ডাকছিস কেন?

করুণা ঠিকে-ঝি। বাইরের কাজ সব সেই করে।

—ও কে রে? কাকে এনেছিস সঙ্গে করে? কী চায় ও?

করুণা বললে—তুমি যে একজন রান্নার লোক খুঁজছিলে, তাই একে এনেছি—

মা চেয়ে দেখলে লোকটার দিকে। গায়ে একটা পুরনো ফতুয়া, তারই ওপর পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। মাথাটা ন্যাড়া। মাথায় একটাও চুল নেই।

মা জিজ্ঞেস করলে—তুমি রান্নার কাজ করবে?

লোকটা বললে—হ্যাঁ, মা।

মা আবার জিজ্ঞেস করলে—তুমি রান্নার কাজ আগে কোথাও করেছ?

—হ্যাঁ মা, অনেক বাড়িতে করেছি।

—তাহলে এখন রান্নার কাজ নেই কেন তোমার?

লোকটা বললে—শ্যামবাজারে সাহাবাবুদের বাড়িতে কাজ করছিলুম। বাবার অসুখের খবর পেয়ে দেশে গিয়েছিলুম। সেখানে আমার বাবা মারা যাওয়াতে অনেক দিন থেকে গিয়েছিলুম। দেশ থেকে ফিরে এসে দেখলুম সাহাবাবুরা রান্নার জন্যে অন্য লোক রেখে দিয়েছে, তাই এখন বেকার বসে আছি—

—তোমার নাম কী?

—মোহন ভট্টাচার্যি।

মা আবার জিজ্ঞেস করলে—তোমার বিয়ে-থা হয়েছে?

মোহন বললে—না, মা—

—দেশে তোমার কে কে আছে ?

মোহন বললে—কেউ নেই। বাবা ছিল। তিনি মারা যাওয়ার পর এখন আর কেউ নেই—

—দেশের জমি-জমা ?

মোহন বললে—জমি-জমা দেশে কিছু নেই। আমি কলকাতায় চাকরি করে যা পেতুম তা-ই দেশে বাবাকে পাঠিয়ে দিতুম। এখন বাবা মারা গেছে, দেশে আর কিছু পাঠাতে হবে না।

—তুমি কতো টাকা মাইনে চাও ?

মোহন বললে—ছু'বেলা খাওয়া আর পরবার জামা-কাপড়টা দেবেন। তাইতেই আমার চলে যাবে। আর কিছু চাই না আমার—

মাইনে নেবে না, শুধু খাওয়া-পরা দিলেই কাজ করবে, এমন কাজের লোক কোথায় পাওয়া যাবে ?

মা বললে— তা থাকো, আজ থেকেই থাকতে পারবে তুমি ?

মোহন বললে—হ্যা, আমি তো এখন বেকার। কোনও কাজ নেই আমার। আজ থেকেই কাজ করতে পারি আমি—

মোহন সেই দিন থেকেই ওই মধু গুপ্ত লেনের বাড়িতে থাকতে লাগলো। শুধু রান্না-বান্নাই নয়, বলতে গেলে সব কাজই করতে লাগলো মোহন। গৃহস্থ বাড়ির যা-যা কাজ থাকে, তা সবই।

প্রথম দিন ভাত রাঁধলে। তার সঙ্গে একটা সাধারণ তরকারি, আর সকালবেলার ডাল রান্না ছিল, সেটা গরম করে দিলে।

মা খেতে বসলো, তার সঙ্গে খেতে লাগলো ছ'বছরের মেয়ে কমলা।

—আর ছুটো ভাত দেব মা ?

মা বললে—না। বাবুর জন্যে ভাত ঢাকা রেখে দিয়ে তুমি খেয়ে নাও—

মোহন জিজ্ঞেস করলে—বাবু কখন আসবেন ?

মা বললে—তিনি যখন আসবেন তখন আসবেন। তাঁর জন্যে

তোমার ভাবতে হবে না। সদর দরজায় কড়া নাড়লে তুমি খুলে দিও—

তাই-ই ঠিক রইলো।

মা আর মেয়ের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে মোহনও খেয়ে নিলে। এঁটো বাসনপত্রগুলো রান্নাঘরের ভেতর জড়ো করে রাখলো।

মা বললে—তুমিও খেয়ে নিয়ে তোমার এঁটো বাসনগুলো ওর সঙ্গে রেখে দিও। করুণা কাল সকালবেলা এসে রান্নাঘর ধুয়ে বাসনগুলো মেজে ফেলবে—

মোহন বললে—আমি বাসনগুলো মাজবো মা?

—তুমি?

মোহন বললে—হ্যা, আমি বাসন-কোসনও মাজতে পারি—

মা বললে—তা মাজো বাসনগুলো, তাহলে তো ভালোই হয়—

মোহন আবার জিজ্ঞেস করলে—আর বাবুর এঁটো বাসন?

মা বললে—সে তোমার মাজবার দরকার নেই। তাঁর ফিরতে অনেক রাত হবে। তুমি সদর দরজা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়ো। উনি ঢাকা খুলে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বেন।

এর পর মা নিজের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লো।

মোহন নিজের খাওয়া-দাওয়া সেরে সিঁড়ির নিচের একটা ঘরে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু ঘুম কি আসে? কেবল ভাবতে লাগলো কখন বাবু বাড়ি ফিরবে। ঘড়িতে তখন মাত্র সাড়ে ন'টা? তখনও তো দেড় ঘণ্টা বাকি এগারোটা বাজতে। মা তো ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে শুতে গেল। কিন্তু তাকে তো ঘুমোলে চলবে না। সে তো জানে রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটার আগে ডাক্তারবাবু বাড়ি ফিরবে না।

নতুন বাড়িতে প্রথম রাত কাটানো। মধু গুপ্ত লেন চওড়া গলি নয়। ওখান দিয়ে তেমন গাড়ি-ঘোড়াও চলে না যে শব্দ হবে। তাই চারদিকে চুপ-চাপ। রাস্তা দিয়ে রিক্শা চলবার শব্দও কানে আসছে

না। তার মানে অনেক রাত হয়েছে।

শেষকালে বাড়ির সদর দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হলো। কড়া-নাড়ার শব্দ শুনেই বোঝা যায় যিনি কড়া নাড়ছেন তিনি খুব সঙ্কোচ করেই কড়া নাড়ছেন। কড়া না নাড়তে হলেই তিনি যেন বেঁচে যেতেন, এমনি সঙ্কোচ। যেন তিনি কাউকেই বিরক্ত বা বিব্রত করতে চান না।

মোহন তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানা ছেড়ে উঠে উঠোন পেরিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছে।

দরজাটা খোলার পরই একটা নতুন মুখ দেখে ডাক্তারবাবু এক সেকেণ্ডের জন্যে একটু চম্‌কে উঠলেন। তারপর নিজেই বরাবরের মতো দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই মোহন দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

বললে—আপনি যান, আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।

ডাক্তারবাবু অন্ধকারের মধ্যে মোহনকে দেখবার চেষ্টা করছিলেন, হয়তো চেনবারও চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তার আগেই মোহন বললে—আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না বাবু। আমি আজকেই এ-বাড়িতে নতুন কাজে ঢুকেছি। আমার নাম মোহন—

মোহনের নাম নিয়ে কিন্তু ডাক্তারবাবু মোটেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন।

মোহন তার আগেই গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে ঘরের ভেতরের আলোর সুইচটা টিপে দিলে। দেড় ঘণ্টা আগেই মা বলেছিল বাবুর খাবারটা ওই ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে। তাই ঘরটার কোথায় কী আছে তা সবই তার জানা ছিল তখন।

বাবু ঘরে গিয়ে গায়ের জামাটা খুললেন। সারা দিন কোট-প্যাণ্টটা পরা ছিল, তাই ঘামে ভেজা ছিল।

মোহন বাইরের চৌবাচ্চা থেকে জল এনে দিলে। তিনি সেই জলে

হাত-মুখ ধুলেন। তারপর হাতের পায়ের মুখের জল মুছে খেতে বসবেন। কিন্তু তার আগেই মোহন ভাতের থালার ঢাকাটা খুলে নিয়ে একপাশে রেখে দিলে। জলের গেলাসে জল দিলে।

ডাক্তারবাবু যেন একটু অবাক হয়ে মোহনের দিকে একবার দু'বার চেয়ে দেখলেন। দেখে কী বুঝলেন কে জানে! কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু বললেন না।

শেষকালে যখন খাওয়া শেষ হয়ে গেল তখন এঁটো থালা-বাটিগুলো সরিয়ে কলতলার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু মোহন তার আগেই বললে—ওগুলো আমায় দিন, আমি ঠিক জায়গায় গিয়ে রেখে দেব, দিন আমায়—

মোহন এঁটো বাসনগুলো ঠিক জায়গায় রেখে দিয়ে এসে, খেতে বসবার জায়গাটা একটা ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলে। তারপর ডাক্তারবাবু সেই ঘরের এক কোণে রাখা বিছানাটা পাততে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মোহন বললে—আপনি সরুন, আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি—

বিছানাটা পাতবার পর মশারিটাও টাঙিয়ে দিলে সে।

তারপর বললে—আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি মশারিটা চারদিকে গুঁজে দিচ্ছি।

ডাক্তারবাবু তা-ই করলেন।

—আলো নিভিয়ে দিন বাবু।

—হ্যাঁ।

মোহন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে চলে এসে, নিজের সেই সিঁড়ির তলার ঘরটাতে এসে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম এলো না। তার কেবল মনে হতে লাগলো—এ কী রকম মানুষ এই ডাক্তারবাবু? তিনি বাড়িতে কখন এলেন, তিনি খেলেন কি খেলেন না, তা কেউ দেখলে না, জানলেও না। এ ঘটনা তো সরল নয়, স্বাভাবিকও নয়। অথচ এ-

বাড়ির কর্তা তো উনিই। উনি চাকরি করে টাকা উপায় করেন বলেই এ-সংসার চলছে। স্ত্রী রইলো তার নিজের ঘরে নিজের মেয়েকে নিয়ে আর স্বামী পড়ে রইলো একটা পরিত্যক্ত ঘরে। তাঁর খাবারটা ঢাকা পড়ে রইলো একটা ঘরে, এ কী রকম ঘর আর এ কী-রকমই বা ঘরণী।

কেন এ-রকম!

ক'দিন ধরেই তো সে 'কাশীপতি' হয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখে আসছিল বাইরে থেকে, আজ 'মোহন' সেজে তাঁর ভেতরটা দেখলে। এমন তো কোনও বাড়িতে দেখেনি সে। এমন তো কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

১১১

পরের দিন ভোরবেলাই তার ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে বাইরে এসে দেখলে তার আগেই ডাক্তারবাবু ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন।

মোহন ভাবলে হয়তো ডাক্তারবাবুর এইটেই বরাবরের নিয়ম। এই অতি ভোরে ঘুম থেকে ওঠা। তাও বাড়ির ভেতরের দিকের ভালো বাথ-রুমটাতে নয়, ঝি-চাকরদের জন্যে বাইরে যে খোলা কল-ঘরটা আছে তাইতেই গেছেন। তারপরেই সেই লাগোয়া চৌবাচ্চা থেকে মাথায় জল ঢেলে স্নান করে নিলেন। সেখানে নিজের কাপড়টাও তিনি কাচতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু মোহন কাপড়টা জোর করে কেড়ে নিয়েছে।

বললে—আপনাকে কাপড় কাচতে হবে না, আমি কেচে শুকোতে দেব'খন, আপনি নিজের ঘরে যান—

ডাক্তারবাবু তাতে আপত্তি করলেন না। ভিজে কাপড়টা ছেড়ে শুকনো কাপড়টা পরে নিলেন।

মোহন ভিজে কাপড়টা নিয়ে ভালো করে কেচে উঠোনের তারে শুকোতে দিলে,—ওদিকে সদর দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ কানে এল।

করুণা এসেছে। মোহন দরজা খুলে দিতে-না-দিতেই ওপর থেকে মা'র ডাক শোনা গেল—মোহন, এই মোহন—

মোহন চেঁচিয়ে জবাব দিলে—যাই মা।

ভেতরে যেতেই মা-ও চেঁচিয়ে উঠলো—এত দেরি কেন? কোথায় ছিলিস তুই? এই বেলা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলি?

মোহন বললে—না মা—

'না, মা'—বলে মা ভেঙচি কাটলে।

তারপর বললে—ঘুমোচ্ছিলি না তো এত দেরি কেন তোর?

মোহন বললে—বাবুর কাপড়টা কেচে দিচ্ছিলুম।

—বাবুর কাপড়টা কেচে দিচ্ছিলি? কেন? বাবু নিজের কাপড় নিজে কাচতে পারে না? কাল পর্যন্ত তো নিজের কাপড় বরাবরই নিজেই কাচতো, হঠাৎ কি বাবুর হাতে পক্ষাঘাত হলো নাকি?

মোহন বললে—না না, দেখলুম বাবু বুড়ো মানুষ, আমি থাকতে কেন কষ্ট করবেন, তাই—

—না—

মা বললে—না, তোকে আর অত ভক্তি-ছেদ্দা করতে হবে না। এদিকে সকালের জলখাবার করতে হবে না? চা তৈরি করতে হবে না? সে-সব কে করবে? আমি?

মোহন বললে—না মা, আমি করছি। ততক্ষণ উনুনে আগুন দিয়ে দিচ্ছি। কী জলখাবার করবো বলে দিন—

আঁচল থেকে পয়সা বার করে দিয়ে মা বললে—যা, দোকান থেকে একটা পাঁউরুটি নিয়ে আয়, আর এক প্যাকেট মাখন—

ততক্ষণে করুণা এসে এঁটো বাসন কলতলায় নিয়ে গিয়ে মাজতে বসেছে। সকাল থেকেই সাংসারিক জীবনের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে। পাঁউরুটির দোকান বেশি দূরে নয়। তাই মোহনের ফিরে আসতেও দেরি হলো না। সেউ পাঁউরুটি কেটে-কেটে সেঁকতে আর

কতোক্ষণ লাগবে! প্রত্যেকটা পাঁউরুটিতে মাখন লাগিয়ে মা আর কমলাকে দিলে। তার সঙ্গে চা।

মোহন জিজ্ঞেস করলে—বাবুকে টোস্ট দিয়ে আসবো মা?

মা বললে—না, বাবু পাঁউরুটি খান না, শুধু চা দিয়ে আয়—এখনি তো বাবু ভাত খাবেন—

ডাক্তারবাবুও যে বাড়ির একজন মানুষ, তা যেন কেউ স্বীকারই করতে চায় না এ-বাড়িতে।

মোহন নিচে গিয়ে বাবুকে শুধু চা দিয়ে গেল। বাবু তখন একমনে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মোহনের উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ ফিরিয়ে মোহনের হাতের চায়ের কাপটা নিলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না।

মোহন জিজ্ঞাসা করলে—বাবু, টোস্ট দেব আপনাকে?

কথাটা শুনে বাবু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন মোহনের দিকে। কী যেন বলতেও চাইলেন। কিন্তু আবার কী ভেবে বললেন—না, থাক—

বাবু চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। মোহনও ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল।

ভেতরে ততক্ষণে করুণা বাসন মেজে রেখে বাজারে চলে গেছে। বাজার বেশি দূরে নয়। কোলে-বাজার বউবাজারের মোড়েই।

বাজার করে করুণা ফিরলো।

মোহন জিজ্ঞাসা করলে—কী রাঁধবো মা আজ?

মা বললে—মাছ কী এনেছে করুণা?

মাছ দেখে মা বললে—আলু পটল দিয়ে মাছের ঝোল হবে, আর পটল-ভাজা—আর কিছু না—

সংসারের সব দিকে মোহন নজর দিয়ে দেখতো। মা সারাদিন কী কাজ করে, মেয়ে কী করে তাও লক্ষ্য করতো মোহন কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

যতো লক্ষ্য করতো ততোই অবাক হয়ে যেত সে। আগে হয়তো মা রান্না-বান্না করতো একটু-আধটু। কারণ, না করে উপায় ছিল না। কিন্তু মোহন বাড়িতে আসার পর থেকে আর সে-সবও করতে হয় না।

করুণা ততক্ষণ ঘর-দোর ঝাড়া-মোছা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। মোহন আসার পর থেকে তারও কাজ অনেক কমে গেছে।

আর মা?

মা কেবল নিজের ঘরে বসে বসে বই পড়ে। মোটা মোটা বইগুলো একদিন-দু'দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। আবার করুণাকে গিয়ে পাড়ার লাইব্রেরী থেকে নতুন বই নিয়ে আসতে হয়। পড়া শেষ হয়ে গেলে আবার করুণাকেই গিয়ে সেখান থেকে নতুন আর-একটা বই নিয়ে আসতে হয়।

আর মেয়ে? কমলা?

কমলা পাড়ারই একটা মেয়েদের স্কুলে পড়তে যায়। সে একলাই স্কুলে যায় আর একলাই ফিরে আসে।

ওদিকে বাবু যে অফিসে যাবেন সে-দিকে বলতে গেলে কারোরই খেয়াল থাকে না। করুণাকে দেখতে পেলে বলেন—ওরে, আমাকে ভাত দিতে বল্‌, আমার অফিসে যেতে দেরি হয়ে যাবে—

এ-রকম কথা প্রথম দিনে বাবুকে বলতে হলো। কিন্তু মোহন যেদিন থেকে এসেছিল সেদিন থেকে আর বলতে হলো না। সে জানতো বাবু কখন ক'টার সময়ে অফিসে যান।

মোহন প্রথম দিনেই মাকে জিজ্ঞেস করলে—মা, বাবুর ভাত দিয়ে আসি গে, বাবু তো এখন আপিসে যাবেন?

মা বললে—হ্যাঁ, দিয়ে আয়—

ভাত, মাছের ঝোল আর পটল-ভাজা থালায় সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এল বাবুকে।

বাবু জামা-কাপড় বদ্‌লে তৈরি হয়েই ছিলেন। ভাতের থালা গিয়ে

দিতেই তিনি নিজেই আসনটা টেনে নিয়ে তার ওপরে বসে খেতে আরম্ভ করলেন। মোহন একটা গেলাসে জল ভর্তি করে ভাতের থালার পাশে রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবু খেতে লাগলেন আর মোহন পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

—আর দুটি ভাত নেবেন বাবু ?

—না।

মোহন বললে—'না' বলছেন কেন ? এই ক'টা ভাত খেয়ে আপিসে কাজ করবেন কী করে ?

বাবু এ-কথার জবাব দিলেন না। তিনি কিছু কথা না বলে তাড়াতাড়ি ভাত-তরকারিগুলো খেয়ে নিয়ে উঠে পড়লেন। তারপর মোহন এক হাতে থালা বাটি গেলাস তুলে নিয়ে অন্য হাতে ভিজে কাপড় দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে কলতলায় চলে গেল।

কলতলায় গিয়ে বাবুর দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। এ মানুষটা কেমন পুরুষ মানুষ! এত অবহেলা এত অনাদর পেয়েও মানুষটার কোনও রাগ নেই, কোনও দাবি নেই, কারো ওপর কোনও ক্ষোভ নেই, কারো ওপর কোনও আকর্ষণও নেই। মানুষের সংসারে এমন মানুষ যে সত্যিই থাকতে পারে তা যেন ভাবাও যায় না।

তারপর প্রতিদিন বাবু যেমন অফিসে যান তেমনি চলে গেলেন। তারপর করুণা সকলের বাসী কাপড় জামা শায়া ব্লাউজ সাবান-কাচা করে উঠোনের দড়িতে শুকোতে দিয়ে দিনের কাজ শেষ করে চলে গেল।

যাওয়ার সময় শুধু বলে গেল—মা, তাহলে আমি আসি ?

তারপর একে একে সবাই দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিলে। মোহনও খেয়ে নিলে। তারপর মা আর মেয়ে দুজনেই হয় বই পড়া না-হয় দিবানিদ্রার জন্যে নিজের ঘরে চলে গেল।

মোহনের তখন আর কোনও কাজ নেই। সেও তখন নিজের সিঁড়ির নিচের ঘরে গিয়ে বিশ্রামে গা এলিয়ে দিলে।

কিন্তু দিবানিদ্রার নাম-গন্ধ এলো না তার চোখে। কেবলই ভাবতে লাগলো—এ কী-রকম সংসার, এ কী-রকম গৃহিণী, এ কী-রকম বাড়ির বাবু, এ কী-রকম বাড়ী! কারো মুখে কোনও কথা নেই, কারো মুখে কোনও হাসি নেই, কেবল ঘুমোনো, খাওয়া আর ঘুম থেকে জেগে ওঠা। সত্যিই, এ কোন্ বাড়িতে এলো সে! কলকাতা শহরে বোধহয় এমন বাড়ি একটাও আছে কিনা সন্দেহ।

বেলা সাড়ে তিনটের সময়ে আবার বাড়ির সদর-দরজার কড়া-নাড়ার শব্দ হলো।

বোঝা গেল করুণা এসেছে!

মোহন উঠে দরজা খুলে দিলে। তখন আবার আগের দিনের মতো আরম্ভ হলো ১২/২এ মধু গুপ্ত লেনের বাড়িটার জীবন-যাত্রা। তারপরে সে আবার সন্ধ্যেবেলাই রান্না-বান্না শুরু করবে। ন'টা সাড়ে-ন'টা বাজলেই মা আর মেয়ে খেয়ে নেবে। তারপর মোহন নিজেও খেয়ে নেবে। বাবুর ভাতের থালা নিয়ে গিয়ে বাবুর ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়ে আসতে হবে। পাছে বেরাল এসে ভাত-তরকারি খেয়ে নেয় তাই ঘরের দরজাটা শেকল দিয়ে বন্ধ করে রাখতে হবে। তারপর সে নিজেও খেয়ে নিয়ে সব এঁটো বাসন-কোসন কলতলায় জড়ো করে রেখে নিজের সেই ঝুপড়ির ভেতর গিয়ে শোবে। আর তারপর ঘড়িতে রাত এগারোটা কি সাড়ে-এগারোটা বাজবে তখন সদর-দরজার কড়া নাড়বে বাবু। আর তাও খুব আস্তে আস্তে। এমনভাবে নাড়বে যাতে কেউ বিরক্ত না হয়, কেউ বিব্রত না হয়।

১১১

এমনি করেই চলছিল। হঠাৎ একদিন এক অঘটন ঘটলো।

সোমনাথ বলতে লাগলো—মানুষের মনের গোপন কোণে যে কতো দুঃখ লুকিয়ে থাকে তা কি বাইরের থেকে কেউ দেখতে পায় ? সাধারণত, সেখানে কেউ কাউকে ঢুকতে দেয় না। আইনস্টাইন তো অতো বড়ো বৈজ্ঞানিক, পৃথিবী-জোড়া তাঁর নাম। তাঁর ছেলের যে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ছিল তা কি কেউ জানতো ?

এই ডাঃ সঞ্জয় দত্তর মনের ভেতর কী দুঃখ এবং কতো দুঃখ ছিল তা কি পাড়ার কোনও লোক জানতো, না তার অফিসের সহকর্মীরাই জানতো ? সে তো অন্য সকলের মতো ঠিক নিয়ম করে বাড়ি থেকে অফিসে বেরোত, ঠিক নিয়ম করে অফিসের ছুটির পরে বাইরে বেরোত। কিন্তু অন্য সকলের মতো কেন সে সাধারণ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারতো না ? কেন তাকে নিজের বাড়িতেই অস্পৃশ্য অবহেলিত হয়ে দিন কাটাতে হতো ? তার কারণটা কী ?

সব সংসারেই তো স্বামী-স্ত্রী থাকে। সব সংসারেই তো বাবা-মা মিলিত ভাবে সংসার চালায় ? তবে কেন স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসে পুলিসের কাছে ?

সেদিন মোহন যথারীতি অন্য দিনের মতো তার সেই সিঁড়ির তলার ঝুপড়িতে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ বাবুর ঘরে মা'র গলার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল। মা যেন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করছে মনে হলো।

—বলো, উত্তর দাও! চুপ করে আছো কেন ?

ডাক্তারবাবুর তরফ থেকে কোনও জবাব নেই।

মা আবার বলছে—কেন তুমি আমার কাছে সব কিছু লুকিয়েছিলে ?

তবু ডাক্তারবাবু চুপ।

মা আবার গলা চড়িয়ে বলে উঠলো—আমি তোমার কাছে কী দোষ

করেছিলুম, বলো ? কী দোষ করেছিলুম ?

ডাক্তারবাবু তবু চুপ। তাঁর মুখ থেকে তখনও কোনও কথা শোনা গেল না।

—কী হলো ? তোমার মুখে কথা নেই কেন ? তুমি বোবা ?

এ-কথারও জবাব না দেওয়াতে মা যেন মনে হলো আরো রেগে গেল।

—বলো, কে রোজ আসে আমার ঘরে ? কেন আমাকে মারতে আসে সে ?...কে সে ? আমার বাপ-মা কেউ নেই বলে তুমি এমনি করে আমায় ঠকাবে ? আমায় এমনি করে কাঁদাবে ?

তবু ডাক্তারবাবুর তরফ থেকে কোনও অভিযোগের উত্তর শোনা গেল না।

—তুমি কি বোবা ? কথা বলছো না কেন ?

এতক্ষণে ডাক্তারবাবুর গলা শোনা গেল।

ডাক্তারবাবু বললেন—আমি তখন বুঝতে পারিনি।

—বুঝতে পারোনি বলে তোমার সব দোষ মাফ হয়ে গেল ?

ডাক্তারবাবুর দিক থেকে এর কোনও জবাব নেই।

মা আবার বললে—তবু কোনও কথার জবাব দেবে না তুমি ?

ডাক্তারবাবু তবু চুপ।

মা আবার বললে—কেন তুমি আমায় বলোনি যে তুমি আগে আর একটা বিয়ে করেছিলে ? কেন বলোনি ?

ডাক্তারবাবু এবারও কোনও জবাব দিলেন না।

মা বললে—কই, বলছো না তো যে কেন সে-বিয়ের কথা লুকিয়েছিলে আমার কাছে ? বলো, কেন তুমি লুকিয়েছিলে ?

এবার ডাক্তারবাবু মৃদু গলায় একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন। বললেন—সে-কথা বলার বোধহয় দরকার হয়নি !

—দরকার হয়নি মানে ? বিয়ের সম্বন্ধ করবার সময়ে এটা জানানো

দরকার নয় যে আগে পাত্রের একটা বিয়ে হয়েছিল কিনা।

ডাক্তারবাবু বললেন—আমি তো আমার বিয়ের সম্বন্ধ করিনি। সম্বন্ধ করেছিলেন তো আমার মামা। আমি তো বিয়ের আগে তোমাকে দেখতেও যাইনি—

মা বললে—তাহলে সেই সময়ে তোমার মামার তা খুলে বলা উচিত ছিল—

ডাক্তারবাবু বললেন—মামার কথা মামা জানেন। তিনি যদি বলে না থাকেন তো তিনি অন্যায় করেছিলেন।

মা বললে—তোমার মামার অন্যায়ের জন্যে আমি কেন ভুগবো, বলো?

—তিনি তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন। তুমি তাহলে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করো গিয়ে।

মা বললে—কোথায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে বোঝা-পড়া করবো?

ডাক্তারবাবু বললেন—স্বর্গে—

—যিনি এতবড় সর্বনাশ করেছেন আমার, তিনি কখনও স্বর্গে যেতে পারেন না—

ডাক্তারবাবু বললেন—তাহলে নরকে যাও—

—আমার নরকে যেতে বয়ে গেছে। তুমিই নরকে যাও। তুমি মরো। তুমি মরলে আমি বাঁচি!

ডাক্তারবাবু বললেন—তুমি তাহলে আমাকে বিষ খাইয়ে মারো। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমিও তাহলে বাঁচি। রোজ-রোজ এক কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।

মা বললে—রোজ রোজ এত কথা বলতে কি আমারই ভালো লাগে! সে যে রোজ রোজ আমার কাছে এসে আমাকে শাসায়। আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। আমি কী করবো বলো? আমার মরণ হয় না কেন? আমি কী করি, বলতে পারো?

বলে মা কাঁদতে লাগলো।

আর তারপর খানিক পরেই ঘরের আলো নিভে গেল। আর তার-পর আবার সব আগেকার মতো চুপ-চাপ।

সেই অন্ধকার সিঁড়ির তলায় শুয়ে-শুয়েই মোহন ভাবতে লাগলো —এ কী-রকম সংসার, এ কী-রকম স্বামী-স্ত্রী! এ কী-রকম বাড়ি! এ-রকম বাড়ি যে কোথাও থাকতে পারে, তা সে কল্পনাই করেনি কখনও···

তারপর মোহন এক সময়ে ডাক্তারবাবু আর মা'র কথা ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লো।

১১১

সোমনাথ বললে—একটা ছুটির দিন সকালবেলা ঘরে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, হঠাৎ একটা অচেনা লোক আমার ঘরে ঢুকলো।

জিজ্ঞেস করলাম—কে? কী চাও?

লোকটা হাসতে হাসতে বললে—আমি কাশীপতি স্যার—

আমি তার মেক্-আপ্ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। একেবারে চিনতে পারিনি, মাথাটা পুরো কামানো। গায়ে একটা ময়লা ফতুয়া, গলার পৈতেটা বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরনে আধ-ময়লা একটা ধুতি। আর পায়ে একটা সাধারণ চপ্পল।

বললাম—এ-রকম মেক্-আপ্ নিয়েছ কেন তুমি কাশীপতি—

—মেক্-আপ্ নেব না? না নিলে ওই ডাক্তার সঞ্জয় দত্তের বাড়ির খবর জানবো কী করে? আমি তো এখন ওই বাড়ির ঠাকুর। আমি ওই বাড়িতে রান্না-বান্নার কাজ করি। ও-বাড়িতে আমার নাম—মোহন—

বললাম—বাঃ, খুব ভালো অভিনয় করতে পারো তো তুমি!

কাশীপতি আমার প্রশংসা শুনে গেল। বললে—আমার চাকরির

কথা আপনার মনে থাকবে তো স্যার !

বললাম—সে তুমি ভেবো না। এই কেস্‌টা কেমন করে তুমি ট্যাকল করো সেইটে আমি আগে দেখি।...তা তুমি রান্না করতে শিখলে কবে ? কে তোমাকে রান্না করতে শেখালে ?

কাশীপতি বললে—আমি তো স্যার গরীবের ছেলে। আমরা হলুম কলকাতার বনেদী গরীব। আমাদের রান্না শেখবার দরকার হয় না। ছোটবেলা সব কাজ নিজের হাতে করে করে সব সাব্‌জেক্টে আমরা ফার্স্ট। তা ও-বাড়ির মা আমার রান্না খেতে খুব ভালোবাসে। মা বলে—'তুই এতো ভালো রাঁধিস মোহন, এ রান্না কোথায় কার কাছে শিখলি ?' আমি বলি—আমি গরীব লোকের ছেলে মা, ছোটবেলা থেকেই আমাদের রাঁধা অভ্যেস।

আমি বললাম—ও-সব কথা থাক, আগে আসল খবরটা কিছু জানতে পারলে কিনা তাই বলো আমাকে—

কাশীপতি বললে—আসল খবরটা কিছু জেনেছি—

—কী রকম ?

কাশীপতি বললে—আমি তো প্রথমদিকে রাস্তার চায়ের দোকান থেকে সব দেখতুম। ডাক্তারবাবু বাড়ি থেকে কখন বেরোয়, কখন অফিসে যায়, কখন অফিস থেকে বেরোয়, সব কিছু লক্ষ্য করতুম। শেষকালে ভাবলুম দেখি ডাক্তারবাবু অফিস থেকে নিজের ডাক্তারখানায় কখন যায়...

—কী দেখলে ? ডাক্তারবাবুর চেম্বারটা কোথায় ?

কাশীপতি বললে—চেম্বার থাকলে তো তবে চেম্বারে যাবে। ডাক্তারবাবুর তো চেম্বার-ই নেই।

—তার মানে ?

বললাম—কী করে তুমি জানলে যে ডাক্তারবাবুর চেম্বার নেই ?

কাশীপতি বললে—আমি যে তারপর একদিন ডাক্তারবাবুর পেছন-

পেছন গেলুম।

—পেছন-পেছন গেলে?

কাশীপতি বললে—হ্যা স্যার। আমি একদিন ঠিক করলুম যে আমি দেখবো অফিস থেকে ছুটির পর ডাক্তারবাবু কোথায় যান। উনি সমস্ত কলকাতাটাই পায়ে হেঁটে ঘুরলেন। তারপর দেখলুম রাস্তায় যা-কিছু ঘটনা ঘটছে সেখানেই দাঁড়িয়ে খানিকটা সেই তামাসা দেখলেন। এই রকম করে হেঁটে হেঁটে যখন দেখলেন অনেক রাত হয়েছে, রাস্তাগুলোতে মানুষের ভিড় একটু কমেছে, তখন বাড়ি ফিরলেন। রাত্তির এগারোটা সাড়ে-এগারোটার আগে কখনও বাড়ি ঢোকেন না—

—সে কী? কেন? বাড়ি ঢোকেন না কেন?

—আমিও তো তাই ভাবলুম। অফিসের ছুটির পর সবাই তো নিজের নিজের বাড়িতে ফেরে। তাই-ই তো আমি অন্য লোকের ব্যাপারে এতকাল দেখে এসেছি। কিন্তু এ লোকটা কেন এত দেরি করে বাড়ি ফেরে? বাড়িতে বউ রয়েছে, মেয়ে রয়েছে, তাদের সঙ্গে তো গল্পও করতে পারে অন্য লোকেদের মতো। কিন্তু তা না করে কেন ডাক্তার-বাবু বিনা কাজে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান?

—তার কিছু কারণ খুঁজে পেয়েছ তুমি?

কাশীপতি বললে—হ্যা, আমি তো ডাক্তারবাবু যে ঘরে শুয়ে থাকেন, সেই ঘরের কাছেই সিঁড়ির তলায় শুই। সেদিন হঠাৎ মা'র গলার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। আমি শুনতে পেলাম—মা ডাক্তারবাবুকে ধমক দিচ্ছে—

—ধমক দিচ্ছে মানে?

—হ্যাঁ, ধমকের সুরেই কথাগুলো বলছে। বলছে ডাক্তারবাবু যে আগে আর একটা বিয়ে করেছিলেন তা ডাক্তারবাবু মাকে জানাননি কেন?

বললাম—সে কী, ওই মলিনা দত্ত তাহলে ডাক্তারবাবুর দ্বিতীয়

পক্ষের স্ত্রী নাকি ?

কাশীপতি বললে—আমি তো তাই শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এ-কথা তো আমি জানতুম না। এ-কথা তো আপনিও আমাকে জানাননি ?

বললাম—মহিলা তো আমাকেও সে-কথা বলেননি। তা দ্বিতীয় পক্ষের বউ হলে ক্ষতিটা কী ? পৃথিবীতে বহু লোকই তো দ্বিতীয়বার বিয়ে করছে।

কাশীপতি বললে—বউটার রাগের কারণ হচ্ছে, কেন স্বামী বিয়ে করবার আগে সে-কথাটা কাকা-কাকীমাকে জানায়নি, বিয়ের পরেও কেন স্ত্রীকে জানায়নি।

জিজ্ঞেস করলাম—তাতে এমন আর কী-ই বা ক্ষতি ? সে-কথাটা জানালে কি ওই পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হতো না ?

কাশীপতি বললে—কে জানে !

—তা ডাক্তারবাবুর ওপর সেইজন্যে তার স্ত্রী এত বড়ো শাস্তি দেবে ?

কাশীপতি বললে—তাই তো দেখছি।

বললাম—না, নিশ্চয়ই এর পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে। তুমি ভালো করে আরো কিছুদিন খোঁজ-খবর নাও। এই সামান্য অপরাধের জন্যে কোনও স্ত্রী তার স্বামীর ওপরে এত বড়ো প্রতিশোধ নিতে পারে না।

কাশীপতি বললে—আমারও তো সেই প্রশ্ন ছিল। কিন্তু ডাক্তার-বাবুর স্ত্রীর কাছে যে আগেকার বউ ভূত হয়ে আসে—

—ভূত ? তুমি বলছো কী ?

—হ্যাঁ, সেই আগেকার বউ যে মাঝে-মাঝে রাত্তির-বেলা বউটার ঘরে এসে হাজির হয়।

—সেকি !

কাশীপতি বললে—সেদিন তো বউ সেই কথাই বলে গেল ডাক্তার-বাবুকে। বললে—আজও সে এসেছিল। এসে আমায় গালাগালি দিতে লাগলো।

—শুনে ডাক্তারবাবু কী বললেন ?

কাশীপতি বললে—ডাক্তারবাবুর তো এ-সব গা-সওয়া হয়ে গেছে, কিছুই বললেন না।

বললাম—ডাক্তারবাবুর বিয়ে কোন্ বাড়িতে হয়েছিল—সেটা তুমি জানতে পেরেছ ?

কাশীপতি বললে—তা জেনে আমাদের কী লাভ হবে ?

বললাম—বউ-এর জীবন কোথা থেকে শুরু, কী অবস্থায় মানুষ হয়েছে, এটা জানতে পারলে এখনকার এই স্বামীর সঙ্গে তার ব্যবহারের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

কাশীপতি বললে—আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি কমলাকে কায়দা করে একদিন তার মামার বাড়ি কোথায়, তা জিজ্ঞেস করবো—

কাশীপতি চলে গেল।

কিন্তু চলে যেতে গিয়েও আবার আমার দিকে মুখ করে একবার জিজ্ঞেস করলে—আমার চাকরির কথাটা মনে আছে তো স্যার ?

বললাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে, তুমি কিছু ভেবো না। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও—

১১১

কথা বলতে বলতে সোমনাথ থামলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ? সত্যিই, কতো বিচিত্র কেস্-ই তোমাদের কাছে আসে।

সোমনাথ লেখক হলে তাদের অফিসের কেস্-হিস্ট্রীগুলো নিয়েই অনেক গল্প লিখতে পারতো। কিন্তু আসলে শুধু ঘটনা জানা থাকলেই

তো আর গল্প লেখা যায় না। যেমন আটা হলেই তো রুটি তৈরি করা যায় না। সেই আটাকে জল দিয়ে প্রথমে মাখতে হয়। মেখে লেচি পাকাতে হয়। তারপর চাকির ওপরে বেলুন দিয়ে তাকে রুটির আকারে বেল্‌তে হয়। তারপর উনুনের আগুনে সেঁকতে হয়। তবে সেই আটা রুটিতে রূপান্তরিত হয়।

সেইজন্যেই সোমনাথ বলতো—পুলিশের কাজ হলো চোর ধরা। বিচারকের কাজ তার বিচার করে তাকে ছেড়ে দেওয়া কিম্বা শাস্তি দেওয়া। আর জেলারের কাজ সেই চোরকে বন্দী করে রাখা। কিন্তু কে চোর তৈরি করবে? পুলিশ কিম্বা হাকিম কিম্বা জেলার কেউই তাকে চোর করতে পারবে না। মানুষকে চোর করতে গেলে কেবল দরকার হবে সৃষ্টিকর্তার। লেখক হলো সেই সৃষ্টিকর্তা। আমি তোমাকে এই মিসেস দত্ত আর ডাক্তার সঞ্জয় দত্তর জীবনের ঘটনাগুলো বলতে পারবো, কিন্তু তুমি তোমার বিদ্যে-বুদ্ধি দিয়ে তাকে একটা চরিত্র করে তুলবে।

আমি বললাম—দেখি চেষ্টা করে, পারি কিনা? তারপরে কি কাশীপতি কোনও হদিস দিতে পারলে?

কাশীপতি একদিন অবসরমতো কমলাকে জিজ্ঞেস করলে—তুমি মামার বাড়ি যাও না কমলা?

কমলা বললে—হ্যাঁ, আমার মা'র সঙ্গে আমি মামার বাড়ি যাই—

—কোথায় তোমার মামার বাড়ি?

কমলা বললে—শ্যামবাজারে।

—শ্যামবাজারে, কোন রাস্তায়?

ছোট মেয়ে বটে কিন্তু তা'বলে তার বুদ্ধি কম নয়। ঠিকানাটাও বললে সে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোমার মামা আছে সেখানে?

কমলা বললে তার মামা-টামা কেউ নেই সেখানে। শুধু দাদু আর

দিদা আছে।

খবরটা যোগাড় হওয়ার পর থেকেই কাশীপতি খুঁজতে গেল কমলাদের মামার বাড়ি ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের বাড়ীর খবরাখবর জানবার জন্য।

ভাই, আমি কাশীপতিকে যতো আনাড়ি ভেবেছিলুম, আসলে ততো আনাড়ি সে নয়।

মাসখানেকের মধ্যেই সে মিসেস দত্তর বাপের বাড়ির সব খবর এনে হাজির করলে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এসব খবর কী করে যোগাড় করলে তুমি?

কাশীপতি বললে—আমাদের দেশের একজন লোক পেয়ে গেলুম আমি। সে সেই পাড়াতেই থাকে। তাকে বললুম—আপনি ওই অবিনাশবাবুকে চেনেন?

আমাদের দেশের লোক বললেন—খুব চিনি। উনি তো আমার বন্ধু—

তাকে বললুম আমার সব কথা। বললুম যে ওই অবিনাশবাবুর বাড়ির খবর যোগাড় করতে পারলে আমার পুলিশের অফিসে একটা পাকা চাকরি হয়ে যাবে।

আমাদের দেশের লোক, সুতারং তিনি যা জানেন তা আমাকে বললেন।

আমি কাশীপতির কাছ থেকে সব খবর জেনে নিলুম।

অবিনাশবাবু নিজে নিঃসন্তান। কিন্তু বড়ো দাদা যখন মারা যান তখন একমাত্র একটি ছোট মেয়ে রেখে মারা গিয়েছিলেন। তখন থেকে ওই অবিনাশবাবু আর তাঁর স্ত্রী ওই বাপ-মা-মরা ভাইঝিটিকেই নিজেদের মেয়ের মতোই মানুষ করতে লাগলেন। তার মানে ওই মলিনা বসুই বলতে গেলে তাঁদের নিজের মেয়ের মতো হয়ে গেল।

অনেক বেশি বয়েস পর্যন্ত মলিনা জানতো যে ওই অবিনাশবাবুরই মেয়ে সে।

কাকাকেই মলিনা প্রথমদিকে বাবা বলে ডাকতো। আবদার করতো, বায়না করতো ঠিক নিজের বাবার মতোই।

স্কুলে যখন পড়তে ঢুকলো তখন সে জানলো যে তার বাবার নাম অবিনাশচন্দ্র বসু। স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসও তাই জানলো, সে নিজেও তাই জানলো।

কাকীমা নিজেও ভাসুরের মেয়েকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতো।

যা কেউই জানতো না সেইটেই বিয়ের আগে সবাই জানতে পেরে গেল।

যারা বিয়ের আগে তাকে দেখতে এলো তাদের কাছেই অবিনাশবাবু প্রথম প্রকাশ করলেন যে মলিনা আমার মেয়ে নয়। আসলে পাত্রী আমার দাদার মেয়ে

তখন খবরটা জানতে পেরে সে রেগে গেল।

শুধু যে রেগে গেল, তা-ই নয়। কান্নাকাটিও করতে লাগল।

কাকীমা সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

বললে—তাতে অতো কান্নাকাটি করার কী আছে?

মলিনা বললে—তোমরা আমাকে ঠকালে কেন?

কাকীমা বললে—তা আমারা তো তোকে নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছি। তুই কি আমাদের পর? পরের মতো কি তোকে কখনও মনে করেছি? আমাদের নিজেদের ছেলে-মেয়ে নেই বলে তোকেই আমরা নিজেদের মেয়ের মতো মানুষ করেছি। তুই যখন যা চেয়েছিস তখন তাই-ই দিয়েছি। তাতে হয়েছেটা কী?

তবু মেয়ের রাগ থামলো না।

বললে—না, তোমরা আমাকে ঠকালে কেন ?

—ওমা, কখন আমরা আবার তোকে ঠকালুম ?

মলিনা বললে—ঠকাওনি ? আমি যে পরের মেয়ে, সে-কথা আমাকে জানালে কী ক্ষতিটা হতো ?

কাকীমা বললে—তোকে জানাবার দরকার হয়নি বলেই জানাইনি।

অবিনাশবাবুও তাই বললেন। মলিনাকে অনেক বোঝালেন।

বললেন—তুই যাতে আমাকেই বাবা বলে জানতে পারিস, সেই-জন্যেই তোকে কিছু জানাইনি! বলে দিলে তো তোর মনটা খারাপ হয়ে যেতো! তখন তোর মনে হতো তুই পরের কাছে মানুষ হচ্ছিস।

কিন্তু বললে কী হবে, মেয়ের তাতে রাগ এতটুকু কমলো না। সেদিন সে রেগে গিয়ে ইস্কুলও গেল না, ভাতও খেলে না।

কাকা এসে সত্যি-সাধ্য-সাধনা করতে লাগলো।

—ওরে খুকু, ওঠ ওঠ, ইস্কুলে যাবি তো না যাবি, ভাতটা খেয়ে নে—

সত্যিই সেদিন মলিনা মনে বড়ো কষ্ট পেয়েছিল। সে কষ্ট যে কতো ভীষণ তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

অথচ এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। অনেক মানুষের জীবনেই এমন ঘটে থাকে। তবু কেন যে মলিনা মনে অতো কষ্ট পেয়েছিল তা অবিনাশবাবুও বুঝতে পারেননি, আর তাঁর স্ত্রীও বুঝতে পারেনি।

তখন থেকেই মেয়ে যেন কেমন বদলে গেল।

যে-মেয়ে অতো ছট্‌ফটে ছিল, যে-মেয়ের মুখে সব সময় কথার খই ফুটতো সেই মেয়ে তখন থেকে যেন একেবারে বোবা হয়ে গেল।

আরো দু'একজন ভদ্রলোক বিয়ের জন্যে তাকে দেখতে এলেন।

তাঁদের প্রশ্নের উত্তরগুলো ঠিক আশানুরূপ হলো না। এমন গম্ভীর-গম্ভীর স্বভাবের মেয়ের সঙ্গে কে তাদের ছেলের বিয়ে দেবে?

অবিনাশবাবুও ঠিক করলেন যে মলিনার যতো তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় ততোই মঙ্গল।

তখন থেকে পাত্রের সন্ধান শুরু হয়ে গেল। তখন থেকে মলিনা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতে থাকতে লাগলো।

কাকীমা বলতো—কী রে, তুই ইস্কুলে যাবি না?

মলিনা মুখ গম্ভীর করে থাকতো।

অনেকবার জিজ্ঞেস করবার পর তখন বলতো—না—

—কেন? ইস্কুল তোর কী দোষ করলো?

এ-কথার কোনও উত্তর দিত না সে।

যে বয়সে মেয়েরা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প করে, লেখা-পড়া করে, সিনেমা দেখবার জন্যে ছট্‌ফট্ করে, সেই বয়েসের মেয়ে হয়ে এ কী-রকম কাণ্ড!

কাকীমা জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁরে, সিনেমা দেখতে যাবি?

কাকীমা ভেবেছিল সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলে হয়তো মেয়ের স্বভাব-চরিত্র বদলাবে। সে আবার স্বাভাবিক হবে। অন্য মেয়েদের মতো সাধারণ হয়ে উঠবে।

কিন্তু না।

একদিন অবিনাশবাবু আর স্ত্রী, তাঁরা সকালবেলাই মলিনাকে খুঁজে পাচ্ছেন না, এ-ঘর ও-ঘর সব ঘর দেখলেন। আশেপাশের বাড়িতেও সন্ধান করলেন। মলিনার বয়েসী মেয়ে মৃদুলাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁরে মৃদুলা, মলিনাকে দেখেছিস তোরা?

—কেন কাকীমা?

—সকাল থেকেই তাকে খুঁজে পাচ্ছিনে। ভাবলুম তোদের বাড়িতে হয়তো গেছে—

মৃদুলা বললে—আমাদের বাড়িতে তো সে কখনও আসে না—

—তাহলে কোথায় গেল বল্ দিকি মা ?

অবিনাশবাবুও বিচলিত হয়ে উঠলেন। এমন তো হয় না। সে তো বাড়ি থেকে কখনও বাইরে কোথাও যায় না। যেদিন থেকে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সেই দিন থেকেই সে বাইরে যাওয়া বন্ধ করেছে —বাড়ির কাকা-কাকীমার সঙ্গে কথা না বলুক, নিজের ঘরের ভেতরে খিল্ বন্ধ করে শুয়ে কিম্বা বসে থাকে।

কাকীমা বললে—তুমি একবার থানায় গিয়ে খবর দিয়ে এসো, শেষকালে যদি বাইরে গিয়ে গাড়ির তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অবিনাশবাবু নিজেও ভাবছেন—কথাটা অবিশ্বাস্যও নয়। ও-মেয়ের দ্বারা সবই সম্ভব।

শেষকালে তিনি থানায় গিয়ে ডায়েরী করে এলেন।

পুলিশ-অফিসার জিজ্ঞেস করলেন—আপনার ভাইঝির মাথায় কি একটু গোলমাল আছে ?

অবিনাশবাবু বললেন—না, তা তো মনে হয় না।

বলে ব্যাপারটা সব খুলে বললেন।

পুলিশ-অফিসার সব শুনে বললেন—মলিনা যে আপনার নিজের মেয়ে নয়, এটা আপনাদের লুকিয়ে রাখা ঠিক হয়নি !

অবিনাশবাবু বললেন—আগে তো সেটা বুঝতে পারিনি। আমাদের সংসারে তো আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই, তাই ভেবেছিলুম আসল ব্যাপারটা চেপে রাখলেই ওর পক্ষে মঙ্গল হবে। ও আমাদের নিজের বাবা-মা বলে ভাবতে শিখবে। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধ করতে যারা এলো তাদের কাছে তো আসল খবরটা চেপে যাওয়া উচিত নয়, তাই তখনই প্রথম ও জানতে পারলো যে, ও আমাদের মেয়ে নয়, জানতে পারলো যে, ও আমার ভাইঝি। তখন থেকেই ও একেবারে আমূল বদলে গেল !

যাহোক, পুলিশের ডায়েরীতে ওর নাম ধাম ঠিকানা, বয়েস, গায়ের রঙ্ আর চেহারার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিবরণ লিখে দিয়ে বাড়ি চলে এলেন।

সারা দিন বড়ো অস্বস্তিতে কাটলো অবিনাশবাবুর। দু'জনের মাত্র সংসার। বেশি ঝামেলা ছিল না দু'জনেরই। অবিনাশবাবু মোটা পেনশন পেতেন। অর্থের সামর্থ্য তাঁর ছিল। মলিনার বিয়েতে যৌতুক দেবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

কিন্তু মুশকিল হলো মলিনাকে নিয়েই। সে-ই কী-রকম বদলে গেল। একলা-একলা থাকতে লাগলো। কারো সঙ্গে মেলামেশা করা বন্ধ করে দিলে। স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দিলে। তখন থেকে বাড়ির লোকের সঙ্গেও সে বন্ধ করে দিলে কথা।

সেই অবস্থাতেই যখন সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তখন কাকা আর কাকীমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হলো তা বর্ণনা করা সোজা নয়।

বিকেলবেলা কাকা আবার গেলেন পুলিশের থানায়। তারাও তখন পর্যন্ত মলিনার কোনও হদিশ দিতে পারলে না।

অবিনাশবাবু হতাশ হয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। তখনও একটি মাত্র আশা যে, তারা সব থানাতে খবর দিয়েছে। খবর পেলেই তারা তাঁকে তাঁর ঠিকানায় তা জানিয়ে যাবে।

অবিনাশবাবু যে মেয়ের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর দিতে থানায় গিয়েছিলেন তা পাড়ার কাউকে জানাননি। কারণ, এ এমন এক খবর যা কাউকে জানানো যায় না। জানালে পাড়াময় তাই নিয়ে আবার কানাকানি শুরু হবে। এ ওকে বলবে, ও একে বলবে। তাতে তারা তাই নিয়ে ঘোঁট পাকাবে। পাড়ায় কেউ তো কারো ভালো চায় না। কারোর একটা খুঁত পেলেই তারা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আলোচনা করবে। নিন্দে বা কানাঘুষো করবার একটা বিষয়বস্তু পাবে। এক বাড়ির বউ আর এক বাড়ির কাকীমাকে গিয়ে বলবে—জানেন কাকীমা,

অবিনাশবাবুর ভাইঝি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে—

কাকীমা বলে উঠবে—ওমা, তাই নাকি ? কার সঙ্গে পালালো ?

—কে জানে ! বাইরে থেকে তো একটুও বোঝা যায়নি। ডুবে-ডুবে জল খেলে তো কেউ টের পায় না, তাই আমরা কেউ টের পাইনি !

—তাহলে এখন কী করে জানতে পারলে ?

—আমি কি জানতে পারতুম ! মিত্তির-বাড়ির বউদি আমাকে না বললে আমি কিছু জানতেও পারতুম না। আপনি যেন আর কাউকে বলবেন না।

সবাই সবাইকে বলতে বারণ করবে, কিন্তু সবাই সবাইকেই বলবে। এইরকম করে সমস্ত পাড়ায় এই কথাটা রটে যাবে যে, অবিনাশবাবুর ভাইঝি বাড়ি থেকে পালিযে গিয়েছে। আর শুধু পালিয়ে যায়নি। নিজের এক পছন্দ-করা প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে।

সমস্ত দিনই স্বামী-স্ত্রী এই ভয়ে দিন কাটিয়েছে। কিন্তু কাকীমা হঠাৎ ছাদের শুকোতে দেওয়া কাপড়-জামাগুলো তুলতে গিয়ে দেখতে পেলে জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে মলিনা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দেখতে পেয়েই কাকীমার ধড়ে প্রাণ এসেছে।

তাড়াতাড়ি মলিনাকে ঠেলা দিয়ে ডাকতে লাগলো—ওরে, ও মলিনা, মলিনা—

মলিনা ধড়মড় করে জেগে উঠলো।

কাকীমা বললে—কী রে, তুই এখানে ঘুমোচ্ছিস আর আমরা যে তোকে আকাশ-পাতাল খুঁজে বেড়াচ্ছি—ওঠ, ওঠ্—

মলিনা উঠলো। চারদিকে চেয়ে দেখে নিজের অবস্থাটা বুঝে নিলে।

কাকীমা আবার জিজ্ঞেস করলে—তুই এখেনে শুয়ে আছিস কেন ? আমি পাড়ার সব বাড়িতে যে তোকে খুঁজে এলুম। তোর কী হয়েছে ? সারাদিন তুইও খাসনি, আমরাও খাইনি। তোর কাকা যে থানায়

গিয়েছে পুলিশে খবর দিতে—

মলিনা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

কাকীমা আবার জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কথা বলছিসনে কেন? কী হয়েছে?

অবিনাশবাবু যখন থানা থেকে ফিরলেন তখন বাড়িতে মলিনাকে দেখে অবাক।

বললেন—একি! মলিনা কোথা থেকে এলো? কোথায় গিয়েছিল?

কাকীমা তখন মলিনাকে পাশে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন।

কাকাবাবুর কথার জবাবে কাকীমা বললেন—ওকেই-জিজ্ঞেস করো-না, ও কোথায় গিয়েছিল—

কাকাবাবু বলেন—অথচ আমি থানায় গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে বলে এলুম যে, মেয়েকে এখনও পাওয়া যায়নি। এখন আবার তাদের গিয়ে বলে আসি যে মেয়েকে পাওয়া গিয়েছে—

বলে তিনি আবার থানার উদ্দেশ্যে বেরোলেন।

কাকীমা মলিনাকে খাওয়াতে খাওয়াতে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, সত্যি বল্‌তো তোর কী হয়েছিল? ছাদে গিয়ে ঘুমোচ্ছিলি কেন? কী হয়েছিল তোর?

মলিনা বললে—কিছু হয়নি—

—কিছু হয়নি মানে? কিছু হয়নি তো ছাদে গিয়েছিলি কী করতে?

মলিনা বললে—আমার খুব ঘুম পেয়েছিল—

—ঘুম পেয়েছিল তো নিজের বিছানায় না শুয়ে ছাদে ঘুমোতে গেলি কেন? যদি ছাদ থেকে পড়ে যেতিস?

কিন্তু কে কার কথা শোনে! মলিনার মুখে কোনও কথারই জবাব নেই।

থানা থেকে ফিরে এসে অবিনাশবাবু দেখেন তাঁর স্ত্রী মলিনাকে পাশে বসিয়ে নিজের হাত দিয়ে খাওয়াচ্ছেন।

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—ও কী বলছে? ছাদে গিয়েছিল কেন?

স্ত্রী বললে—কিছুই বলছে না, শুধু কাঁদছে—

অবিনাশ আর কোনও কথা বললেন না। তিনি বুঝতে পারলেন কেন মলিনা কাঁদছে।

শেষজীবনে অবিনাশবাবুর দাদা মেয়ের জন্যে খুব দুঃখ করতেন। অবিনাশবাবুর দাদা শ্রীনিবাসবাবু তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর আর বেশি দিন পরমায়ু নেই। ভাবনা ছিল শুধু ওই মা-মরা মেয়েটির জন্যে। শ্রীনিবাসবাবু মেয়ের জন্যে মোটা টাকার লাইফ ইন্সিওর করে গিয়েছিলেন মেয়ের বিয়ের খরচপত্রের জন্যে।

মলিনার বয়েস যখন চার বছর তখন শ্রীনিবাসবাবুর দেহান্ত হয়। তার পর থেকেই মলিনা কাকাকেই নিজের বাবা আর কাকীমাকে নিজের মা বলে জেনে এসেছে। তার পর যখন তার বয়েস পনেরো তখনই জানতে পারলে যে, তার বাবার মৃত্যু হয়ে গেছে যখন তার বয়েস মাত্র চার বছর।

সেদিন কাকীমাই মলিনাকে পাশে নিয়ে শুলো।

অনেক রাত পর্যন্ত মলিনার ঘুম আসেনি তাই কাকীমারও ঘুম আসেনি।

কাকীমা জিজ্ঞেস করলে—কী রে, ঘুম আসছে না তোর আজ?

মলিনা বললে—না—

কাকীমা বললে—ঘুম আসবে কী করে, দিনের বেলা অতো ঘুমোলে রাত্রে কখনও ঘুম আসে? ঘুমোতে চেষ্টা কর—

মলিনা বললে—কেন তোমরা আমাকে আগে বলোনি?

কাকীমা বললে—আগে বলিনি বলে তোর কি ক্ষতি হয়েছে? তুই তো আমাদেরই মেয়ের মতোন—আমাদের নিজের মেয়ের মতোই তো

তোকে মানুষ করেছি—

—ইস্কুলে ভর্তি কবাব সময়ে কেন তোমরা আমার নিজের বাবাব নাম দাওনি ?

কাকীমা বললে—তুই যাতে না বুঝতে পারিস, সেইজন্যেই তোর বাবার নামের জায়গায় তোর কাকাব নাম দিয়েছি—

এর পরে মলিনা কাদতে লাগলো।

আর শুধু সেই দিনটি নয়, পর পর কয়েকদিন ধরেই মলিনা মুখ-ভার করে রইলো। আগেকাব মতো তার বাড়িতে কাকা-কাকীমার সঙ্গে তেমন করে কথা বলে না। তেমন কবে আর সহজ হতে পারে না। বাড়ি থেকে আর বাইরে বেবোয় না। পাড়ার যেসব মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, তারা এলেও তাদের সঙ্গে আর ভালো করে কথা বলে না। তারাও আস্তে আস্তে তাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল। তখন মলিনা একেবারে একলা হয়ে গেল।

বন্ধুরা কাকামাকে জিজ্ঞেস করলে—মলিনা আজকাল এমন গম্ভীর-গম্ভীর হয়ে গেল কেন কাকীমা ?

কাকীমা বলে—কী জানি কেন এমন হয়ে গেল।

প্রথমদিকে অবিনাশবাবু ভেবেছিলেন কোনও মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখাবেন। তারা হয়তো কোনও রকম ওষুধ দিয়ে মলিনাকে ভালো করে দিতে পারবেন।

কিন্তু তাঁর স্ত্রী বললেন—দরকার কি ডাক্তার দেখিয়ে ? তার চেয়ে তুমি যেমন ওর বিয়ে দিতে চেয়েছিলে তেমনি বিয়ে দিয়ে দাও একটা ভালো পাত্র দেখে—

অবিনাশবাবু বললেন—সেই বিয়ে দিতে গিয়েই এই গণ্ডগোলটা হলো। নইলে তো ও জানতেই পারতো না সেই সব—

স্ত্রী বললেন—জানলে আর কী হবে। একদিন না একদিন তো ও সব জানতে পারতোই—বয়েস হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

যে-সংসারে কোনও দিন কোনও সমস্যা ছিল না, মলিনার জন্যে সেই সংসারেই হঠাৎ সমস্যার সৃষ্টি হলো। তখন থেকেই বাড়িতে ঘটকের আসা-যাওয়া শুরু হলো। তখন থেকেই অবিনাশবাবু খবরের কাগজের পাতায় 'পাত্র-পাত্রী'র কলমে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন বক্স-নাম্বার দিয়ে। সেই সূত্রে অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি চলতে লাগলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাত্রী দেখতেও এলো। যাওয়ার সময় বলে গেল— পরে খবর দেব। কিন্তু ফিরে গিয়ে একজনও খবর দিলে না।

কেউ চায় পাস-করা মেয়ে, কেউ চায় ইহুদির মতো গায়ের রং। কেউ চায় অগাধ যৌতুক।

এমনি করেই বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগলো, মলিনার বিয়ের ফুল ফোটবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষকালে এলো একটা চিঠি এক ডাক্তার পাত্রের খবর নিয়ে। পাত্রের নিজের বলতে কেউ নেই। চিঠি লিখেছে পাত্রের দূর সম্পর্কের এক মামা। পাত্রের বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। মামাও বাংলার বাইরে থাকেন। পাত্র এম-বি পাস করা ডাক্তার। চাকরি করে কলকাতার ট্রপিক্যাল মেডিকেল স্কুলে। মাসে মাইনে পায় আটশো টাকার মতোন। তখন সস্তাগণ্ডার দিন। আটশো টাকা মাইনে পাওয়া ডাক্তার পাত্র পাওয়া আর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া একই কথা।

তারপর যদি চেম্বার-প্র্যাকটিস করে তো কথাই নেই।

মামা থাকেন কানপুরে। তিনি শুধু বোন-পো'র বিয়েটা দিয়েই আবার কানপুরে চলে যাবেন। সেখানেই তাঁদের বসবাস। আর তাঁরও বয়েস হয়েছে। বোনের ছেলের বিয়েটা দিয়ে ভাই ভাইয়ের শেষ কর্তব্যটা করে দিয়ে যেতে চান।

১১১

কাশীপতি সমস্ত খবরই দেখছি যোগাড় করে ফেলেছে।

জিজ্ঞেস করলাম—এত ভেতরের খবর তুমি যোগাড় করলে কী করে ?

কাশীপতি বললে—বললুম তো আপনাকে যে আমাদের দেশের একজন লোক ছোটবেলা থেকে ওই অবিনাশবাবুর বাড়িতে চাকরের কাজ করতো।

বললাম—তাহলে তো এখন তার অনেক বয়েস হয়েছে।

—হ্যাঁ, এখন অনেক বয়েস হয়েছে।

—তা সে এখন কী করে ?

কাশীপতি বললে—তার ছেলে এখন শ্যামবাজারের রাস্তার ওপর একটা বাড়ির দেওয়ালের গায়ে পানের দোকান দিয়েছে।

—তার নাম কী ?

কাশীপতি জিজ্ঞেস করলে—বাপের নাম না ছেলের নাম ?

বললাম—বাপের নাম। যার কাছ থেকে তুমি খবরগুলো পেয়েছ—

কাশীপতি বললে—আমি খবর পেয়েছি বিদেশবাবুর কাছ থেকে তার ছেলের নাম বিভূতি—বিভূতি দোকান থেকে ভালো রোজগার করে বলে তার বাবা বিদেশবাবুকে এই বয়েসে আর ততো খাটা-খাটুনি করতে দেয় না। ঘরে বসে বসে খায়। সেই তার কাছ থেকেই তো সব খবরাখবর পেলুম। ওই মলিনা-মা'কে জন্মাতে পর্যন্ত দেখেছে বিদেশ-বাবু। তখনকার দিনে বাড়ির চাকর-বাকরদের তো বেশি কাজ করতে হতো না। তখন সারা দিনে একবার মাত্র বাজার করলেই হয়ে যেত। আর সব কিছু মাসকাবারি বাজার। তেল নুন ঘি চাল ডাল সমস্ত মাসে একবার কিনলেই সমস্ত মাসটা চলে যেতো।

জিজ্ঞেস করলাম—তা এখন অবিনাশবাবুর বাড়ির কাজকর্ম কে করে ?

কাশীপতি বললে—এখন তো অবিনাশবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন।

এখন শুধু অবিনাশবাবু একলা সংসারে। আর কেউ নেই তাঁর। তিনি একলা থাকেন বাড়িতে আর একজন বুড়ী ঝি আছে। সেই ঝি-টাই রান্নাবান্না করে, বাজার করে, বাসন মাজে আর ঘর-দোর ঝাড়া-মোছা করে। আর মাঝে মাঝে ভাইঝি মলিনা যখন তার মেয়েকে নিয়ে আসে তখন দিন-কতকের জন্যে তিনি একটু আনন্দ পান কথা বলে। বুড়ো মানুষের জীবনের শেষকালটাই তো সবচেয়ে কষ্টকর। শেষ-জীবনে মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলে একটু শান্তি পায়। তা সেসব সুখ তো অবিনাশবাবুর কপালে নেই।

কিন্তু ভাইঝির সঙ্গে কথা বলে যে একটু শান্তি পাবেন সেটুকুও তাঁর ভাগ্যে নেই। নেই, কারণ ভাইঝির মুখে যে ভালো কথা একটু শুনবেন তাব সৌভাগ্যও নেই অবিনাশবাবুব।

মলিনা এলেই অবিনাশবাবু আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠেন।

জিজ্ঞেস করেন—কি রে, কেমন আছিস ?

মলিনার মুখে বরাবরই সেই একই কথা। বলে—ভালো নয়, কাকা—

—কেন ? ভালো নয় কেন ?

মলিনা বলে—তুমি জানো না, কেন ভালো নয় ?

এর পরে আর ওসব নিয়ে কোনও কথা হয় না। মলিনাও কিছু বলে না, আর অবিনাশবাবুও কিছু জিজ্ঞেস করেন না।

কিন্তু আগে এমন ছিল না।

বিয়ের আগের কথা সমস্ত বিদেশ কাকার মনে আছে। এক-একটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতো আর বাড়িতে যেন সোরগোল পড়ে যেত। অবিনাশবাবুর স্ত্রী মলিনাকে নিয়ে সাজাতে বসতেন।

বিদেশ যেতো বাজারের দোকান থেকে সন্দেশ রসগোল্লা সিঙাড়া কচুরি কিনে আনতে। আর তার সঙ্গে সাজা পান। আর বাড়িতে চা তৈরি করে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার আয়োজন করা হতো।

এইরকম কতোবার আয়োজন করা হলো। কিন্তু কেউই মলিনাকে দেখে তেমন পছন্দ করলে না। খবর দেবো বলে চলে গিয়ে আর তারা খবর দিলে না।

শেষবারে এলেন একজন ভদ্রলোক কানপুর থেকে মেয়ে দেখতে। তাঁকেও দেওয়া হলো সন্দেশ রসগোল্লা সিঙাড়া কচুরি যথারীতি।

কিন্তু তিনি কিছুই খেলেন না।

বললেন—আমার ডায়াবেটিস আছে, আমি ওসব কিছুই খাই না—

অবিনাশবাবু বললেন—তাহলে নিম্‌কি সিঙাড়া কচুরি নিন্ আর চিনি-ছাড়া চা—

তিনি তাই-ই খেলেন !

মলিনাও প্রত্যেকবারের মতো সেজে-গুজে এসে অতিথিকে প্রণাম করলে।

পাত্রের মামাও আশীর্বাদ করলেন কন্যাকে।

জিজ্ঞেস করলেন– তোমার নামটি কী মা ?

মলিনা বললে—আমার নাম কুমারী মলিনা বসু।

পাত্রী রান্নাবান্না জানে কিনা, সেলাই-ফোঁড়াই জানে কিনা, কতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে, সেসব কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

বললেন—আমার পছন্দ হয়েছে পাত্রীকে।

অবিনাশবাবু যা কিছু বলবার তা বলে গেলেন। পাত্রীর নিজের বাবা নেই। যখন মলিনার চার বছর বয়েস তখনই আমার ঘাড়ে ওকে রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন থেকে পাত্রী জানে যে আমরাই তার আপন বাবা-মা। কিন্তু অনেক পরে জানতে পারে যে, তার আপন বাবা-মা নেই, আমরা আসলে তার কাকা আর কাকীমা।

পাত্রের মামা সব শুনে বললেন—তা তো ভালোই করেছেন, ও

বাপ-মায়ের অভাব বোধ করতেই পারেনি। এতে ওর উপকারই হয়েছে।

অবিনাশবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কন্যাকে যখন আপনাদের পছন্দ হয়েছে তখন আমাদের কী কী দিতে-থুতে হবে সেটাও বলে যান—

—দিতে-থুতে? তার মানে?

অবিনাশবাবু বললেন—এই যৌতুক কী চান আপনি সেইটেই জানতে চাইছি আর কী!

—না, কোনও যৌতুক আমাদের দিক থেকে কাম্য নেই—

অবিনাশবাবু বললেন—তবু তো আমরা হলুম কন্যাপক্ষ, কন্যা-পক্ষেরও তো একটা কর্তব্য থাকে—

পাত্রের মামা বললেন—আমার দিদি বলে দিয়েছেন যে, আমাদের কোনও দাবী নেই—

সেদিন সেই সময়েই বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল।

শুধু একটা জিনিসই বাকি রইল, সেটা হলো পাত্রের নিজের চোখে একবার পাত্রীকে দেখা।

কিন্তু পাত্রের মামা বললেন—না, পাত্র আমাকে বলেছে আমি পাত্রী পছন্দ করলেই হবে, সে নিজের চোখে পাত্রীকে দেখার কষ্ট করতে চায় না—

সুতরাং পাত্রী-পছন্দ, যৌতুক ইত্যাদি কোনও ব্যাপারেই কোনও সমস্যা রইল না। বিয়ের দিনক্ষণ সব-কিছুই ঠিক হয়ে গেল দু-একদিনের মধ্যেই।

১১১

জিজ্ঞেস করলাম—কাশীপতি আর কী বললে?

সোমনাথ বললে—কাশীপতি যে অতো চালাক ছেলে তা আমি তার চেহারা দেখে কল্পনাই করতে পারিনি ভাই।

সেই সময়ে একদিন হঠাৎ আর্দালি চারু এসে বললে যে, একজন

মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

জিজ্ঞেস করলাম—কে? নাম জিজ্ঞেস করেছিস?

চারু বললে—হ্যা, নাম হচ্ছে মলিনা দত্ত। অনেককাল আগে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—

বললাম—ঠিক আছে, তুই গিয়ে বসতে বল, আমি যাচ্ছি।

গিয়ে দেখলাম সেই ডাক্তার সঞ্জয় দত্তের স্ত্রী। আমাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলেন।

আমিও তাঁকে নমস্কার করে বললাম—আবার কী ব্যাপার? নতুন কিছু ঘটনা ঘটেছে নাকি?

তিনি বললেন—না, তা ঘটেনি, আমি শুধু জানতে এলুম আমার ব্যাপারটা নিয়ে কী করলেন।

আমি বললাম—আমাদের ইনভেস্টিগেশন এখনও চলছে, নতুন কিছু ঘটনা থাকে তো বলুন।

ভদ্রমহিলা বললেন—নতুন কিছু আমি আপনাদের জানাবো।

বললাম—এখনও ডাক্তার দত্ত কি সেই আগেকার মতো রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটার সময়ে বাড়ি ফিরছেন?

—হ্যাঁ।

—তাঁর অফিসের ছুটি হয় কখন?

—তা তো জানি না। আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি যে, তিনি অফিসের বাইরে কোথাও চেম্বার-প্র্যাকটিশ করেন। আমার কাছে তা জানান না—

জিজ্ঞেস করলাম—অফিস থেকে কতো মাইনে পান?

ভদ্রমহিলা বললেন—আমাদের বিয়ের সময়ে তো শুনেছিলাম আমার স্বামী আটশো টাকা মাইনে পেতেন। তারপরে তা বেড়ে বেড়ে এখন এগারোশো টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

—মাসের পয়লা তারিখে তিনি আপনাকে মাইনের সবটা দেন?

ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ, মাইনের সব টাকাটাই তিনি আমাকে এসে দিয়ে দেন।

—আর সারা মাসের খরচটা তাঁর কী করে চলে ?

—তাঁর তো হাত-খরচ কিছু লাগে না। বাড়ির কাছেই তো অফিস, হেঁটেই যাওয়া-আসা করেন। বাসে-ট্রামে তো যাতায়াত করতে হয় না, তাই কিছু খরচও লাগে না। তবু আমি হাত-খরচ তাঁকে দিই—

—কতো টাকা তাঁকে দেন ?

—এই কোনও মাসে চার আবার কোনো মাসে পাঁচ টাকা। যদি কোনও দিন চা বিস্কুট খেতে হয় তো খেতে পারেন।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার সংসার চালানোর খরচ সেই এগারোশো টাকায় চলে যায় ?

—কোনও রকমে চলে যায়। বাড়িতে একজন ঠিকে-ঝি আছে, তার মাইনে মাসে সাত টাকা দিতে হয়। আর একজন নতুন রাঁধবার লোক পেয়েছি। তার নাম মোহন, সে মাইনে নেয় না। শুধু খাওয়া-পরা-থাকা দিতে হয় তাকে—

বললাম—আপনার বাড়িতে লোক ক'জন ?

ভদ্রমহিলা বললেন—আগে যখন আমার শাশুড়ী বেঁচে ছিলেন তখন আমার মেয়েকে নিয়ে চারজন। তিনি মারা যাওয়ার পর তিনজন ছিলাম। তারপর এখন মোহন আসার পর আবার চারজন হয়েছি—

—কিন্তু এগারোশো টাকায় আপনাদের চারজনের সংসার তো হেসে-খেলে চলে যাওয়া উচিত।

ভদ্রমহিলা বললেন—কিন্তু শুধু খাওয়া-পরার জন্যেই কি খরচ হয়, আর কিছু খরচের দরকার হয় না ?

—বলুন আর কীসে কীসে খরচ হয় ?

ভদ্রমহিলা বললেন—শুধু খেয়ে-পরেই কি সংসার চলে ? আরো অনেক কিছুই দরকার হয়।

—কী দরকার হয় ?

ভদ্রমহিলা বললেন—মানুষের একটু সিনেমা-থিয়েটারও তো দেখতে ইচ্ছে করে। মানুষের গাড়ি চড়তেও তো ইচ্ছে করে। তাছাড়া মানুষ কতো জায়গায় বেড়াতে যায়। কাশ্মীরে যায়, বেনারসে যায়, দার্জিলিং যায়। জন্মাবার পর থেকে আমি কোথাও বেড়াতে যাইনি। আমার কপালটাই এমনি। আমার জীবনের কোনও সাধ-আহ্লাদই মিটলো না—

বলতে বলতে মিসেস দত্তের গলাটা ব্যথায় যেন বুঁজে এলো।

ভদ্রমহিলার দুঃখ দেখে আমারও দুঃখ হলো। সত্যিই তো, প্রত্যেক মানুষের মনে কতো সাধ-আহ্লাদ, কতো কামনা-বাসনা থাকে। বিশেষ করে স্বামীকে কেন্দ্র করে মেয়েরা কতো কল্পনা বাস্তবায়িত করতে চায়। কিছু মেয়ের সাধ মিটলেও যাদের মেটে না তাদের মনের যন্ত্রণা আমরা শুধু কল্পনা করে নিতে পারি।

জিজ্ঞেস করলাম —কলকাতা ছেড়ে আপনি কোথাওই যাননি ?

—না। কখন যাবো বলুন ? কে আমাকে নিয়ে যাবে ? আমার স্বামীর তো ডাক্তারি চাকরি। সে-চাকরিতে মাঝে মাঝে ছুটি থাকলেও উনি তো ছুটি পাবেন না। ওঁর রোগীরা তো ওঁকে ছাড়বে না—

কথাগুলো শুনলাম। শুধু সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম—আপনি ভাববেন না। আমরা সবরকম ইনভেস্টিগেশন করবার ব্যবস্থা শুরু করে দিয়েছি—

ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ, আমি আর আপনাকে বিরক্ত করবো না। এবার উঠি। আমি মোহনের ওপর মেয়ের ভার দিয়ে চলে এসেছি—

১১১

যখন মলিনার বিয়ে হয়ে গেল তখনও বিদেশ চাকরি করছে ওই

অবিনাশবাবুর বাড়িতে। তখন মলিনা মাঝে মাঝে আসতো ফড়িয়া-পুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে। তখন খুব খুশী তার মুখের ভাব।

কাকীমা জিজ্ঞেস করতো—কী রে, শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগছে তোর? এখন তুই খুশী তো?

প্রশ্ন শুনে মলিনা কিছু জবাব দিত না। শুধু হাসতো। বোঝা যেতো সে খুব খুশী।

কাকীমা জিজ্ঞেস করতো—আর তোর শাশুড়ী?

মলিনা বলতো—শাশুড়ীও খুব ভালো। আমায় কোনও কাজ করতে দেবেন না। কেবল বলবেন, বউমা, তুমি গিয়ে রেডিও শোন, আমি রান্না দেখছি।

—যাক, তুই যে সুখী হয়েছিস তাতেই আমরা খুশী।

তারপর আবার জিজ্ঞেস করতো—আর আমার জামাই? জামাইকে তোর পছন্দ হয়েছে?

মলিনা লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলতো। কোনও কথা বলতো না। যা বোঝবার তা কাকীমা বুঝে নিত।

মলিনা যে যোগ্য পাত্রের হাতে পড়েছে এটা ভেবে কাকীমা শেষ-জীবনে একটু শান্তি পেয়েছিল। মলিনাকে নিয়ে প্রথমে যে অশান্তি হয়েছিল তা তখন আর ছিল না। সে তখন সম্পূর্ণ সুখী। বাপের বাড়িতে যতোবার সে আসতো ততোবার তার নতুন দামী শাড়ি দেখে কাকীমা বলতো—এ শাড়িটা আবার কে দিলে রে তোকে?

মলিনা বলতো—কে আবার দেবে, তোমার জামাই—

কাকীমা মেয়ের কথা শুনে খুশীই হতো। জিজ্ঞেস করতো—কতো দাম রে?

মলিনা বলতো—দেড়শো টাকা।

তখনকার দিনে দেড়শো টাকার অনেক দাম ছিল। এখন সোনার দাম বেড়ে আড়াই হাজার টাকা ভরি হয়েছে। কিন্তু তখন সত্তোর

টাকাও হয়নি। শুধু বড়লোকরাই দেড়শো টাকা দামের শাড়ি পরতো। মেয়ের সৌভাগ্য দেখে কাকাবাবু কাকীমা তুজনেই খুব আনন্দ পেত। পাড়ার বউ-ঝিদের ডেকে ডেকে কাকীমা মলিনার শাড়ি দেখাতো।

বলতো—এই গ্যাখো দিদি আমার জামাই মনিলাকে কী-রকম শাড়ি কিনে দিয়েছে। দেড়শো টাকা দাম—

পাড়ার প্রতিবেশীদের সবাইকে ডেকে ডেকে মেয়ের স্বামীর দেওয়া শাড়ি দেখিয়ে আনন্দ পেত কাকীমা। অন্য প্রতিবেশিনীরা শাড়ি দেখে যেমন আনন্দ পেত তেমনি আবার হিংসেও করত মনে মনে। সত্যিই ভাগ্য বটে মলিনার! তেমন লেখা-পড়াও শিখলো না মেয়েটা, অথচ বিয়ে হলো ডাক্তারের সঙ্গে।

তখন মলিনা ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে আসতো আর প্রতিবেশী-দেব মেয়েদের মহলে সাড়া পড়ে যেত যে মলিনা এসেছে বাপের বাড়িতে।

সবাই জিজ্ঞেস করতো—এবার কী শাড়ি পরে এসেছে রে মলিনা?

উত্তরদাতারা বলতো—দেখলুম জর্জেট শাড়ি পরেছে। কিন্তু আবার তু-হাতে পাঁচগাছা করে নতুন সোনার চুড়ি।

ও বাবা! সত্যিই ভাগ্য! ভাগ্য ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমাদের ফাটা কপাল, তাই আমার বি-এ পাস করা মেয়ের এখনও বিয়েই হলো না।

সংসারের এই ছোট-বড়োর সমস্যা চিরকালই ছিল আর চিরকালই থাকবে। তা নিয়ে মন খারাপ করলে চলে না। তাই সংসার তার নিজের নিয়মেই চলে, আর নিজের নিয়মেই বরাবর চলবে। কে এগিয়ে গেল, কে পেছিয়ে পড়লো তা দেখবার দায় নেই ইতিহাসের।

ইতিহাসের দায় না থাকলেও মানুষ তো তা বলে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তার হাতে অফুরন্ত সময় নেই, অফুরন্ত আয়ুও নেই তার যে, চিরকাল অপেক্ষা করে থাকবে। শেষ দেখবার জন্যে। তাই

যখন মহাকাল এসে একদিন কাকীমাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে গেল তখন হঠাৎ টনক নড়লো মলিনার। খবরটা পেয়েই সে দৌড়ে এসেছে বাপের বাড়িতে। কিন্তু তখন সব শেষ।

সেদিন তার জীবনে প্রথম বিচ্ছেদ এসে হাজির হলো বড়ো নিষ্ঠুর-ভাবে। কাঁদতে কাঁদতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অবস্থা। সে এমন অবস্থা হলো তার যে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে হলো।

ভাইঝি-জামাইও ডাক্তার। দুই ডাক্তারে মিলে মলিনার জ্ঞান ফেরাতে সেদিন বেশি দেরি হলো না। কিন্তু জ্ঞান ফিরলেও শোকের শেষ হলো না। যখন শোক শেষ হলো তখন কাকীমার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে।

মলিনার সংসারে তখন আর এক বিপদের সূত্রপাত হলো।

একদিন গভীর রাত্রে মলিনার মনে হলো কে যেন তার ঘরে ঢুকলো। ভয়ে মলিনার চেঁচাতে ইচ্ছে হলো।

—কে ? কে ? কে ?

কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না। মূর্তিটা একজন মেয়েমানুষের। মাথায় জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর। মলিনার কাছে এসে চিৎকার করে উঠলো—এখানে শুয়েছ কেন ? কেন আমার বিছানায় শুয়েছ ? ওঠো, ওঠো, উঠে পড়ো—

মালিনা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রইল। কী করবে বুঝতে পারলে না।

মলিনা জিজ্ঞেস করতে গেল—কে তুমি ?

কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না।

—ওঠো, ওঠো বলছি আমার বিছানা থেকে, ওঠো।

তারপরে কী হলো জানা নেই। মেয়েটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বোঝা গেল না। তারপরে সকালে ঘুম থেকে উঠে কথাটা একেবারে ভুলে গেল। সংসারে তখন অনেক কাজ। শাশুড়ীর অনেক কাজ, তাকে তখন আর সংসারের কাজ করতে দেয়না মলিনা।

রান্নাঘরে গিয়ে বলে—মা, আপনি সরে যান, আমি রান্না দেখছি—

শাশুড়ী বললে—না বউমা, তোমার এই অবস্থায় বেশি খাটা-খাটুনি ভালো নয়—

সকাল দশটার মধ্যেই স্বামী ভাত খেয়ে অফিসে যাবে। তাকে ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিস করতে যেতে হবে। শাশুড়ী বুড়ো হয়েছে, অতো খাটুনি খাটতে পারবে কেন?

শেষ পর্যন্ত শাশুড়ী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তবু সংসার যতো ছোটই হোক কাজ তো তা বলে কম নেই। ঠিকে-ঝি তার নির্দিষ্ট কাজগুলো সেরেই বাড়ি চলে যায়।

স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার পর মলিনার আবার তখন অনেক কাজ।

সঞ্জয় দত্ত জিজ্ঞেস করে—কোন্ জামাটা পরবো গো আজকে?

শুধু কি জামা? প্যান্টের বেলাতেও তাই। অফিসে যাওয়ার আগে মলিনাকে সামনে থাকতেই হবে। স্বামীর কতো কী কাজ থাকতে পারে তার কোনও হিসেব নেই।

—আমার মানি-ব্যাগটা?

সেটা খুঁজে বার করে স্বামীর পকেটে পুরে দিতে হবে।

—টাকা আছে তো মানি-ব্যাগে?

সঞ্জয় বলে—তা তো আমি জানি না।

তারপর একটু থেমে আবার বলে—টাকার তো কোনও দরকার নেই আমার—

তবু মলিনা শোনে না। বলে—দরকার না থাকলেও কাছে কিছু টাকা রাখা ভালো। বলা তো যায় না, কখন কী হয়।

বলে মলিনা পাঁচ টাকার একটা নোট পকেটের মানি-ব্যাগে জোর করে পুরে দেয়।

বলে—খুব সাবধানে ট্রাম-রাস্তা পার হবে, বুঝলে? ডান-বাঁ দু'দিক

ভালো করে দেখে রাস্তা পার হবে।

সঞ্জয় বাড়ি থেকে বেরোলেই দেয়ালের গায়ে টাঙানো ঠাকুরের ছবিটার দিকে মলিনা হাত জোড় করে রোজ মনে মনে কী যেন বলে, কেউ তা বুঝতে পারে না। ভুলো মানুষ, সংসারে কুটিলতার কোনও সন্ধানই রাখেনা মানুষটা। তাই সেই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়েই সেই মানুষটার কল্যাণ কামনা করে যেন একটু তৃপ্তি পায় সে।

স্বামীর অফিসে চলে যাওয়ার পর যে সে একটু বিশ্রাম করবে, তাও নয়। তখন রান্নার কাজ শেষ—শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করবে—এখন কি আপনাকে খেতে দেব মা?

শাশুড়ী বলে—তুমিও খাবে নাকি?

মলিনা বলে—আমার খেতে একটু দেরি আছে, মা। আমি আপনার ছেলের জামাটা একটু সেলাই করে রাখি গে, অনেকদিন ধরে জামার একটা হাতা ছিঁড়ে গিয়েছে রোজ ভাবি সেলাই করবো, কিন্তু করতে ভুলে যাই—

শুধু জামা সেলাই করাই নয়, আরো অনেক কাজ করে মলিনা সংসারের সাশ্রয় করতে চায়। তার কেবল মনে হয় স্বামীর সংসার মানেই তো নিজের সংসার। নিজের সংসারের কাজ করতে কি কারো কষ্ট হয়?

১১১

কাশীপতি গল্প শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করে—তারপর? তারপর কী হলো কাকা?

বিদেশ কাকা তখন বাড়িতেই বসে থাকে। ছেলে বিভূতি পানের দোকান চালিয়ে যা উপায় করে তাইতেই সংসার চলে যায়। ছেলের দৌলতেই বাবা দাসত্ববৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে।

জিজ্ঞেস করে—খুকুর গল্প শুনতে তোমার এত আগ্রহ কেন বাবা?

তার গল্প শুনে তোমার কী লাভ ?

কাশীপতি বলে—আমি যে সেই খুকুর শ্বশুরবাড়িতেই চাকরি করি এখন !

—তাই নাকি ! তা, সে এখন কেমন আছে ?

কাশীপতি বলে—ভালোই আছে—

বিদেশ কাকা বলে—ভালো তো থাকবেই। বিয়ে হওয়ার পর যতোদিন খুকু জামাইকে নিয়ে কাকার বাড়িতে এসেছে তখনই দেখেছি বরাবর দামী দামী শাড়ি পরে এসেছে। নতুন নতুন গয়না গড়িয়েছে সেইসব দেখাতেই বোধহয় কাকা-কাকীমার কাছে আসতো। তখনই দেখেছি এক রাত্তিরও বাপের বাড়িতে থাকতো না। কেবল বলতো ফড়েপুকুরে থাকলে শাশুড়ীকে কে দেখবে ? অথচ আবার ওই মেয়েই বিয়ের পর যখন প্রথম শ্বশুরবাড়িতে যায় সেদিন সে কী তার কান্না ! সে-কান্নার চোটে পাড়ার সমস্ত লোক সেইখানে এসে জড়ো হয়েছিল —

—তারপর ?

—তারপর তুমিই তো দেখছো বাবা যে সে-মেয়ে এখন তার কাকাকে একেবারে ভুলেই গেছে।

সেই মলিনাই যে এখন একেবারে পুরোপুরি বদলে গছে সে-কথাটা আর বললে না কাশীপতি। শুধু কথা আদায় করবার জন্যে মিথ্যে কথা বললে। বললে—হ্যাঁ, এখন সেই খুকু প্রতি রবিবার স্বামীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়।

বিদেশ কাকা বললে—যাবেই তো। বিয়ে হলে সব মেয়েই বদলে যায়—। তা ছেলে-মেয়ে কিছু হয়েছে এখন খুকুর ?

কাশীপতি বললে—একটা মেয়ে হয়েছে কেবল—

—তার বয়েস কতো হলো ?

—এই ছ'-সাত বছর হবে।

বিদেশ কাকা বললে—তা তুমি এত সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন বাবা ?

কাশীপতি বললে—এইদিকে এসেছিলুম তাই ভাবলুম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই—

—তা ভালোই করেছ। এদিকপানে এলে আমার সঙ্গে আবার দেখা কোরো। আমি তো সব সময়েই থাকি। বিভূতি দোকানটা সামলায়, তাই আমার আর কোনও কাজ-কম্ম নেই। আর এ-বয়েসে আর কাজ-কম্ম কববার মতো ক্ষমতাই আমার নেই—

ڪ ڪ ڪ

এসব কথার বিবরণ দিতে কাশীপতি একদিন আবার আমার বাড়িতে এলো।

সব কথা শোনবাব পর বললাম—এতদিন আসোনি কেন ?

কাশীপতি বললে—এতদিন খুব বিপদ গেল বাড়িতে—

—কোন্ বাড়িতে ?

—ডাক্তারবাবুর বাড়িতে।

—কী বিপদ ?

—ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার স্ত্রীর খুব ঝগড়া হয়ে গেল—

—ঝগড়া ? ঝগড়া তো বরাবরই ছিল। আবার নতুন কী ঝগড়া হলো ?

কাশীপতি সেই ঝগড়া-বিবাদের কথা সবিস্তারে বলে গেল।

সেদিনও রাত্রে কাশীপতি নিজের জায়গায় রোজকার মতো শুয়ে ছিল। হঠাৎ রাত্রে কী একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেছে।

পাশের ঘরেই যেন আবার তখন জোরে জোরে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ তার কানে গেল মা'র কথাগুলো :

—কী হলো ? আমার কথাগুলো তোমার কানে যাচ্ছে না, না কি ?

ডাক্তারবাবুর তরফ থেকে কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

শেষকালে মা বোধহয় ডাক্তারবাবুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলে। বললে—তোমার এত ঘুম ? আগে তো তুমি এত ঘুমোতে না ! তখন তো তুমি আমাকেই ঘুমোতে দিতে না। আর এখন সব উল্টো হয়ে গেল ?

ডাক্তারবাবু বললে—বলো, কী বলবে ?

মা বললে—তুমি জানো না আমি কী বলবো ?

ডাক্তারবাবু বললে—আঃ, সারাদিন খাটা-খাটুনির পর আমি যে একটু ঘুমোব তারও কি উপায় নেই ?

মা বললে—তা তুমি কি চাও যে তুমি আরাম করে ঘুমোবে, আর আমি সারা রাত জেগে থাকবো ?

ডাক্তারবাবু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো—তা কে তোমাকে সারা রাত জাগতে বলেছে ?

—কে আবার জাগতে বলবে ? তুমি ! তুমিই তো আমার সুখ-শান্তি সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছ ? আমার সুখ-শান্তিই শুধু নয়, আমার রাতের ঘুমও নষ্ট করেছ—

ডাক্তারবাবু বললে—আমি ? আমি তোমার সুখ-শান্তি ঘুম সব-কিছু নষ্ট করেছি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ! তুমিই তো আমার জীবনে শনি হয়ে ঢুকেছ !

ডাক্তারবাবু বললে—আমি ?

—তুমি না তো কে ?

ডাক্তারবাবু বললে—তোমাকে কতো নতুন নতুন দামী-দামী শাড়ি কিনে দিয়েছি, তোমাকে কতো নতুন নতুন সোনার গয়না কিনে দিয়েছি, সেসব তোমার মনে নেই ?

মা বললে—তখনকার সেসব কথা ছেড়ে দাও—

ডাক্তারবাবু বললে—সেসব কথা কেন ছেড়ে দেব ?

মা বললে—নিজের মনে পাপ ছিল, তাই ওসব তখন দিয়েছ।

—পাপ ?

মা বললে—হ্যাঁ, পাপ-ই তো।

—তোমাকে নিজের টাকা দিয়ে দামী দামী শাড়ি গয়না কিনে দেওয়াও পাপ হলো? বরং তুমিই তো তোমার ঘর থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ ?

—বেশ করেছি তাড়িয়ে দিয়েছি। দরকার হলে এই বাড়ি থেকেও তোমাকে তাড়িয়ে দেব। এতদিন যে তোমাকে বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দিইনি, এই-ই তোমার ভাগ্য।

ডাক্তারবাবু বললে—তা দাও না, এ-বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দাও আমাকে। আমি তো তাই-ই চাই—

মা বললে—তুমি তাই-ই চাও ?

ডাক্তারবাবু বললে—হ্যাঁ, তাই-ই তো চাই। নইলে এই ঘরে কি কোনও মানুষ ঘুমোতে পারে? এ-ঘরে পাখা নেই, জানালাও নেই একটা যে, ঘরে হাওয়া-রোদ ঢুকবে। এ-ঘরে গরু-ঘোড়াও থাকতে পারবে না, এমন ঘরে তুমি আমাকে থাকতে দিয়েছ!

মা বললে—তোমাকে যে রাস্তায় বার করে দিইনি, বাড়িতে থাকতে দিয়েছি, এই-ই তো যথেষ্ট।

ডাক্তারবাবু বললে—তাই দাও না, আমাকে বাড়ির বাইয়ে তাড়িয়ে দাও না, তাতে তুমিও বাঁচো আমিও বাঁচি—

মা মুখ ভেঙচে উঠলো। বললে—বাঃ বাঃ বাঃ, আর তোমার মাইনের টাকা! সেই টাকা না পেলে আমাদের মা-মেয়ে দুজনের খাওয়া-পরা চলবে কী করে ?

ডাক্তারবাবু বলে উঠলো—তাহলে আমার মাইনের টাকাগুলোর জন্যেই এতদিন আমাকে এ-বাড়িতে থাকতে দিয়েছ ?

—তা তো বটেই! তোমার মাইনের টাকাগুলোর জন্যেই তো

তোমাকে এ-বাড়িতে রেখেছি। নইলে কবে তোমাকে বাড়ি থেকে ঝাঁটা মেরে বার করে দিতুম !

ডাক্তারবাবু এ কথাগুলো শুনে যেন খানিকক্ষণের জন্যে গুম্ হয়ে রইল।

তারপরে বললে—আমাকে এত কষ্ট দিয়েও তোমার সাধ মিটছে না ?

মা বললে—আমার সাধ মিটবে তুমি মরলে। এত লোকের মরণ হয় আর তোমার মরণ হয় না ?

ডাক্তারবাবু এ-কথার জবাবে কী বললে তা শোনবার জন্যে কাশী-পতি উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরেই ডাক্তারবাবু বললে—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখনই বাড়ির বাইরে চলে যাচ্ছি—

ব'লে নিজের জামা-কাপড়, প্যাণ্ট-শার্ট গুছোতে আরম্ভ করলে।

মা বললে—কোথায় যাচ্ছো ?

ডাক্তারবাবু বললে—বাড়ির বাইরে—

—তার মানে ?

ডাক্তারবাবু বললে—তার মানে আবার কী ? তুমিই তো বারবার আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে, বলছো। তাই…

মা বললে—আর তোমার মাইনের টাকা ?

ডাক্তারবাবু বললে—তোমার সঙ্গে তো আমার কেবল টাকারই সম্পর্ক। তা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, আমি যেখানেই থাকি, আমার মাইনের টাকাগুলো আমি ঠিক মাসকাবারে এসে তোমাকে দিয়ে যাবো। তাতেই তো হবে ? তাতেই তো খুশী হবে ?

মা জিজ্ঞেস করলে—তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাবে ?

ডাক্তারবাবু বললে—কলকাতার ফুটপাথে কতো লোক শুয়ে থাকে। আমি তাদের দেখেছি। তাদের বাড়ি নেই, তাদের ঠিকানা

নেই, এমনকি তাদের টাকা-পয়সা বলেও কিছু নেই। তবু দেখেছি তারা শীত-গ্রীষ্ম বর্ষার মধ্যে ফুটপাথে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার এই ঘরের চেয়ে সেই ফুটপাথ-ই হাজার গুণ ভালো। আমি এখন সেই ফুটপাথে গিয়েই রাত কাটাবো!

—বুঝতে পেরেছি, বাইরের লোকের কাছে তুমি আমার বদনাম করতে চাও। তুমি তাদের কাছে বলে বেড়াবে যে আমি তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। এই তো ?

ডাক্তারবাবু বললে—না, তা করবো না। আমি যে আর বাড়িতে থাকি না, আলাদা থাকি, তা কাউকেই বলবো না, কথা দিচ্ছি—

মা বললে—তোমার কথায় আমি কি আর বিশ্বাস করি? তুমি আমায় কতো ঠকিয়েছ, বলো তো ?

—আমি তোমাকে ঠকিয়েছি, তুমি বলছো কী ?

মা বলে উঠলো—তুমি কি বিয়ের আগে আমার কাকাকে জানিয়েছিলে যে তুমি আগে একটা বিয়ে করেছিলে ?

ডাক্তারবাবু বললে—আমি তো বিয়ের আগে তোমাকে দেখতে যাইনি যে তোমার কাকাকে সেসব কথা বলবো! পাত্রী পছন্দ করতে গিয়েছিল তো আমার মামা। সে তো তুমি জানোই—

—কিন্তু পরে? পরে যখন খুকু হলো, তখনই তো সেই বউটা আমাদের ঘরে ঢুকে ভয় না দেখালে তো আমি জানতেই পারতুম না!

ডাক্তারবাবু বললে—সরো, আমি যাই, রাত অনেক হলো—

—যাবার আগে তোমাকে বলে যেতে হবে কেন তুমি বলোনি যে তুমি আমাকে বিয়ে করবার আগে আর একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিলে ?

ডাক্তারবাবুর মুখ দিয়ে তখন সে-কথার আর কোনও জবাব নেই।

—বলো—জবাব দাও!

ডাক্তারবাবুর রাগের গলা। বললে—কতোবার বলবো?...তুমি

রাস্তা ছাড়ো, আমি যাই—

মা বললে—না, জবাব না দিলে আমি তোমাকে যেতেই দেব না—

—কিন্তু না, আমাকে যে যেতে দিতেই হবে।

মা বললে—দেখি তুমি কী করে যাও। ···দেখি···

ডাক্তারবাবু বলে উঠলো—এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি। বাড়িতে থাকবার মতো একটা ঘরও দেবে না, আবার বাড়ির বাইরেও যেতে দেবে না···

মা বললে—আগে তুমি বলো কেন তুমি তোমার প্রথম বিয়েটা আমার কাছে চেপে গিয়েছিলে?

তারপর একটু থেমে মা আবার বলতে লাগলো—বলো না, তাকে দেখতে কেমন? সে আমার চেয়েও সুন্দর দেখতে ছিল, না আমার চেয়েও দেখতে খারাপ?

ডাক্তারবাবু যেমন গুম্ হয়ে ছিল তেমনিই গুম্ হয়ে রইল।

—কী হলো? জবাব দিচ্ছো না যে? কী রকম দেখতে ছিল বলো না? আমার চেয়ে সুন্দর, না আমার চেয়ে খারাপ?

এ-কথারও কোনও জবাব বেরোল না ডাক্তারবাবুর মুখ থেকে।

—আবার চুপ করে রইলে? বলো, আমার কথার জবাব দাও—

ডাক্তারবাবু বললে—জবাব থাকলে তো জবাব দেব?

—জবাব থাকলে মানে? তুমি বলে দাওনা যে হ্যাঁ তুমি জেনে-শুনে আমার কাছে বিয়ের খবরটা চেপে গিয়েছিলে?

ডাক্তারবাবু বললে—না, আমি চেপে যাইনি।

মা বললে—তা হলে রোজ রাত্তিরে সে আসে কেন?

ডাক্তারবাবু বললে—যে আসে সে কি ভূত না মানুষ?

—ভূত। মানুষ হলে কি খিল দিয়ে বন্ধ করা ঘরের ভেতরে কেউ ঢুকতে পারে? আমি তো ঘরের দরজা খিল দিয়ে বন্ধ করে শুই, যাতে

ঘরের ভেতরে বাইরের কেউ ঢুকতে না পারে। কিন্তু কেন সে ঢোকে ? কেন সে বলে—তুই আমার বিছানায় শুয়েছিস কেন ? বেরিয়ে যা ঘর থেকে। নইলে গলা টিপে তোর মেয়েকে খুন করে ফেলবো। কেন সে ঘরে ঢোকে ? কেন এসব কথা বলে ? কেন সে এরকম করে আমাকে ভয় দেখায় ?

ডাক্তারবাবু বললে—থাকো তুমি, আমাকে যেতে দাও—

মা বললে—আমার কথার জবাব না দিলে তোমাকে যেতে দেব না—

ডাক্তারবাবু বললে—আমি ভূত বিশ্বাস করি না—

—তাহলে তুমি আমার আগে আর একজনকে বিয়ে করোনি বলতে চাও ?

—বিয়ে যদি করেই থাকি তাতে তোমার কী এমন ক্ষতি করেছি ?

মা বললে—তা সে-খবর আমার কাছে চেপে গেলে কেন ?

—আবার ওই এক কথা ? এক কথা কি বার বার শুনতে ভালো লাগে ? তুমি সরে যাও, আমি যাবো।

মা বললে—যেতে হলে আমাকে ঠেলে ফেলে চলে যাও—

ডাক্তারবাবু বললে—আর কতো কষ্ট দেবে আমাকে, বলতে পারো ? তার চেয়ে তোমার বঁটি দিয়ে আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল না ? এ যন্ত্রণার চেয়ে সে অনেক ভালো। রোজ-রোজ এই নরক-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না আমার—

বলে মাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ডাক্তারবাবু সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আর মা সেই ঠেলা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কাশীপতি কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে কল্পনা করে বাইরে বেরিয়ে এল। এসে দেখলে, সে যা ভয় করেছে ঠিক তাই। সে তাড়াতাড়ি মা'কে দু'হাতে ধরে তুললে।

ততক্ষণে উঠোনের আলোটা জ্বেলে দিয়েছে কাশীপতি। আলোটা

জ্বালাতেই কাশীপতি দেখলে উঠোনের সিমেণ্টের আঘাত লেগে মা'র মাথাটা থেকে রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে।

কাশীপতি বললে—মা, তোমার মাথাটা ফেটে গেছে যে—খুব রক্ত বেরুচ্ছে—

শুধু মা'র মাথাটা দিয়ে যে রক্ত পড়ছে তা নয়, সেই রক্ত কাশীপতির নিজের কাপড়েও লেগে একাকার হয়ে গেছে।

মা বললে—ওরে মোহন, আমাকে ধরে ধরে আমার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবি? আমি চলতে পারছিনে—একটু ধর তো আমাকে—

কাশীপতি মা'কে ধরে ধরে তার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

বললে—বাবুকে ডাকবো মা? বাবু তো ডাক্তার মানুষ, কোনও একটা ওষুধ লিখে দিলে আমি বাজার থেকে তা কিনে আনতে পারি—

মা বললে—না, বাবু বাড়িতে নেই—

—বাবু বাড়িতে নেই মানে? বাবু তো নিজের ঘরে শুয়ে আছেন!

মা বললে—না, বাবু বাড়ি থেকে চলে গেছেন—

—চলে গেছেন মানে? কখন চলে গেছেন?

মা বললে—তোর বাবুই তো আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। বাবু আর ফিরে আসবে না—

কাশীপতি বললে—তাহলে সদর দরজাটা কি খোলা আছে?

মা বললে—হ্যাঁ, তুই গিয়ে দরজাটায় খিল দিয়ে আয়—

কাশীপতি যেন কিছুই জানে না, এমনি করে অভিনয় করে গেল। বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার মা'র কাছে এসে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে—মা, বাবু এত রাত্তিরে বাড়ি ছেড়ে কোথায় গেলেন?

মা বললে—জাহান্নামে গেলেন, আবার কোথায় যাবেন?

কাশীপতি বুঝতে পারলো কথাগুলো রাগের। তবু জিজ্ঞেস করলে—কখন ফিরবেন বাবু?

মা বিরক্ত হয়ে উঠলো। বললে—তুই আর বক্-বক্ করিসনে মাথার কাছে। যা তোর জায়গায় ঘুমোগে যা—

কাশীপতি ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। তখন বোধহয় রাত তুটো হবে কি তিনটে। তার বেশি নয়। ঘুমোলে আরও তিন-চার ঘণ্টা ঘুমোনো যায়। কিন্তু ওই ঘটনার পর আর কি ঘুম আসে?

তারপর পরের দিন সকালবেলা যথারীতি আবার সকাল হলো। করুণা যেমন সকাল ছটা-সাড়ে ছ'টায় আসে সেদিনও সে তেমনি সদর দরজার কড়া নাড়তেই কাশীপতি দরজা খুলে দিলে।

করুণা প্রত্যেক দিনের মতো এঁটো বাসনগুলো নিয়ে কলতলায় গিয়ে মাজতে বসলো।

মা ওপর থেকে ডাকলে—ওরে মোহন—

কাশীপতি বললে—যাচ্ছি মা, চা নিয়ে যাচ্ছি—তৈরি হয়ে গেছে—

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কাশীপতি যখন অন্য দিনের মতো মা'র বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো তখন মা বললে—চা দিতে কে বললে তোকে?

মোহন বললে—আমি ভেবেছি তুমি চা চাইছো—

মা বললে—না রে,···আচ্ছা, চা করে ফেলেছিস, দিয়ে যা—

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে—করুণা এসেছে?

মোহন বললে—হ্যাঁ, বাসন মাজতে বসে গেছে—

মা বললে—ওকে বল গিয়ে যে আজকে আর বাজারে যেতে হবে না।

—বাজারে যেতে হবে না?

মা বললে—না। আজকে এ-বাড়িতে আর রান্নাবান্না হবে না।

কাশীপতি মা'র কথা শুনে অবাক। রান্না না হলে বাড়ির তিনটে প্রাণী তাহলে কী খাবে?

মা বললে—আজ আমার সঙ্গে তুই ফড়েপুকুরে চল—এখনি কাকার বাড়িতে চলে যাবো!

—কাকার বাড়িতে? সেই ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটে?

—হ্যাঁ।

কাশীপতি মা'র কথা শুনে আরো অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সে চাকর। চাকরের মতো আচরণ করাই তো তার উচিত। অন্যভাবে কথা বললে মা হয়তো সন্দেহ করবে। তার দিক থেকে কোনও রকম প্রতিবাদ করা অসঙ্গত হবে। তাহলে তার অভিনয় করাও ব্যর্থ হবে।

শুধু একবার জিজ্ঞেস করলে—আর বাবু? বাবু কোথায় থাকবে? বাবুকে কে দেখবে?

মা রেগে গেল। বললে—বাবু কোথায় থাকবে, বাবু কী খাবে, তা বাবুই বুঝবে। আমি তোকে যা বলছি তাই কর—তোকে আর বাবুর কথা ভাবতে হবে না—

এর পর কাশীপতির আর কিছু বলবার থাকতে পারে না।

তারপর এক ঘণ্টার মধ্যেই মা তৈরি হয়ে নিলে। করুণাকেও পরের দিন থেকে আসতে বারণ করে দেওয়া হলো। তার পাওনা মাইনেটাও মিটিয়ে দেওয়া হলো। খাওয়া-দাওয়া সব কিছু সেই ফড়িয়াপুকুরের বাড়িতে গিয়েই হবে। মা তার সব জিনিসপত্র সুটকেসের মধ্যে গুছিয়ে নিলে।

মা বললে—একটা ট্যাক্সি নিয়ে আয় মোহন—

ট্যাক্সি এল। ট্যাক্সির পেছনে সুটকেস, ট্রাঙ্ক বিছানা সমস্ত কিছু তোলা হতেই মা আর কমলা পেছনের সীটে বসলো। আর ড্রাইভারের পাশে বসলো কাশীপতি। তার সদর দরজায় তালাচাবি দেওয়া হয়ে গিয়েছিল।

চাবিটা মা'র হাতে দিতেই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলে।

কতোটুকুই বা রাস্তা। আধঘণ্টার আগেই সবাই পৌঁছিয়ে গেল ফড়েপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে।

অবিনাশবাবু তখন একলাই থাকেন বাড়িতে। আর একটা ঝি রেখেছেন তাঁর দেখাশোনা রান্নাবান্নার জন্যে। এককালে সরকারী চাকরি করতেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পেনসেনের টাকায় তাঁর একজনের সংসার কোনও রকমে চলে যায়।

সকালবেলা তিনি বাজার করবার জন্যে থলি হাতে নিয়ে বেরোতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে একটা ট্যাক্সি একেবারে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে এসে থামলো। আর তারপরে তিনি অবাক হয়ে দেখলেন ট্যাক্সি থেকে নামছে তাঁর ভাইঝি।

তিনি চমকে উঠলেন। বললেন—আরে তুই ?

কমলা ট্যাক্সি থেকে নেমেই অবিনাশবাবুকে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে —দাদু, দাদু—

কমলা সামনে দাদুকে পেয়ে একেবারে তাঁর পা-দুটোকে জড়িয়ে ধরলো।

—কী রে। এসে গিয়েছিস ?

কমলা বললে—দাদু, তোমার সঙ্গে আমি বেড়াতে যাবো—

—না না, আমি এখন বাজারে যাচ্ছি, তোমার জন্যে মাছ কিনে আনবো, ছাড়ো। তারপর ভাই-ঝি'র দিকে চেয়ে বললেন—কী রে, আমার জামাই-এর খবর কী ?

সে-কথার উত্তর দেওয়ার আগেই কাশীপতিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ও কে রে ? ওই ছেলেটা ?

—ও মোহন, আমার বাড়ির নতুন কাজের লোক।

কাকা বললে—নতুন কাজের লোক ? কতো মাইনে নেয় ?

মলিনা বললে—মাইনে নেয় না—

—মাইনে নেয় না ? এরকম কাজের লোক কী করে পেলি রে ?

তারপর কাশীপতির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী নাম রে তোর ? এই ছোকরা ?

কাশীপতি বললে—আমার নাম মোহন—

—দেশ কোথায় তোর ?

—মেদিনীপুর জেলায় বাবু !

কাশীপতি তখন বাক্স, বিছানা, সুটকেস, সমস্ত কিছু ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে একটা একটা করে বাড়ির ভেতরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

সব জিনিসপত্র ভেতরে তোলা হয়ে গেলে কাকা বললে—তুই যে চলে এলি তো সঞ্জয়ের রান্নাবান্না কে করে দেবে ?

মলিনা বললে—সে হোটেলে গিয়ে খেয়ে নেবে। তাকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না—

কাকা বললে—তাহলে আমি যাই, বাজারটা করে নিয়ে আসি গে, আমি যাবো আর আসবো— বলে কাকা বাজারে চলে গেল।

১১১

গল্প বলতে-বলতে কাশীপতি থামলো।

সোমনাথ বললে—তাহলে কি তোমরা এখন সেই মিসেস দত্তর ফড়েপুকুরের বাড়িতেই সবাই আছো ?

কাশীপতি বললে—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর উপায় কী স্যার ? আর মধু গুপ্ত লেনের বাড়ির দরজায় তো এখন তালাচাবি বন্ধ আছে।

—আর ডাক্তারবাবু, সেই ডাক্তার সঞ্জয় দত্ত ?

কাশীপতি বললে—তাঁর কোনও পাত্তা নেই—

—পাত্তা নেই মানে ?

কাশীপতি বললে—সেই-যে সেই মাঝ-রাত্তিরে মধু গুপ্ত লেনের বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন তারপর থেকে আর তাঁর কোনও

হদিশই নেই—

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলে—কেউ তাঁকে খুঁজে বার করবার চেষ্টাও করে না? পুলিশের থানায় খবরও দেয়না কেউ?

কাশীপতি বললে—না।

অদ্ভুত বিচিত্র কাণ্ড! স্বামী বাড়ি ছেড়ে স্ত্রী আর মেয়েকে ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তবু কেউ তার খবর নেবে না? এ কী রকম স্ত্রী আর এই-ই বা কী রকম শ্বশুর।

কাশীপতি বললে—মেয়েটাও বাবার চেয়ে মা'কেই বেশি ভালোবাসে।

সোমনাথ বললে—তুমি নিজে কিছু খোঁজ নিয়েছ?

কাশীপতি বললে—আমি আর নিজে কী খোঁজ নেব বলুন স্যার, আমি তো তাদের কাছে একজন চাকর ছাড়া আর কিছু নই। আমি আগ্রহ দেখালে ওদের সন্দেহ হতে পারে, তাই আগ্রহ দেখাই না। কিন্তু ডাক্তারবাবুর জন্যে আমার খুব মায়া হয়—

—মায়া হয়? কেন?

কাশীপতি বললে—ডাক্তারবাবু তো কোনও দোষ করে ন?

সোমনাথ বললে—ডাক্তারবাবু যে প্রথমে একটা বিয়ে করেছিল তা মলিনাদেবীকে জানায়নি কেন?

কাশীপতি বললে—সে দোষ তো আসলে ডাক্তারবাবুর মামার। তিনিই তো পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি যদি কন্যেপক্ষের লোকদের কাছে কথাটা না বলে থাকেন তো সেটা তাঁরই দোষ। তার জন্যে ডাক্তারবাবু কেন শাস্তি পাবেন। ডাক্তারবাবু নিজে তো পাত্রী দেখতে যাননি যে তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাবে।

সোমনাথ বললে—কিন্তু টাকার ব্যাপারটা? ডাক্তারবাবু চাকরি করে যে মাইনেটা পান সেটা না-হয় স্ত্রীকে দেন, কিন্তু নিজে প্র্যাকটিশ করে সন্ধেবেলা যে-টাকাটা উপায় করেন সেটা কোথায় যায়? সে-

হিসেবটা তো স্ত্রীকেও দেন না। আর গভর্নমেণ্টকেও জানান না। সেটা তো একটা অন্যায় কাজ—

কাশীপতি বললে—সে তো আমি আপনাকে বলেইছি! আমি তাঁকে অফিসের পর ফলো করে করে দেখেছি তাঁর কোনও চেম্বার নেই—তিনি কোথাও প্র্যাকটিশ করেন না। বাড়ি থেকে শুধু আপিসে যান আর আপিস থেকে বাড়িতে আসেন।

—তাহলে তাঁর স্ত্রী আমার কাছে কি মিথ্যে আর্জি দিয়ে গেলেন? স্বামীকে শাস্তি দিয়ে তাঁর কী লাভ?

কাশীপতি বললে—ওই যে ডাক্তারবাবু আগে একটা বিয়ে করেছিলেন। সেটা তাঁকে কেন বিয়ের আগে জানানো হয়নি।

সোমনাথ সব শুনে বললে—আশ্চর্য, কতো মানুষের কতো রকম বিচিত্র অভিযোগই থাকে, কতো মানুষের কতো রকমের বিচিত্র সমস্যাই থাকে তা ভাবা বোধহয় দেবতাদের পক্ষেও অসাধ্য!

—তারপর?

কাশীপতি বললে—আমার চাকরিটা হবে তো স্যার ঠিক?

সোমনাথ বললে—দেখি-না এই কেসটা তুমি কী করে ট্যাকল করতে পারো।

কাশীপতি বললে—সবটাই তো প্রায় করে এনেছি স্যার, আর একটুখানি শুধু বাকি।

সোমনাথ বললে—একটুখানি বাকি বলছো কেন? আসল জিনিসটাই তো এখনও পরিষ্কার হয়নি।

—আসল জিনিসটা আবার কী?

সোমনাথ বললে—আসল জিনিসটা হলো ডাক্তার সঞ্জয়ের প্র্যাকটিশ—ডাক্তারবাবু প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করে কিনা সেইটে আগে খুঁজে বার করো।

কাশীপতি বললে—আমি তো স্যার ডাক্তারবাবুকে ফলো করে

দেখেছি। অফিস থেকে বেরোবার পর কতো দিন পেছন-পেছন গিয়ে দেখে'ছ তিনি কেবল রাস্তায় রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে সময় নষ্ট করেন। আর কিছু করেন না, কোথাও গিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করেন না।

—আর এখন? এখন যে তোমরা মধু গুপ্ত লেনের বাড়িতে দরজায় তালাচাবি দিয়ে ফড়েপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে উঠেছ, এখন ডাক্তার-বাবু কোথায় আছেন, কোথায় ঘুমোচ্ছেন, কোথায় খাচ্ছেন, এ-খবরটা তুমি বার করে দাও, তাহলে তোমার চাকরি হয়ে যাবে ঠিক। যাও, এই খবরটা নাও গিয়ে—

কাশীপতি চাকরির আশা পেয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় তার হাতে কুড়িটা টাকা দিয়ে দিলাম।

১১১

তারপর সেই যে কাশীপতি চলে গেল, তখন থেকে তার সঙ্গে আর সোমনাথের দেখা হয়নি অনেক কাল।

তখন কাশীপতির সারাদিন নতুন সংসারের দেখাশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। কমলাকে পুরোনো স্কুল থেকে ছাড়িয়ে পাড়ার মধ্যে নতুন স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে একবার সকালবেলা সেখানে পৌছিয়ে দিয়ে আসতে হয় আর একবার একটা বাঁধা সময়ে আবার সেখান থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হয়।

তার সঙ্গে আছে রান্নার কাজ।

সেসব কাজ সামলে নিয়ে ডাক্তারবাবুকে খুঁজে বার করা সোজা নয়।

তবু একটু সময় পেলেই কাশীপতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তো। যাওয়ার সময় বলতো—মা, আমি একটু ঘুরে আসছি। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও—

মা বলতো—বেশি দেরি করিসনি মোহন, একটু তাড়াতাড়ি আসিস—

খাওয়া-দাওয়া করে বেরোতে বেরোতে বেলা বারোটা-একটা বেজে যেত। আর ফিরতে ফিরতে বেলা পাঁচটা হয়ে যেত। কোনও দিন যেত ট্রপিক্যাল মেডিকেল স্কুলের গেটের কাছে। পাঁচটার সময়ে ছুটি হয় স্কুলের। তখন সবাই গেট দিয়ে রাস্তায় বেরোয়। দূর থেকে কাশীপতি লক্ষ্য করতো সকলকে। বহুদিন ধরে কাশীপতি ওদের আগে দেখেছে। সবাই প্রায় চেনা মুখ। আগে ডাক্তার সঞ্জয় দত্তও ওদের সঙ্গে রাস্তায় বেরোতেন। তারপর হ্যারিসন রোড ধরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর দিকে হাঁটতে হাঁটতে যেতেন, তারপর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে সোজা চলে যেতেন ধর্মতলার মোড়ের দিকে। তারপর আবার ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে ওয়েলিংটন স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে বউবাজারের দিকে আসতেন।

কিন্তু সেদিন ডাক্তারবাবুকে আর ট্রপিক্যাল মেডিকেল স্কুলের গেট থেকে বেরোতে দেখতে পেল না।

তাহলে ডাক্তারবাবু কি আর অফিসে আসেন না?

কাশীপতি একটা বাসে উঠে আবার ফিরে এল ফড়েপুকুরের বাড়িতে।

মা বললে—কী রে মোহন, ফিরতে তোর এত দেরি হলো যে?

কাশীপতি বললে—বাস-ট্রাম সব ওদিকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মা—

—কেন?

কাশীপতি বললে—কে জানে! একটা মিছিল যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে তাই পুলিশ সব বাস-টাস অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল--

তা হয়তো হবে। মা অবিশ্বাস করতো না। এরকম ঘটনা কলকাতায় নতুন কিছু নয়।

কাকা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁরে, জামাই-এর কী খবর? সঞ্জয় তো একদিনও আসছে না। ব্যাপারটা কী?

মলিনা বলতো—অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিল, হয়তো ফিরতে দেরি হচ্ছে। কলকাতায় এলে আসবেই এখানে—

কাকা জিজ্ঞেস করতো—ওদের অফিস থেকে আবার বাইরে যেতে হয় নাকি ?

মা বলতো—ডিউটি পড়লে যেতে হয় বইকি। যেখানে ডিউটি পড়ে সেখানেই যেতে হয়।

কাকা কথাগুলো অবিশ্বাস করতো না। মা-ও ডাক্তারবাবুর কথা বিশেষ ভাবতো বলে মনে হতো না।

কিন্তু যতো কিছু ভাবনা সব যেন একলা কাশীপতির। কাশীপতি বাজার করতে গেলেও রাস্তার সমস্ত লোকদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো। মানুষটা যে কী অবস্থার মধ্যে মাঝ-রাতে কত দুঃখ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তা তো কাশীপতি জানে। সমস্ত দুর্ঘটনাটা তার নিজের চোখে দেখা, নিজের কানে শোনা।

কাশীপতি জানতো ডাক্তারবাবু মাসের সমস্ত মাইনেটা এনে মা'র হাতে তুলে দিত। সে প্রায় বারো-শো টাকার মতোন হবে। মা হয়তো তা থেকে বড়জোর পাঁচটা কি দশটা টাকা হাত-খরচার জন্যে ডাক্তারবাবুর হাতে তুলে দিত। তাতে আর মানুষের কতো দিন চলতে পারে ? ডাক্তারবাবু কোথায় থাকছে, কোথায় শুচ্ছে, কোথায় খাচ্ছে —তাও কেউ কিছু জানে না। কেউ তা জানতে চায়ও না।

কাশীপতি মা'কে একদিন বললে—ডাক্তারবাবুর খবর কী মা ? তিনি তো আর আসছেন না।

মা বললে—তোর সে-খবরে দরকার কী ? বাবুর থাকবার জায়গার কি অভাব ? বাবুর টাকারই কি অভাব নাকি ? বাবু ডাক্তারি করে কতো টাকা উপায় করে তা জানিস তুই ?

কাশীপতি কী বলবে ! সে যে সব জানে তা আর মা'কে বললে না।

এদিকে সংসার তখন চলছে কাকার পেনসনের টাকায়। আর মা'র হাতে জমানো যে-ক'টা টাকা তার ওপরে নির্ভর করেই মা'র এত জোর।

কলকাতা শহরের মধ্যে এ কী-রকমের সংসার! ডাক্তারবাবুর ওপরে রাগ করে মা কা'র ওপরে প্রতিশোধ নিচ্ছে? সে প্রতিশোধ তো শেষ পর্যন্ত মা'র নিজের জীবনের ওপরে এসেই আঘাত করবে। এ কেমন স্ত্রী, আর এ কেমন স্বামী?

কাশীপতি সমস্ত চোখ মেলে দেখতো আর দেখেও চুপ করে থাকতো। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে খুঁজে বার করবার চেষ্টার কোনও কসুর করতো না। কারণ, এর রহস্যটা উদ্‌ঘাটন না করলে তো আর তার চাকরি হবে না।

আর মাঝে মাঝে সোমনাথের কাছে আসতো।

এসে বলতো—আর কিছু টাকা দিন স্যার—

—কিছু খবর পেলে?

কাশীপতি বলতো—খবর পেতে চেষ্টা করে যাচ্ছি স্যার—

—কী চেষ্টা করছো?

কাশীপতি বলতো—যখনই সময় পাচ্ছি তখনই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এক এক দিন চায়ের দোকান, রেস্টুরেন্ট, কলকাতার সবগুলো ছোট-বড়ো হোটেলে গিয়েও দেখেছি। বাড়ির কাউকে তো বলতে পারনা যে, আমি ডাক্তারবাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। হোটেলে যারা এসে ওঠে তারা তো হোটেলের খাতায় নিজেদের নাম-টাম পরিচয় লিখে রাখে। তাই সব হোটেলে গিয়ে ডাক্তারবাবুর নাম আছে কিনা তাদের জিজ্ঞেস করি। কেউ ডাক্তারবাবুর নাম বলতে পারে না।

তখন মনে হয় তবে কি ডাক্তারবাবু তার চাকরিটা ছেড়ে দিলে? অফিসেও যদি না যায়, তাহলে পেট চলে কী করে? খায় কী? মাথা গোঁজবার মতো একটা বাড়ি তো চাই। বৃষ্টি-বাদল আছে, শীত-গ্রীষ্ম আছে।

সোমনাথ বললে—কলকাতায় অনেক ধর্মশালা আছে। সেখানে দেখেছ? অনেক লোক সেখানেও থাকে। বড়োবাজারে ধর্মশালা আছে, কালীঘাটেও ধর্মশালা আছে—সেখানে গিয়েও খোঁজ করতে পারো।

কাশীপতি বলতে লাগলো—যেতে তো পারি সব জায়গায়, কিন্তু যাবার সময় পাই কোথায়? মা'কে তো বলতে পারিনা যে আমি বাবুকে খুঁজতে যাবো, ছুটি দিন আমাকে। তা হলেই মা রেগে যাবে।

সোমনাথ বলতো—আশ্চর্য, স্বামীর জন্যে স্ত্রীর মনে একটু দয়া-মায়াও নেই!

কাশীপতি বলতো—প্রথম যেদিন রাত দুটোর সময় মা বাবুকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে সেইদিনই তো বুঝে গিয়েছিলুম মা বড়ো নিষ্ঠুর স্যার। নইলে কতো লোকই তো দু'বার বিয়ে করছে, দু'বার বিয়ে করা কি এতই অন্যায়? কিন্তু মানুষের চরিত্র বোঝা বড়ো শক্ত, বিশেষ করে মেয়েমানুষের চরিত্র।

তারপর বলতো—যাই স্যার, বাড়িতে আবার কাকাবাবুর অসুখ করেছে দেখে এসেছি। ওই কাকাবাবুর যদি বিপদ-টিপদ কিছু হয় তখন তো পেনসনটাও বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সংসারটা চলবে কী করে? আর শুধু তাই-ই নয়, খুকুও তো বড়ো হচ্ছে। একদিন তো তারও বিয়ে দিতে হবে। সে-টাকা কোত্থেকে আসবে? তখন ওই কাকার বাড়িটাও বেচে দিতে হবে। কিন্তু বাড়িটা বেচে দিলে মা থাকবে কোথায়?

সোমনাথ বলতো—আর মধু গুপ্ত লেনের বাড়ি?

কাশীপতি বলতো—সে-বাড়ি তো ডাক্তারবাবুর পৈতৃক বাড়ি। সে-বাড়ি তো মা'র বিক্রয় করবার এক্তিয়ার নেই। বেচলে একমাত্র ডাক্তারবাবুই বেচতে পারে। কিন্তু ডাক্তারবাবু মারা না গেলে তো মা সে-বাড়ি বেচতে পারবে না।

সোমনাথ বললে—ডাক্তারবাবু যদি স্ত্রীর ওপর রাগ করে

কলকাতার বাইরে কোথাও চলে গিয়ে থাকে? তাও তো হতে পারে। তাহলে? তাহলে কী হবে?

কাশীপতি বললে—তাহলে আমি আর কিছু করতে পারবো না, তাহলে চাকরি পাওয়া আর আমার কপালে নেই—

সোমনাথ বললে—তাহলে তুমি এক কাজ করো, তুমি তোমার দেশে যাওয়ার নাম করে ছুটি নাও কিছুদিনের জন্যে—ছুটি নিয়ে কলকাতার কাছাকাছি শহরগুলোতে গিয়ে কিছু খোঁজ-খবর করো—

কাশীপতি বললে—এত খরচ কে দেবে আমাকে?

সোমনাথ বললে—আমি সে-খরচ দেব। অফিস থেকে আমি সে-খরচ স্যাংশন করিয়ে নেব। এখন আমি তোমায় কিছু আগাম টাকা দিচ্ছি—

ব'লে পাঁচটাএকশো টাকার নোট দিলাম কাশীপতিকে। কাশীপতি টাকাটা নিয়ে চলে গেল।

এরপর শুরু হলো কাশীপতির বাংলাদেশ ঘোরা। শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার আশেপাশের সমস্ত শহর, গ্রাম, জনপদ, সমস্ত ভূখণ্ড। প্রথমে গেল নৈহাটি। সাধারণত স্টেশনের ওয়েটিং-রুমেই সে উঠতো। তারপর শুরু হতো তার কাজ। কাজ মানে অনুসন্ধান।

কোনও ডাক্তারখানা দেখতে পেলেই সেখানে ঢুকতো। জিজ্ঞেস করতো—আচ্ছা স্যার, এখানে ডাক্তার সঞ্জয় দত্ত বলে কেউ আছেন?

—কী নাম বললেন? সঞ্জয় দত্ত?

—হ্যাঁ, খুব নামকরা ডাক্তার।

—না, ও-নামে কেউ নেই এখানে।

নৈহাটি তেমন বড়ো শহর নয়। পরের ট্রেনেই কাশীপতি কলকাতায় ফিরে এলো। তারপর গেল বর্ধমান। বর্ধমান বড়ো শহর বলে মনে হলো তার। সেখানে স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে স্নান-খাওয়া সেরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। দেখলে সেখানে অনেকগুলো ডাক্তারখানা। সব

ডাক্তারখানাতে গিয়ে ওই একই প্রশ্ন করলে। সকলের একই উত্তর—না, ও-নামের কোনও ডাক্তার নেই এখানে।

সেখান থেকে গেল আসানসোল—কয়লাখনি অঞ্চলের শহর। সেখানকার লোকের অনেক টাকা-পয়সা। সেখানকার সব ডাক্তার-খানায় খোঁজ-খবর নিলে। সেখানেও ওই একই উত্তর। ও-নামের কোনও ডাক্তার থাকলে তারা জানতে পারতো।

সেখান থেকেও হতাশ হয়ে ফিরতে হলো কাশীপতিকে।

তারপর কয়েকদিন রইলো কলকাতায়। আবার টাকা নিয়ে গেল সোমনাথের কাছ থেকে। আবার শুরু হলো তার ঘোরা।

এবার গেল রানাঘাট।

রানাঘাট ছোট শহর নয়। জংশন স্টেশন। ওয়েটিং-রুমে উঠে স্নান-খাওয়া করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাজারের দিকে বেরোল। যা-কিছু ডাক্তারখানা আছে সেখানে গেলেই শহরের ডাক্তারদের হদিশ পাওয়া যাবে। সেখানে গিয়েও ওই একই প্রশ্ন—এখানে সঞ্জয় দত্ত নামে কোনও ডাক্তার আছে স্যার?

সেখানেও সেই একই জবাব—না।

তাহলে? তাহলে চলো কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগরেও থাকতে পারে ডাক্তারবাবু।

কৃষ্ণনগরেই দু'দিন লেগে গেল ডাক্তারবাবুকে খুঁজতে। কৃষ্ণনগরের লোক বললে—এখানে সমস্ত দিন যাদের দেখছেন এরা সবাই ইণ্ডিয়ার লোক নয়, এখানকার নব্বুই ভাগ লোক বাংলাদেশের। সন্ধে হলেই শহর ছেড়ে সবাই ওপারের বাংলাদেশে চলে যায়। তারা আবার পরদিন সকালবেলায় এখানে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করে।

সেখান থেকে ফেরবার পথে শান্তিপুরে পৌঁছলো। শান্তিপুর তেমন বড়ো শহর না হলেও লুকিয়ে থাকবার পক্ষে ভালো জায়গা।

সেখানেও পাওয়া গেলনা ডাক্তারবাবুকে।

সেই সময়ে কাশীপতির মনে হলো ডাক্তারবাবু হয়তো নাম বদ্‌লে থাকতে পারে। নাম বদ্‌লালে কে আর চিনতে পারবে?

সোমনাথের কাছে এসে কাশীপতি সেবার বললে—একটা সন্দেহ হচ্ছে স্যার, যদি ডাক্তারবাবু নাম বদ্‌লে কোথাও লুকিয়ে থাকে তাহলে কী করবো স্যার?

সোমনাথ বললে—অসম্ভব কিছু নয়। আজকাল সবই সম্ভব। তবে একটা কাজ তুমি করতে পারো।

-বলুন, কী কাজ?

সোমনাথ বললে—ওষুধ-কোম্পানীদের অনেক মেডিক্যাল রি-প্রেজেনটেটিভ থাকে। তাদের কাছে বেঙ্গলে যতো ডাক্তার আছে তাদের নামের পুরো লিস্ট্ থাকে। তুমি যদি পারো তো সেই লিস্ট্ থেকে দেখে নিও এই নামের কোনও ডাক্তার আছে কিনা। সেখানে সব ডাক্তারের ঠিকানাও লেখা থাকে—নতুন কোনও ওষুধ বেরোলেই কোম্পানীগুলো সব ডাক্তারদের ঠিকানায় সেইসব ওষুধের বিজ্ঞাপন পাঠায় -

কথাটা কাশীপতির মাথায় ঢুকলো।

বললে—ঠিক আছে, আমি আজই যাচ্ছি। দেখছি সেইসব ঠিকানার মধ্যে ডাক্তার সঞ্জয় দত্তের নাম আছে কিনা—

বলেই বললে—তাহলে আরো কিছু টাকা দিন স্যার—

—আবার টাকা? এইতো সেদিন তোমাকে একশো টাকা দিলাম

কাশীপতি বললে—একশো টাকাতে কতো দিন আর চলে তাই বলুন? ট্রেনের টিকিটের ভাড়া কতো বেড়ে গেছে আপনিই বলুন—তবু তো আমি অনেকদিন মুড়ি-তেলেভাজা খেয়ে পেট ভরিয়েছি···

সোমনাথ বললে—এই নাও, আরো একশো টাকা দিলুম। এই টাকার মধ্যে তোমাকে যেমন করে হোক ডাক্তারবাবুকে খুঁজে বার

করতেই হবে—

টাকা ক'টা ফতুয়ার পকেটে পুরে নিয়ে কাশীপতি চলে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ সোমনাথ জিজ্ঞেস করলে—তোমার ও-বাড়ির খবর কী? কোনও খবর জানো?

কাশীপতি ঘুরে দাঁড়ালো। বললে—স্যার, কয়েক মাস হলো ও-বাড়ির খবর তো রাখতে পারিনি। দেখে এসেছিলুম কাকাবাবুর খুব অসুখ। জানি না এখনও বেঁচে আছেন কিনা।

সোমনাথ বললে—তিনি যদি মারা যান তাহলে তো মিসেস দত্তের খুব বিপদ—

কাশীপতিও তা স্বীকার করলে; বললে—বিপদ বলে বিপদ! কাকাবাবুর পেনসন বন্ধ হয়ে গেলে কী যে হবে তা ভাবলেও ভয় হয়—

—মিসেস্ দত্তর কাছে আর কোনও টাকা নেই?

কাশীপতি বললে—বিয়ের সময় কাকা যে-সব সোনার গয়নাগুলো দিয়েছিল তাই-ই মা'র একমাত্র ভরসা। আর বাড়িটা কাকাবাবুর নিজের। তিনি মারা গেলে মা ওই বাড়িটাই পাবে। সেই বাড়িটার কিছু অংশ ভাড়া দিয়ে তার সংসার কিছুদিন চলতে পারে।

সোমনাথ বললে—আর ডাক্তার দত্তের মাস-কাবারির মাইনেটাও তো তোমার মা'র হাতে থাকতো। সব টাকাগুলো তো আর সংসার চালাবার জন্যে খরচ হতো না। কিছু-না-কিছু জমতোই। সেই টাকাগুলোও তো তোমার মা'র হাতে আছে। তাতেও অনেক কাল চলবে। তারপরে কোনও বাজে-খরচও তো নেই তোমার মা'র।

কাশীপতি বললে—কী জানি, সেখানে এখন কী হচ্ছে। আমি তো অনেক দিন সে-বাড়িতে যাইনি।

—কবে সে-বাড়িতে যাবে?

কাশীপতি বললে—ডাক্তারবাবুকে খুঁজে না পেলে আর যাবো না।

তাই এতদিন ধরে কেবল সেই চেষ্টাই করে চলেছি—

বলে কাশীপতি নমস্কার করে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল—আমার চাকরি যেন একটা হয় স্যার—

সোমনাথ আশ্বাস দিতেই সে চলে গিয়ে ট্রাম ধরলে। ট্রামটা ধর্মতলা পর্যন্ত যায়। সেখানে ট্রাম থেকে নেমে সোজা হাঁটা আরম্ভ করলে। টাকা-পয়সা বাঁচাবার জন্যে যে কাশীপতি পায়ে হেঁটে চলতো তা কিন্তু নয়। হেঁটে যাওয়ার অভ্যাসটা সে রাখতো স্বাস্থ্যের জন্যে।

সে বলতো—আমাকে পুলিশের চাকরি করতে হবে, তাই স্বাস্থ্যটা ভালো রাখা দরকার। বাঙালীরা হাটেনা বলেই তাদের স্বাস্থ্য এত খারাপ। কিন্তু চেয়ে দেখ পাঞ্জাবীদের দিকে, চেয়ে দেখ বেহারী, গুজরাটীদের দিকে। চেয়ে দেখ মিলিটারিদের দিকে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত-পা ধুয়েই হেঁটে-হেঁটে বাজারে যায়, হেঁটে-হেঁটে দুধ আনতে যায়। উপায় না থাকলে বা সময় না থাকলে তখন বাসে ট্রামে ওঠে।

তা সেইদিন থেকেই কাশীপতি হাঁটাহাঁটি করতে লাগলো। কলকাতায় অনেক ওষুধ কোম্পানীর হেড-অফিস বা জোন্যাল অফিস আছে। সকালবেলা নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়েই সে সেইসব অফিসে গিয়ে হত্যে দিত।

তাদের গিয়ে বলতো—কলকাতায় যতো ডাক্তার আছেন তাঁদের লিস্ট্ আপনাদের কাছে আছে তো ?

তারা এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যেত।

জিজ্ঞেস করতো—তুমি কে ?

কাশীপতি বলতো—আমি একজনদের বাড়িতে কাজ করি। সে-বাড়ির কর্তা ডাক্তার। তাঁকে কয়েক মাস ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির লোকরা সন্দেহ করছে তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন। তিনি কোথাও গিয়ে জমিয়ে প্র্যাকটিশ করে নিজের পেট চালাচ্ছেন, আর

তাঁর বাড়ির লোকরা খেতে না পেয়ে উপোস করতে বসেছেন।

—ডাক্তারের নাম কী?

কাশীপতি বললে—ডাক্তার সঞ্জয় দত্ত এম-বি।

অফিসের খাতা খুলে সব নাম দেখা হলো। দত্ত পদবী বহু ডাক্তারের আছে। তার ভেতরে সঞ্জয় দত্তর নাম পাওয়া গেল। কিন্তু ঠিকানা দেওয়া আছে—১২/২-এ মধু গুপ্ত লেন।

কাশীপতি বললে—এ তো ডাক্তারবাবুর পুরনো ঠিকানা। এ তো ডাক্তারবাবুর নিজের বাড়ি। আমি চাই তাঁর নতুন ঠিকানা। যেখানে তিনি এখন প্র্যাকটিশ করছেন।

তারা বললে—সে-ঠিকানা আমাদের কাছে নেই, এখানে যা আছে তা-ই তোমাকে দেখালাম।

কাশীপতিকে হতাশ হয়ে ফিরতে হলো সেখান থেকে। এর পর খোঁজ করতে করতে অন্য একটা ওষুধের কোম্পানীর অফিসে গেল। সেখানেও সেই একই ব্যাপার। সব জায়গাতেই ডাক্তারবাবুর পুরনো ঠিকানা লেখা আছে।

কিন্তু তাহলে কি ডাক্তারবাবু আত্মহত্যা করেছে? আত্মহত্যা করলে কোথাও না কোথাও তার উল্লেখ থাকবে। পুলিশের খাতায় কিংবা শ্মশানের খাতায়ও তাদের নাম-ধাম নিশ্চয় লেখা থাকে।

বাবা বলতো—কী রে চাকরির কিছু আশা পেলি?

মা-ও তাই বলতো—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস তার ঠিক নেই।

বাবা বলতো—শেষ পর্যন্ত চাকরি পাওয়ার আগেই যে তুই মারা যাবি রে। পুলিশের লোকদের তুই চিনিসনে। কেন, পুলিশের চাকরি ছাড়া অন্য কোনও চাকরি পাওয়া যায় না? ওরা তোকে চাকরি দেবে বলে কেবল ধাপ্পা দিচ্ছে।

এসব কথার সে আর কী-ই বা উত্তর দেবে! যখন সে পুলিশের

চাকরি পাবে তখন সে বাপ-মা'কে দেখিয়ে দেবে যে তার পরিশ্রমের ক্ষমতা বিফলে যায়নি।

তখন থেকে সে শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরতে লাগলো। প্রথমে গেল নিমতলা শ্মশান ঘাটে। তার মনে হলো—আশ্চর্য, যেখানে একদিন সবাইকে আসতে হবে সেখানে কোনও ভদ্রলোককে সে দেখতে পেলে না। ভদ্রলোকরা বিপদে না পড়লে কেউ এখানে আসে না। সবাই তাই এড়িয়েই চলে শ্মশানকে।

ওদিকে শ্মশানে এখন যারা হাজির তারা সবাই-ই শবযাত্রী। কোনও রকমে দাহ-সংকার করেই তারা যে-যার বাড়ি চলে যাবে। এক মুহূর্ত এই নোংরা জায়গায় তারা থাকবে না।

একজন লোককে দেখে কাশীপতি জিজ্ঞেস করলে—মশাই শুনুন—

লোকটা থেমে গেল।

বললে—কী?

কাশীপতি বললে—এখানে মড়াগুলো যা আসে তাদের নাম-ধাম কোথাও লেখা থাকে?

লোকটা বললে—লেখা থাকেই তো—

—কী কী লেখা থাকে? নাম-ঠিকানা সব কিছুই লেখা থাকে?

লোকটা জিজ্ঞেস করলে—আপনার মড়া আছে নাকি? তাহলে আমাকে বলুন, আমি অল্প খরচে সব কিছু করে দেব। আমি এই নিমতলা ঘাটের আদি পুরুত।

আপনি পুরুত!

লোকটা বললে—পুরুত নয় তো কী, এই দেখুন না আমার পৈতে—

বলে ফতুয়ার তলা থেকে পৈতেটা বাইরে টেনে বার করে দেখালে।

তারপর বললে—আমরা সাত-পুরুষ ধরে পুরুতগিরি করছি এই নিমতলা ঘাটে। আজকাল ভেজালের যুগে যতো সব বাজে লোক জাত

ভাঁড়িয়ে বোষ্টম হয়েছে। আগে ছিল বাগ্দী, এখন পৈতে পরে পুরুত সেজে এখানে এসেছে বামুন হয়ে। আমি সেরকম বামুন নই মশাই! কই, কোথায় আপনার মড়া?

কথার মাঝখানে আর একজন লোক এসে হাজির হলো।

সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে—তোমার মড়া কই? কোথায় রেখেছ?

আগের লোকটা এবার সামনে এগিয়ে এলো। বললে—এ্যাই, আবার তুই ভাঙচি দিতে এসেছিস? আমার যজমানকে তুই ভাঙচি দিচ্ছিস আবার?

তারপর কাশীপতির দিকে এগিয়ে এসে বললে—মশাই, আপনি ওর কথা শুনবেন না। আপনি আমার সঙ্গে এদিকে চলে আসুন তো -

বলে কাশীপতির একটা হাত ধরে হিড-হিড করে টেনে নিয়ে চললো অন্য দিকে।

তখন সন্ধে উৎরে গেছে। টানাটানি কাণ্ড দেখে আরো কিছু লোক এগিয়ে এলো কাশীপতির দিকে। বললে—কী হয়েছে? কী হয়েছে? এত গোলমাল কীসের? কে মড়া এনেছে?

প্রথম পুরুতটা বললে—এই যে এ । এই দেখনা ভাই, আমি একে প্রথম ধরেছি, আবার ও এসে আমার যজমানকে ভাঙচি দিচ্ছে

কাশীপতি এদের কাণ্ডকারখানা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল তারপর যখন মারামারি শুরু হওয়ার উপক্রম হলো তখন রাত্রের অন্ধকারে টুকুস করে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কেউ তাকে দেখতে পেলে না।

এতদিন ধরে কাশীপতি শহরে গ্রামে সব জায়গায় ডাক্তারবাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু এখানে এই শ্মশানে এসে তার যা অভিজ্ঞতা হলো তা আগে আর কোথাও তা হয়নি।

নিমতলা ঘাটের অভিজ্ঞতা থেকেই কাশীপতি প্রথম টের পেয়েছিল যে মানুষের জীবন নিয়ে যতো ঝামেলা হয় তার হাজার গুণ ঝামেলা হয় মানুষের মৃত্যুকে নিয়ে।

নিমতলা ঘাটের যে অভিজ্ঞতা, কাশী মিত্তিরের ঘাট আর কেওড়াতলার অভিজ্ঞতাও সেই একই রকমের। জীবন এখন যতোই সস্তা হোক, মৃত্যু যে এখন কতো দামী হয়ে গিয়েছে তার পরিচয়ও পেয়ে গেল কাশীপতি কয়েকদিনের মধ্যেই।

অনেক কষ্টে যদিবা কাশীপতি একটু সহানুভূতি পেলে কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে এসে, কিন্তু সেখানেও যে ভদ্রলোক কাঠের ঠিকেদারি নিয়েছেন তিনি বললেন—এখানে কেন এসেছ ?

কাশীপতি বললে—সঞ্জয় দত্ত বলে একজন ডাক্তারকে কবে এই শ্মশানে পোড়ানো হয়েছে সেইটে জানতে—

ভদ্রলোক বললেন—এটা তো কাঠের দোকান। এখানে এসব খবর থাকে না। অফিসে যাও—

—আপিসটা কোথায় ?

—অফিসটা কোথায় তা আমি জানবো কেমন করে ? আমি তো কাঠের কারবার করি।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—তা তোমার ডাক্তারকে কীসে পোড়ানো হয়েছে ? কাঠে না ইলেকট্রিক চুল্লীতে ?

কাশীপতি বললে—আজ্ঞে, তা তো আমি জানি না।

তা না জেনে উজবুকের মতো আমার কাছে এসেছ কেন ? আগে জেনে এসো তোমার ডাক্তারকে কাঠে পোড়ানো হয়েছে, না ইলেকট্রিক চুল্লীতে পোড়ানো হয়েছে।

সংসারে যারা বোকা সেজে থাকে তারাই বলতে গেলে সত্যিকারের সুখী মানুষ। কাশীপতিও সেই বোকা সেজে থাকা মানুষের দলে। সে বোকা সেজে থেকে তার কার্য উদ্ধার করতে পারে। এটা খুব সোজা

আর্ট নয়। সেই কারণে কাশীপতিও একজন আর্টিস্ট।

সেদিন একটু দিনের আলো থাকতে থাকতে কাশীপতি চেতলা হাটের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য কেওড়াতলার শ্মশানে যাওয়া।

কিন্তু রাস্তাটা ভিড়ের জন্যে বন্ধ।

সবার মুখেই একটা প্রশ্ন—হ্যাঁ মশাই, রাস্তা বন্ধ কেন? কী হয়েছে?

কেউ যদি জানবে যে কেন রাস্তা বন্ধ, তাহলে তো আর মানুষের ভিড় জমে না। প্রশ্ন করবার লোক অনেক আছে, কিন্তু উত্তর দেওয়ার মালিক স্বয়ং ভগবান। তাকে কোথায় পাবো?

ততক্ষণে টেম্পো, স্কুটার, গাড়ি, বাস সমস্ত নট্-নড়ন-চড়ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেছে।

—আমরা কোথা দিয়ে যাবো?

—যদি যেতে হয় তো আলিপুর দিয়ে ঘুরে যান।

হঠাৎ মানুষের ভিড়ের ওপর টুপ-টাপ করে কোথা থেকে চোরা-গোপ্তা ঢিল পড়তে লাগলো। ...কোন্ শালা ঢিল ছুঁড়ছে? মারো শালাদের মারো—

সে-এক বীভৎস কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

কাশীপতি যাবে কেওড়াতলার শ্মশানে। যাওয়াটা জরুরী। সব কথা আগে থেকে বলা-কওয়া আছে। শ্মশানের বাবুকে দশটা টাকাও হাতে গুঁজে দেওয়া আছে। সে-ভদ্রলোক অফিসের খাতা খুঁজে বলে দেবে ডাক্তার সঞ্জয় দত্ত নামের লোককে কবে কাঠের চিতায় বা ইলেকট্রিক চুল্লীতে পোড়ানো হয়েছিল।

অফিসের কেরানী ভদ্রলোক প্রথমে রাজি হয়নি।

বলেছিল—আজকাল দশটা টাকায় কি কিছু হয় ভাই? চার

টাকা সরষের তেলের কিলো। মানুষ খাবে কী? দশ টাকায় মজুরি পোষাবে না। বিশ টাকা লাগবে।

কাশীপতি বলেছিল—আমি গরীব লোক, কোথায় পাবো বিশ টাকা! যদি খুঁজে দিতে পারেন তো তখন ধার-দেনা করে না-হয় দেব বিশ টাকা—

কেরানী ভদ্রলোক বলেছিল—তাহলে কালকে বিকেলবেলার দিকে একবার এসো। একটু সকাল-সকাল। দেখবো কতোটা কী করতে পারি—

অনেক দিন পরে একটু আশা পেয়ে কাশীপতি অনেক রাস্তা ঘুরে চেতলার রাস্তা দিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময়ে এই বিপদ।

এ-ছাড়া শ্মশানে যাওয়ার অন্য কোনও রাস্তা ছিলনা যে সেই রাস্তা দিয়ে সে যাবে। এদিকে সন্ধে হতেও আর বেশি দেরি নেই।

—মশাই, একটু সরে দাঁড়ান না, একটু যাই—

—কোথায় সরবো?

—সামনের দিকে—

—সামনের দিকে যাবার কি জায়গা আছে যে যাবো? মানুষের মাথা ডিঙিয়ে যাবো নাকি?

হঠাৎ আবার ঢিল-বৃষ্টি শুরু হলো। কিন্তু তবু কেউ নড়লো না। কোনও রকমে মাথায় হাত ঢাকা দিয়ে সবাই মজা দেখতে লাগলো।

ততক্ষণে আলিপুর থানা থেকে পুলিশের হল্লা-গাড়ি এসে গেছে। পুলিশকে দেখে হল্লাবাজি আরো বেড়ে গেল।

—মারো শালাদের, মারো—

কাশীপতি হাটের ভেতরে টিনের চালার এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এবার পালাবার চেষ্টা করলে। তখন পুলিশ পটাপট যাকে সামনে পেলে তাদের ধরে ভ্যানের মধ্যে পুরে ফেলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলে।

এবার ভিড় একটু পাতলা হয়েছে। কাশীপতি ঘটনাস্থলের একবারে কেন্দ্রে গিয়ে হাজির হয়েছে।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ডকারখানা তাকে ঘিরে তখনও কিছু ভিড় জমে রয়েছে।

কাশীপতি সেখানে গিয়ে ছাখে সবাই একজন মানুষকে ঘিরে রেখে জটলা করছে।

—মশাই এই লোকটা রাত্তিরে রোজ এই বারান্দার ভেতরে ঢোকে, ঢুকে এখানেই হেগে-মুতে একাকার করে তোলে। একে মেরে কি কোনও অন্যায় করেছি আমি! আপনারাই বলুন?

—তা দেখছেন তো পাগলা লোক। ও কি সেয়ানা লোক যে কোথায় বাহ্যে করতে হয় আর কোথায় বাহ্যে না করতে হয় তা বুঝতে পারবে! পাগলকে অতো মারলে লোকে তো ক্ষেপে যাবেই! ওকে না মেরে পুলিশে খবর দিলেই পারতেন!

—পুলিশ? পুলিশের কথা বলছেন? এখন কি ইংরেজরা আছে যে পুলিশরা মন দিয়ে নিয়ম মেনে কাজ করবে? এখন তো জওহরলাল নেহরুর রাজত্ব! এখন কি আইন আছে মশাই যে লোকে সেই আইন মানবে। এখন সেই রাজাও নেই আর সেই রাজত্বও নেই! এখন জোর যার মুলুক তার!

এতো ঝগড়া-বিবাদ চলছে, কিন্তু সে-সব দিকে তখন আর কাশীপতির কান নেই। সে তখন একদৃষ্টে লোকটার দিকে চেয়ে দেখছে। ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা লোকটা, খালি গা, মাথার চুলে জটা পাকানো। কয়েক জায়গায় টাকও পড়ে গেছে।

কাশীপতির কী যেন একটা সন্দেহ হলো। ডাক্তারবাবু না?

কাশীপতি গিয়ে বাড়ির মালিককে জিজ্ঞেস করলে—এ কতো দিন ধরে আপনার বারান্দায় শুচ্ছে?

ভদ্রলোক বললে—তা বছর দুয়েক ধরে তো বটেই।

—কে খেতে দেয় একে ?

—খেতে আর কে দেবে ? যেদিন হাট বসে সেদিন দয়া হলে কেউ দুটো পয়সা কিংবা বেগুনি কি ফুলুরি একটা দিয়ে যায়। আর ক্ষিধে পেলে এদিক-ওদিক কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পায় পেটে দেয়, আর তেষ্টা পেলে রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে নেয়—

—আর রাত্তিরে ?

—রাত্তিরে যখন আলো নিভিয়ে-টিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়ি তখন এখানে এই আমার বাড়ির সামনের বারান্দায় ঢুকে শুয়ে পড়ে। অনেকবার তাড়িয়ে দিয়েছি। মেথর ডেকে বারান্দাটা পরিষ্কার করিয়েছি। অনেকবার লাঠি-পেটা করেছি। তখন পাঁচ-ছ' মাস আবার কোথায় উধাও হয়ে যায়, তারপর আবার কোথা থেকে এসে হাজির হয় হঠাৎ। আজ আর সহ্য হয়নি আমার, তাই আবার লাঠি-পেটা করেছি, যাতে আর কখনও এখানে না আসে। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা আমার ওপর চোট-পাট করতে আরম্ভ করলে। তাই আমিও পুলিশকে খবর দিলুম—

তারপর একটু থেমে বললে—তা আমার কী দোষ বলো ? আমি কিছু অন্যায় করেছি ?

কাশীপতি বললে—এ কে জানেন ?

ভদ্রলোক বললে—না—

—ইনি হচ্ছেন একজন এম-বি পাস করা ডাক্তার—

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, এঁর স্ত্রী আছেন, এঁর শ্বশুর আছেন। কলকাতা শহরের মাঝখানে এঁর নিজের পাকা কোটা বাড়ি আছে। সে-বাড়ির দামই বোধহয় লাখ দুয়েক টাকা—

কথাগুলো যারা এতক্ষণ শুনছিল তারা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক সব শুনে বললে—তা তার এ-দশা কেন ?

কাশীপতি নিজের কপালটায় হাত ছুঁয়ে বললে—এর নাম কপাল! তা ছাড়া আর কী বলবো, বলুন?

তারপর বললে—আপনারা এঁকে একটু দেখুন, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি—

বলে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল। তারপর সবাই মিলে লোকটাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিতেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে।

কাশীপতি ডাক্তারবাবুকে একেবারে সোজা নিয়ে গিয়ে তুললে ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের অবিনাশবাবুর বাড়িতে।

মলিনা দেবী তো এতকাল পরে কাশীপতিকে দেখে অবাক।

বললে—কী রে মোহন, তুই? এতদিন কোথায় ছিলি? দেশে যাব বলে সেই যে চলে গেলি আর তোর দেখা নেই। ব্যাপার কী তোর?

কাশীপতি বললে—দেখুন-না মা কা'কে এনেছি। ট্যাক্সিতে বসে আছেন—

—ট্যাক্সিতে কে বসে আছেন? কার কথা বলছিস।

—ওই যে, ওঁকে চিনতে পারছেন না? ওই তো আমাদের ডাক্তারবাবু। খুকুর বাবা—

সোমনাথ গল্প বলতে বলতে থামলো।

আমি বললাম—তারপর?

—তারপর আর কী? স্ত্রী স্বামীকে ফিরে পেলে, খুকু তার বাবাকে ফিরে পেলে। অবিনাশবাবু তখন মারা গেছেন। তিনি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবে তার পেনসন আসাও বন্ধ হয়েছে। সংসার তখন খুব কষ্টেই চলছে। এই সময় ডাক্তার সঞ্জয় দত্ত স্ত্রীর কাছে এসে পড়লেন। তাও যে সম্ভব হলো তা একমাত্র ওই কাশীপতির জন্যে। ওই কাশীপতি না থাকলে কবে হয়তো ডাক্তার সঞ্জয় দত্তর রাস্তায় অপঘাতে মৃত্যু হতো। তাই কাশীপতিকে আমি আমাদের অফিসে চাকরি করে

দিয়েছি। সে এখন আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন ইনসপেক্টর।

—তা এখন তাদের কী খবর? সেই ডাক্তার সঞ্জয় দত্তর? এখনও তিনি বেঁচে আছেন?

সোমনাথ বললে—হ্যাঁ, তুমি তাঁদের দেখবে? দেখতে চাও?

বললাম—হ্যাঁ। এখন তো তাঁর অনেক বয়েস হয়ে গেছে। কী করে তুমি তাঁকে দেখাবে?

সোমনাথ বললে—যে-কোনও দিন বিকেল পাঁচটার সময়ে আমার সঙ্গে সেই ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটে গেলেই তুমি তাদের দেখতে পাবে।

—কী রকম?

সোমনাথ বললে—একদিন তুমি আমার অফিসে চারটে কি সাড়ে চারটের সময়ে চলে এসো, তোমাকে নিয়ে আমি আমার গাড়িতে শ্যামবাজারে যাবো। তখন ডাক্তার দত্তকে দেখিয়ে দেব—

ঠিক আছে। সেই কথা অনুযায়ী একদিন সোমনাথ তার গাড়িতে আমাকে তুলে নিলে। ড্রাইভারকে নিয়ে গাড়িতে আমরা মাত্র তিন জন। আমি আর সোমনাথ পেছনের সীট-এ। সামনে ড্রাইভারের পাশে আর একজন, সোমনাথের অফিসের আর একজন লোক।

পাঁচটা বাজার আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের সামনে। সেখানে গাড়িটা থামলো।

খানিক পরেই সোমনাথ বললে—ওই দেখ—ওই দিকে চেয়ে দেখ—

বলে সামনের গলির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে।

আমি দেখলাম—একজন বৃদ্ধা মহিলা চার-চাকাওলা একটা ঠেলা-গাড়ি চালাচ্ছে। ঠেলাগাড়িটা প্যারামবুলেটারের মতো। আগা-গোড়া গদী আঁটা। তাতে একজন বুড়ো লোক ইজি চেয়ারে বসার মতো আরাম করে হেলান দিয়ে বসে আছে। চুলগুলো সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। আর তার পেছনে মহিলাটি হ্যানডেল ধরে ঠেলতে ঠেলতে

সামনে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—

সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! শহরে এমন দৃশ্য বড়ো একটা দেখা যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম—ওঁরা কারা?

সোমনাথ বললে—যে মহিলাটি গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন উনি হচ্ছেন মিসেস দত্ত। আর গাড়িতে যিনি বসে আছেন উনি হচ্ছেন ডাক্তার সঞ্জয় দত্ত। স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে হাওয়া খাওয়াতে বেরিয়েছে। সারা জীবন স্ত্রী স্বামীর ওপর অন্যায়ভাবে যে-অত্যাচার করেছে, আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করছে স্ত্রী এইভাবে। ডাক্তার দত্ত এখন একেবারে শয্যাশায়ী। উঠতে বসতে হাঁটতে পারেন না একেবারেই। ওই স্ত্রী ওঁকে খাইয়ে দেন, বসিয়ে দেন, বিছানায় বেড-প্যান যুগিয়ে দেন। আর বিকেল পাঁচটার সময় রোজ এই প্যারামবুলেটারে বসিয়ে নিজে ঠেলতে ঠেলতে একঘণ্টা ধরে স্বামীকে হাওয়া খাওয়াতে বেরোন।

আমি এখনও সেই অভিনব দৃশ্যটা অবাক হয়ে দেখছি।

সোমনাথ আবার বললে—আমাদের দেশে আমাদের শাস্ত্রে তো অনেক স্ত্রীর নাম পাবে। কিন্তু মলিনা দেবীর মতো এমন সতী কোনও দেশে কোনও কালে কেউ কখনও দেখেনি আর কেউ কখনও দেখতে পাবেও না।

জিজ্ঞেস করলাম—ডাক্তারবাবুর শ্বশুর তো মারা গেছেন, তাই তাঁর পেনসন আসাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাহলে ওদের সংসার চলছে কী করে?

সোমনাথ বললে—ডাক্তারবাবুদের মধু গুপ্ত লেনের বাড়িটা দু' লাখ টাকায় বিক্রি করে সেই টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট-এ রেখে দিয়েছেন। সেই টাকার যা সুদ আসে তাইতেই ওদের দুজনের সংসার কোনও রকমে চলছে। সেই টাকার সুদ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কমলার একটা ভালো বিয়েও দিয়েছে। সে-পাত্রটি ইঞ্জিনীয়ার, রাউর-

কেল্লার ফ্যাক্টরিতে চাকরি ক . কমলা সেখানেই থাকে। আর কখনও কখনও কালে-ভদ্রে এখানে ত রা আসে। এসে বাবা-মা'কে কিছু শাড়ি ব্লাউজ জামা-টামা কিনে দিয়ে যায়। নানা ভাবে বাবা-মা'কে সাহায্যও করে।

আমি তখনও একমনে সেই দৃশ্যটা দেখছি।

সোমনাথ বললে—এতকাল এরা এখানে রয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও বাঙালা সাহিত্যিক এদের নিয়ে গল্প লেখেনি। তুমি গল্পের প্লট চাইলে তাই তোমাকে এই প্লটটা দিলুম। তুমি লেখো-না এদের নিয়ে। দেখবে লোকের খুব ভালো লাগবে।

জিজ্ঞেস করলাম—মিসেস দত্ত তাহলে আগে ডাক্তার দত্তকে অতো কষ্ট দিত কেন? কেন খেতে দিত না? কেন মাইনের সব টাকাটা নিয়ে স্বামীর কোনও যত্ন নিত না? কেন সেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে স্বামী রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটার আগে বাড়ি ফিরতো না? কেন? কেন? কেন? আর এখনই বা সেই স্বামীর জন্যে এত দরদ কেন?

সোমনাথ বললে—দেখ, উর্দুতে একটা বয়েত আছে, সেটা হচ্ছে:

মর্জি খুদা কী
খেল্ নসীব কা
ইজ্জৎ ইনসানো কী—

এর মানে হলো ভগবানের দয়া, ভাগ্যের খেলা আর মানুষের ইজ্জৎ এটা কখন কী ভাবে কার ভাগ্যে জোটে তা কেউ বলতে পারে না। এই ব্যাপারটাও তাই। তবে একটা ব্যাপার আছে এর মধ্যে—

জিজ্ঞেস করলাম—সেটা কী?

সোমনাথ বলতে লাগলো—তবে শোন, সে একটা ভীষণ ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিডি, একেবারে অবিশ্বাস্য ঘটনা।

বললাম—কী রকম?

সোমনাথ বললে—তবে শোন—

ওই সঞ্জয় দত্ত যখন এম-বি পাস করে চাকরি পেলে তখন মেয়ের বাবারা তার সঙ্গে নিজেদের মেয়েব বিয়ে দেওয়ার জন্যে একেবারে লাইন লাগিয়ে দিলে। শেষকালে একজন অত্যন্ত রূপসী মেয়ে পছন্দ হওয়ার পর তার সঙ্গেই মা সঞ্জয়ের বিয়ে দিলে।

বাড়ির একমাত্র ছেলের বিয়ে, তাই বাড়িতে খুব ঘটা হলো। শানাই, বরযাত্রীদের ভিড়, এলাহি খাওয়া-দাওয়া, কোনও কিছুই বাকি রইল না। কন্যাপক্ষও মেয়ের বিয়েতে অনেক দান-সামগ্রী পাঠাল। চল্লিশ ভরি সোনার গয়না, খাট বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, সোফাসেট। লোকে ফুলশয্যার তত্ত্ব দেখে খুব বাহবা দিলে। পাড়ার কোনও লোকের বাড়ির বিয়েতে এত ঘটা, এমন ফুলশয্যার তত্ত্ব আগে কেউ কখনও দেখেনি।

বউ-এর রূপ দেখেও সকলেব চোখ একেবারে কপালে উঠলো। তার সঙ্গে চল্লিশ ভরি সোনার গয়না, জড়োয়া গয়না, সবই দেখবার মতো। সবাই সঞ্জয়ের সৌভাগ্য দেখে ধন্য-ধন্য করতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

—বউভাত কাটিয়ে বউ একদিনের জন্যে বাপের বাড়িতে গেল। একটা রাত বাপের বাড়িতে কাটিয়ে পরের দিন শ্বশুববাড়িতে ফিরে আসার কথা। যাকে বলে দ্বিরাগমন। কিন্তু সেই বাপের বাড়িতে সেই রাতেই একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। মেয়ে যে-ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে দেখে সবাই ভাবলে, মেয়ে বুঝি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু বেলা দশটা পর্যন্ত যখন দরজা খুললো না তখন দরজা ভেঙে ফেলা হলো। দরজা ভাঙতেই দেখা গেল ঘরের ভেতরে দু'জন গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে। একজন অচেনা ছেলে আর একজন বাড়ির মেয়ে।

সেইদিনই সঞ্জয়ের বাড়িতে খবরটা পৌঁছলো। এই জোড়া

আত্মহত্যার জন্যে কে দায়ী? কেউই না। মাঝখান থেকে নিষ্পাপ সঞ্জয় দত্তের জীবনের ওপর দুর্ভাগ্যের অভিশাপ নেমে এল। তাই এ-গল্পটা তুমি যদি লেখ তাহলে এর নাম দিও—'খেল্ নসীব কা'।

—আর এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।

বলেই ড্রাইভারের পাশের সীটে যে ভদ্রলোক বসে ছিলেন তাঁকে দেখিয়ে সোমনাথ বললে—এই ইনিই হচ্ছেন সেই কাশীপতি, যিনি এই সমস্ত ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেশন করেছিলেন। ইনি আমাদের ডিপার্টমেণ্টের একজন ইনসপেক্টার এখন—

কাশীপতি আমার দিকে চেয়ে দুই হাত তুলে নমস্কার করলেন।

২

খেল্ নসীব কা'র আর একটা কাহিনী বলি। সেটা আমার দেখা ঘটনা।

প্রত্যেক বছরে পুজোর আগে এইরকম ঘটে। সমস্ত বছরটা কাটে ধারাবাহিক উপন্যাসের ঝামেলা নিয়ে। তাতে দিনের শান্তি, রাতের ঘুম বিঘ্নিত হয়। উপন্যাসের চরিত্রগুলো তখন পেছু তাড়া করে। একটা নির্দিষ্ট তারিখে পত্রিকার জন্যে পাতাগুলো ভর্তি করে যথাস্থানে হস্তান্তর করা বড়ো কম পরিশ্রমের কাজ নয়।

কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমটা যতো কষ্টকরই হোক, সেটা তবু সহ্য করা সহজ। কিন্তু মানসিক ঝামেলাটাই হয় অসহ্য। উপন্যাসের গল্পের চরিত্রগুলো যতোই কল্পিত হোক, তাদের সত্যি বলে প্রমাণ করা কি অতো সহজ?

কেউ কেউ প্রশংসা করে চিঠি লেখে। কেউ কেউ আবার খুশীও হয় না। আধখানা পড়েই ঘুমোতে যায়। এই-ই চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। কেউ কেউ আবার যতো রাতই হোক, বই শেষ না করে উঠতে পারে না। সারা রাতটাই জেগে কাটিয়ে দেয়। দেখে নেয় শেষকালে নায়ক-নায়কার বিয়ে হলো, না বিচ্ছেদ হলো।

যেদিন থেকে সাহিত্য জিনিসটার সৃষ্টি হয়েছে সেই দিন থেকেই এইরকম চলে আসছে। এই শেষ জানবার কৌতূহল, এই জীবন-মরণ সমস্যার অক্লান্তকর সুষ্ঠু সমাধান জানবার আগ্রহ।

সকলেরই তখন একই প্রশ্ন—কী হলো তা তাড়াতাড়ি বলে দাও। আর দেরি সহ্য হয় না।

একদিকে পাঠকের এই দুর্নিবার আগ্রহ আর অন্যদিকে লেখকের এই প্রাণান্তকর কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টা, এরই ইতিহাস হলো পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস। এই দীর্ঘকালে কোটি কোটি সাহিত্য

সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'টা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে?

তার মধ্যে এসেছে সিনেমা, তার মধ্যে এসেছে রেডিও, আর আজ তার মধ্যে এসেছে টেলিভিসন।

আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে পত্র-পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যা। আর সমান তালে চলেছে পূজা-সংখ্যার জন্যে বিশেষ করে উপন্যাস লেখা।

আর সত্যিই কি এগুলো উপন্যাস?

১১১

এরই পটভূমিকায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল করমচাঁদের সঙ্গে। করমচাদ আগরওয়ালা।

বহুকাল আগে করমচাঁদের পূর্বপুরুষ কলকাতায় এসেছিল, আর তখন থেকে এখানেই তাদের স্থায়ী বসবাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে কতোকাল হবে তা কমচাদ জানে না। কিন্তু বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে সে-সব কথা তার জানা হয়ে গিয়েছিল।

সে কি আজকের কথা!

ওই যখন কলকাতায় সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউ তৈরি হয় সে-সব সেকালের কথা। করমচাঁদের পূর্বপুরুষ একদিন কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্য ফেরাতে। রাস্তা ছিল না তখন ও-অঞ্চলে। আর যা ছিল তা সমস্তই গলি-ঘুঁজি। সেই গলি-ঘুঁজি দিয়ে সরু সরু পথ পেরিয়েই অনেক ঘুর-পথে বাগবাজারে পৌঁছানো সম্ভব হতো।

এই সেন্টাল এ্যাভিনিউয়ের পরিকল্পনাটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়েছিল 'ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টে'র ওপর।

দেখতে দেখতে ওই অঞ্চলের যতো বাড়ি সমস্ত ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আর তার জায়গায় বিরাট চওড়া রাস্তা তৈরি হলো, নতুন নতুন বাড়ি গজিয়ে উঠলো। সমস্ত এলাকাটার ভোল পালটে গিয়ে

একটা নতুন চেহারা নিলে। আগে ও-অঞ্চলে যতো বাঙালী অধিবাসী ছিল তারা সবাই নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ পেয়ে ভাবলে তারা বুঝি খুব লাভ করলে।

কিন্তু টাকার দাম যে বরাবর কমে যায় আর জমি-বাড়ি স্থাবর সম্পত্তির দাম যে বরাবর বেড়ে যায় তার হদিস বাঙালীরা বোঝে না। বোঝে মারোয়াড়ীরাই। ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের রক্তের মধ্যে জড়িয়ে থাকে। সেই মারোয়াড়ীরা তখন কলকাতার বড়োবাজার এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো। কোনো বিশেষ অঞ্চলে ঘনীভূত হয়ে থাকতো না তারা।

কিন্তু সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এর খালি জমিটার জন্যে যখন নতুন খরিদ্দারের আহ্বান জানালো ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, তখন যাদের হাতে মোটা টাকা মজুত ছিল তারাই প্রথম সামনে এগিয়ে এলো। তারাই এই নতুন জমিদারির পত্তন করলে সেখানে। তারা হলো কলকাতার নতুন জমিদারশ্রেণী।

আর বাঙালীরা?

বাঙালীদের জন্যে তখন আর নতুন কোনো এলাকা বরাদ্দ নেই। তারা পকেটে ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে আরো কোনো ঘিঞ্জি এলাকায় গিয়ে ভাড়াটে হয়ে গেল। ভাবলে, টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে তার সুদ খেয়েই আরামে জীবন কাটিয়ে দেবে। আর নয়তো ওইসব নতুন অঞ্চলে যাও যেখানে মশা আর মাছির উপদ্রব, যেখানে জন-প্রাণী নেই, যেখানে এখনও বসতি গড়ে ওঠেনি—সে ওই বালিগঞ্জ, সে ওই লেক এরিয়া। যেখানে এখনও চোর-ডাকাতের উপদ্রবে কেউ রাতে ঘুমোতেও পারে না, সেখানেও আমরা নতুন শহর তৈরি করছি!

কিন্তু কে সেখানে যাবে মরতে? কে সেখানে বাড়ি-ঘর বানাবে? কে মরবে শেয়াল-কুকুর-সাপের কামড়ে?

তার চেয়ে আমরা এই হাতীবাগানে, এই শোভাবাজারে ভাড়াটে

বাড়িতেই থাকবো। এখানে না-ই বা থাকলো রোদ-হাওয়া। এখানে জন-মানুষ আছে, ট্রাম আছে, ঘোড়ার গাড়ি আছে।

এখানে থেকে আমরা শহরের সবরকম সুবিধে ভোগ করবো, তাতে রোদ-হাওয়া-জল না-ই বা পেলাম। কিন্তু আমরা ওই বালিগঞ্জের জঙ্গলে যেতে চাই না।

এর পর থেকেই সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এর যতো ছিন্নমূল বাঙালীরা সবাই উত্তর কলকাতার ভাড়াটে হয়ে রইল, আর সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউটা হয়ে গেল রাজস্থানীদের পাড়া। তারা সেখানে চারতলা পাঁচতলা বাড়ি তুলে শহরের শোভা বাড়াতে লাগলো আর দক্ষিণ কলকাতাটা হয়ে রইলো মশা-মাছি আর নোংরা ডোবার অঞ্চল।

এসব সেই ১৯১৮-১৯২০ সালের কাহিনী।

তখন করমচাঁদ জন্মায়নি। করমচাঁদের ঠাকুরদাদা ফুলচাঁদ সবে মাত্র কলকাতায় এসেছে। ফুলচাঁদের মাথাতেই প্রথমে আইডিয়াটা এলো। ফুলচাঁদ ভাবলে এই সেণ্টাল এ্যাভিনিউটা একদিন নিশ্চয়ই বাঙালী-শূন্য হয়ে যাবে। তাদের সকলের সন্তান হবে। সেই সন্তানদের আবার একদিন সন্তান-সন্ততি হবে। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা তো কেবল বেড়েই যাবে। তখন ?

তখন কী হবে ?

ফুলচাঁদ কলকাতায় এসেই শেয়ার-মার্কেটে দালালি শুরু করেছিল। দালালি করে যতো পয়সা কামাতো সেই পয়সা আবার শেয়ারে লাগাতো। যখন তার অনেক পয়সা জমলো তখন একটা বাড়ি কিনে ফেললো এই সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউতে।

সেই ফুলচাঁদের ছেলে ঈশ্বরচাঁদ। ঈশ্বরচাঁদও একদিন তার বাবার পেশা ধরলো। সে তার পৈতৃক সম্পদকে দশ গুণ বাড়িয়ে দিলে। তার বাবার শেয়ারের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে জমি-বাড়ি কেনা-বেচার ব্যবসাতেও অনেক সম্পত্তি করে ফেললে।

তারপর এলো করমচাঁদ। ঈশ্বরচাঁদের ছেলে।

করমচাঁদ আমাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তো। সেই সূত্রেই তার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। আরো অনেকের সঙ্গে পড়তো ইন্দ্রনাথ—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী।

করমচাঁদ আর ইন্দ্রনাথ—তারা দু'জনেই বড়োলোকের ছেলে। করমচাঁদ পৈতৃক সূত্রে বড়লোক। আর ইন্দ্রনাথের বাবা ছিলেন আই-সি-এস অফিসার।

বাবা আই-সি-এস হওয়ার কল্যাণে ইন্দ্রনাথদেরও অনেক সম্পত্তি ছিল। কিন্তু ব্যবসার টাকা আর চাকরির টাকার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। ব্যবসার টাকা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু চাকরির টাকা নজরে পড়ে।

তাই সাজ-পোশাকে ইন্দ্রনাথকে দেখে বোঝা যেত যে তাদের টাকা আছে। তখন প্যান্ট-শার্ট পরবার তেতো রেওয়াজ হয়নি। যুদ্ধের আগে পাঞ্জাবি-ধুতি আর নিউকাট জুতোই ছিল আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ। তাই আমরা ধুতি-পাঞ্জাবিই পরতাম। করমচাদ বাঙালী না হলেও আমাদের বাঙালীদের মতোই পোশাক-পরিচ্ছদ পরতো।

করমচাঁদকে দেখে কেউই বুঝতে পারতো না যে সে অবাঙালী। কারণ সে বাংলা ভাষাতেই কথা বলতো আমাদের মতো। বহুকাল কলকাতায় কাটিয়ে তারা প্রায় বাঙালীই হয়ে গিয়েছিল। শুধু বাঙালীদের পোশাক নয়, চাল-চলন থেকে আরম্ভ করে সবকিছুই তার আমাদের বাঙালীদের মতো। করমচাঁদকে দেখে কেউ বুঝতে পারতো না যে করমচাঁদ বাঙালী নয়।

করমচাঁদ বলতো—কে বললে আমরা বাঙালী নয়? আমরা তিন পুরুষ বাঙলায় বাস করছি। আমি, আমার বাবা সবাই কলকাতাতেই জন্মেছি। তারপরেও আমরা বাঙালী নই?

ইন্দ্রনাথ বলতো—কিন্তু তোর নাম? তোর নাম শুনেই তো সবাই

বলবে তুই মারোয়াড়ী—করমচাঁদ আগারওয়াল শুনলেই তো সবাই বুঝতে পারবে তুই কী জাত!

অবশ্য করমচাঁদ যে জাতের লোকই হোক তাতে আমাদের বন্ধুত্বের কোনো হের-ফের হতো না। সে বাড়িতে অবশ্য মাছ-মাংস খেত না, কিন্তু কলকাতাতে থেকে আর আমাদের সঙ্গে মিশে-মিশে রেস্তোরাঁতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে মাংসর চপ্, কাটলেট খেতো।

এক কথায় বলতে গেলে সে মারোয়াড়ী হলেও তার নিজস্ব কোনো বিশেষ জাত ছিল না। আসলে সে ছিল ভারতীয়। মারোয়াড়ী হয়েও সে ছিল কসমোপলিটান।

আর ইন্দ্রনাথ?

ইন্দ্রনাথরা ছিল করমচাঁদদের মতোই বড়লোক।

তার বাবা-কাকা জ্যাঠামশাই সবাই আই-সি-এস। এক এক জন এক-একটা জায়গায় চাকরি করতেন। ফ্যামিলি বড়ো হলে কী হবে, সবাই ভিন্ন-ভিন্ন। একটা ফ্যামিলিতে এতগুলো আই-সি-এস সাধারণত দেখা যায় না। যে কোনো ফ্যামিলির পক্ষে এটা গর্বের বস্তু হলেও করমচাঁদদের কাছে এটা তেমন কিছুই নয়। করমচাঁদদের সম্পত্তির শেষ ছিল না কলকাতায়। তারা যে বড়োলোক তা বাইরে থেকে ধরা না গেলেও মনে মনে সবাই ধরে নিত। বিশেষ করে তারাই জানতো যারা শেয়ার-মার্কেটের খবর রাখতো।

আর তাদের বন্ধু—আমি?

আমাকে মধ্যবিত্ত বললেও হয়তো বেশি বলা হতো। আর্থিক বা কৌলীন্যের দিক থেকেও তাদের তুলনায় আমরা ছিলাম তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

কিন্তু সে-যুগটা ছিল একেবারে অন্যরকম। এ-যুগের সঙ্গে তার একেবারেই তুলনা চলে না। মানুষের টাকা দিয়ে মানুষের বিচার হতো না। বড়োলোক-গরীবলোকের প্রশ্নই তখন উঠতো না। বন্ধুত্ব আর প্রীতির সম্পর্ক দিয়েই পরস্পর পরস্পরকে চিনে নিতাম।

কলেজে তো আরো অনেক ছেলে ছিল। তাদের সঙ্গে যে মিশতাম না, তা নয়। মিশতাম। কিন্তু খুব যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তা নয়। তবে আমাদের এই তিনজনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কটা একটু গাঢ়তর ছিল। কলেজের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে যদি কখনও একটু সময় পেতাম তো কোনো চায়ের দোকানে গিয়ে বসতাম। তারপর চলতো আমাদের আড্ডা। চা খাওয়াটা ছিল উপলক্ষ্য, লক্ষ্যটা ছিল গুলতানি করা।

এমনি করেই কেটে যেত আমাদের কলেজ-জীবন।

আমাদের বাঙালীদের লেখাপড়াটা ছিল অবশ্যপালনীয়। কারণ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যটা ছিল ভবিষ্যৎ-জীবনে একটা ভালো পাকা চাকরি পাওয়া। ইন্দ্রনাথেরও তাই।

সে-সব নিয়ে মাঝে মাঝে কথা হতো।

সেদিক দিয়ে ইন্দ্রনাথ আর আমার উদ্দেশ্য ছিল একই রকম। ইন্দ্রনাথ বলতো সে বি-এ পাস করে ল' পড়বে।

জিজ্ঞেস করতাম—তুই ল' পড়ে কী করবি?

ইন্দ্রনাথ বলতো—কী আর করবো। দিনের বেলা এম-এ পড়বো আর বিকেলবেলা পড়বো ল'।

তখন বিকেল চারটে থেকে ল' কলেজের ক্লাস হতো।

আমি বলতুম—উকিল হবি তুই?

ইন্দ্রনাথ বলতো—উকিল হই আর না হই, পড়তে তো কোনো দোষ নেই। কিন্তু তুই?

আমি বলতুম—আমি কবি হবো!

সত্যিই, এখন ভাবলে হাসি পায়, তখন কতো সাদা-সিধে জীবনই না ছিল। জিনিসপত্রের দাম কতো সস্তা ছিল। মানুষের মন কতো সরল ছিল। মানুষ কতো ভালো ছিল। কতো অল্পতে মানুষ সন্তুষ্ট হতো!

—কবি হয়ে রবিঠাকুর হবি তুই?

এ-কথার কী উত্তর দেব আমি! যে কাজে টাকা পাওয়ার কোনো

সম্ভাবনা নেই সেই কাজই যদি কেউ করতে চায়, তাতে তখন কেউ অবাক হতো না। যে-যুগে একটা মানুষের পেট চলে যায় কুড়ি-পঁচিশ টাকায়, সে-যুগে কার কী হওয়ার বাসনা হওয়াটা অপরাধ বলে গণ্য হতো না। তাই আমার কথায় দু'জনের কেউই হাসতো না। তারা দু'জনেই জানতো আমার কবি হওয়ার বাসনার কথা। কিন্তু হাসতো না এই-জন্যে যে তারা কবিকে শ্রদ্ধা করতো! বিশেষ করে রবিঠাকুর যখন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তখন কবিতাটা আর তাচ্ছিল্যের সামগ্রী বলে বিবেচিত হতো না।

আর আমাদের করমচাদ?

করমচাঁদ ভবিষ্যতে কী হবে তা অনুমান করতে আমাদের কোনো বেগ পেতে হতো না। ভবিষ্যতে সে যা হবে তা না জিজ্ঞেস করলেও চলতো। বংশ-পরম্পরায় তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে এসেছে, সুতরাং তার পক্ষে বি-এ, এম এ পাস করাটা বিলাসিতা বা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু নয় বলে আমরা আর তাকে সে-প্রশ্ন করতাম না।

কিন্তু সে একদিন জিজ্ঞেস করলে—আমাকে তো জিজ্ঞেস করলি না আমি বড়ো হয়ে কী হবো?

আমি বললাম—তুই বড়ো হয়ে আর কী হবি, হবি শেয়ার-মার্কেটের দালাল—

আমি সকলের বাড়িতেই গিয়েছি। ওরাও আমাদের বাড়িতে এসেছে।

বোধহয় করমচাঁদের বাড়িতে কোনো বিয়ের উৎসবে একবার আমাদের দু'জনের নেমন্তন্ন ছিল। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এ কী বিরাট বাড়ি ছিল ওদের! তখনকার দিনেই ওদের চারতলা বাড়ি। খোপ-খোপ ঘর। পরিবারের বিরাট সংখ্যা। ঠাকুরদাদার বিরাট বংশ-বৃদ্ধির দৌলতে সংসারে মানুষের সংখ্যার কমতি নেই কোথাও। যতো আর্থিক সঙ্গতি বেড়েছে আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ও বেড়েছে ততো। কে কাকে দেখবে,

কে কাকে অভ্যর্থনা করবে ? সকলেরই চিন্তা ঐশ্বর্য প্রদর্শনের। সেটা যতোটা না খাওয়া-দাওয়ার দিকে, তার চেয়ে বেশিটা হলো পোশাক-আশাকের দিকে। সেই দিকেই সকলের ঝোঁকটা বেশী।

সেদিন স্বীকার করতেই হলো যে করমচাঁদ আগরওয়ালারা সত্যিই বড়োলোক বটে। বাহারি পান, সুস্বাদু ঠাণ্ডাই সরবৎ।

করমচাঁদ সরবৎ দিতে বললে একজনকে।

সরবতের গেলাসে চুমুক দিয়ে খুব ভালো লাগলো।

জিজ্ঞেস করাতে করমচাঁদ বললে—এক এক গ্লাস সরবতের দাম আট টাকা করে।

তখনকার দিনের আট টাকা মানে এখনকার দিনে আশি টাকার মতোন হবে। সেই অতোকাল আগে আট টাকা দামের এক গ্লাস সরবৎ পরিবেশন করা সোজা কথা নয়।

তারপরেও অনেকবার আমরা করমচাঁদদের বাড়িতে গিয়েছি! বরাবরই তাদের ঐশ্বর্য আমাদের চমৎকৃত করেছে। নতুন বিয়ের কনে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল করমচাঁদ। আগাগোড়া লাল রং-এর শাড়ি। শাড়ির ওপর সোনালি আর রুপোলি বুটি।

করমচাদ বলেছিল—জানিস ওই বুটিগুলো খাঁটি সোনার আর রুপোর। কতো দাম হবে বল্ তো ?

দামের আমরা কী জানি। দাম সম্বন্ধে তখন আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু এটা বোঝা গেল যে শাড়িটা খুবই দামী জিনিস।

বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস সমস্তই নিরিমিষ। করমচাঁদরা শাকাহারী। কিন্তু তাতে কী ? সব খাবারই শুদ্ধ ঘি দিয়ে তৈরি। পুরি কচুরি থেকে আরম্ভ করে দহিবড়া মেঠাই সমস্তই খেয়েছিলাম। আজ আর সে-সব জিনিসের স্বাদের কথা মনে নেই। মনে আছে শুধু সেই ঐশ্বর্য আর জাঁক-জমকের বাহারের কথা।

আর তারপর একদিন গিয়েছিলাম ইন্দ্রনাথদের বাড়ি।

তখন ইন্দ্রনাথদের ছিল একটা মাত্র বাড়ি। ইন্দ্রনাথের কাকারা তখন আলাদা বাড়ি করেন নি।

সেটা ছিল ইন্দ্রনাথের খুড়তুতো দিদির বিয়ে। সেটাও ছিল বিরাট ব্যাপার। তখন মাইক্রোফোন বা লাউড-স্পীকারের এতো চল হয়নি। কিন্তু অন্য ব্যবস্থা ছিল। বাড়ির গেটের সামনে রথের চুড়োর মাথার ওপর রঙিন কাপড় দিয়ে একটা ঘর করা হয়েছিল। সেই ঘরে বসে নহবৎ বাজছিল।

আর বাড়ির সামনে ছিল একটা বিরাট লন্। সেই লন্-এ সারা বছরই চারদিকে ফুলগাছে ফুল ফুটে থাকতো। সেইখানেই আয়োজন হয়েছে অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার।

বিয়ের জন্যে অতিথি আত্মীয়-স্বজনদের সেইখানেই বসতে দেওয়া হয়েছে। অতিথিরা বাড়িতে ঢুকতেই গোলাপ-জল ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আমি মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলে। আমার চোখে এই সবই ছিল বিস্ময়ের বস্তু। ঈর্ষা করবার মতো কিছু ছিল না এতে। কারণ আমার সেই ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য পড়া অভ্যাস ছিল। সাহিত্য মানে বিশ্ব-সাহিত্য। সেই বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে যা হয়, আমারও তাই হয়েছিল। আমার মনে হতো ওই যে ঐশ্বর্য, ওটা বাইরের। ওই বাইরের ঐশ্বর্যটা খোলসের মতো একদিন খসে পড়ে। সেই খোলসটা খসে পড়লে বাকি যেটা পড়ে থাকে সেটাই আসল। সেখানে সব মানুষই এক। সেখানে উচু-নিচু নেই, বড়োলোক-গরীব-লোক নেই। সেখানে সবাই সমান।

আমাদের বাড়িতে টাকা-কড়ি ছিল না। টাকা-কড়ির বাড়-বাড়ন্তও ছিল না। ছিল শুধু বই। বিশ্বের সমস্ত সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ সব রচনা-সংগ্রহ।

তবে তখনও সেটা বেশি করে প্রকট হয়নি। তাই আমার সাধ ছিল বড়ো হয়ে আমি কবি হবো।

এসব কার বই? বইগুলো আমার পিতামহের। তাঁকে আমি দেখিনি। কিন্তু ওই বইগুলো দেখে আমার মনে হতো আমার পিতামহেরও বোধহয় অর্থের লালসা প্রকট ছিল না। নইলে অন্য লোকের চোখে যা নিষ্প্রয়োজন, আমার পিতামহের কাছে তা অতো অনিবার্য আর অপরিহার্য ছিল কেন?

১১১

তা যাক গে এসব কথা। এর মধ্যে কোনো গল্প নেই, কোনো চরিত্রও নেই। এবার করমচাঁদের জীবনের এখনকার কথা বলি। আর সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রনাথের কথাও বলি।

এতোদিন পরে সেই অতীতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু করমচাঁদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

আর দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব অতীতের দিনগুলোর কথা আবার মনে পড়ে গেল। তারপর কতোকাল কেটে গেছে। কতো বছর পার হয়ে গেছে। যুদ্ধ হয়ে গেছে বিশ্ব জুড়ে। দেশ ভাগ হয়েছে। দেশে লোকসংখ্যা বেড়েছে। মানুষ মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে।

আর শুধু তাই-ই নয়, পৃথিবীর ভূগোলটা পুরোপুরি উল্‌টে-পাল্‌টে গেছে। মানচিত্রে যে দেশের রং ছিল লাল, তা হঠাৎ সবুজ হয়েছে। সবুজটা কোথাও নীল হয়েছে। যে-দেশ আগে একখানা ছিল তা চার-পাঁচ টুকরো হয়ে গেছে। শত্রুরা বন্ধু হয়েছে কোথাও, আবার বন্ধুরা শত্রু হয়ে গেছে।

এমনি করেই মানুষও যে কতো বদলে গিয়েছে তারও ঠিক-ঠিকানা নেই। গরীব বড়োলোক হয়েছে, অনেক বড়োলোকও গরীব হয়ে গেছে।

আর আমরা?

কলেজ আর ইউনিভারসিটির উঠোন পেরিয়ে আমরা কে কোথায় কোন্ দিকে ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়েছি তার খোঁজ-খবর রাখবার সময়ও পাইনি। মাঝে মাঝে যে আমাদের দেখা হয়নি তা নয়, কিন্তু সে খুব কম সময়ের জন্যে।

হয়তো এইরকমই হয়। হয়তো এই-ই নিয়ম।

কারণ বড়োলোকই হই আর গরীবলোকই হই, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের প্রত্যেক জীব-জন্তুদেরও তো একটা ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে। আমরাও তো আমাদের অস্তিত্ব বাচাবার জন্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে চলেছি। এই পৃথিবীতে আমরা কে আর মৃত্যু চাই? আমরা চিরকালই তো বেঁচে থাকতে চাই আপন-আপন মর্যাদা নিয়ে। আমরা কেউ চাই অর্থ, কেউ চাই খ্যাতি, কেউ চাই অমরত্ব, কেউ চাই মুক্তি। তাই আমরা কেউই মুছে যেতে চাই না পৃথিবী থেকে। সেই সংগ্রামের মধ্যে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমরা পরস্পরের থেকে পরস্পরের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলি।

আমাদেরও তাই হয়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও আমরা সকলের সঙ্গে আগেকার মতো আর যোগাযোগ রাখতে পারতাম না। সেই সংগ্রামে কে যে কোথায় ছিট্‌কে পড়লো তা জানবার সুযোগ আর সময় আমাদের আর রইলো না।

তাই করমচাঁদ যখন আমাকে ডাকলে আমার খুব আনন্দ হলো।

জিজ্ঞেস করলুম—তুই? কী খবর তোর?

করমচাঁদ আনন্দে গদগদ। বললে—আরে, শুনলাম তুই নাকি লেখক হয়েছিস! নভেল-টভেল লিখছিস?

বললাম—তুই কী করে জানলি তা?

করমচাঁদ বললে—আরে, আমাকে তো আমার বিজ্‌নেসের জন্যে অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়।

—কী বলে তারা?

—বলে, তোর গল্প নিয়ে নাকি সিনেমা হয়েছে!

বললাম—তুই কি সিনেমা দেখিস নাকি?

—সিনেমা দেখবার সময় কোথায় আমার হাতে! তোর নাম শুনে বুঝলুম তুই তাহলে লেখক হয়েছিস।

একটু থেমে বললে—তা, আর কী করিস? চাকরি-বাকরি তো কিছু করিস তার সঙ্গে নিশ্চয়ই—

বললাম—না, চাকরি করি না।

—চাকরি করিস না তা তাতে সংসার চলে কীসে? ব্যাবসা-ট্যাবসা কিছু করিস তো?

বললাম—না, তাও করি না।

করমচাঁদ এবার অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী রে? লিখে পেট চলে? ছেলে-মেয়েরা চাকরি করে বুঝি?

বললাম—না। আমার ছেলে নেই।

—ছেলে নেই? বেঁচে গেছিস তুই! আজকাল ছেলে থাকলেই বিপদ। ছেলেরা আজকাল আর বাপ-মায়ের দিকে দেখেই না!

বললাম—তা জানি না। তবে আমার মাত্র একটা মেয়ে, তার এখন বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে-জামাই থাকে দিল্লীতে—

—তাহলে বেঁচে গেছিস তুই! আজকাল মেয়েরা আর প্রবলেম নয়, ছেলেরাই এখন প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—কে বললে তোকে?

করমচাঁদ বললে—ইন্দ্রনাথ।

আমি এতোকাল পরে ইন্দ্রনাথের নাম শুনে চমকে উঠলাম। বললাম—ইন্দ্রনাথ? ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তোর দেখা হয়?

করমচাঁদ বললে—অনেক কাল দেখা হয়নি। কিন্তু এখন হচ্ছে। এখন ঘন-ঘন দেখা হচ্ছে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে।

—হঠাৎ কেন ঘন-ঘন তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে? কেমন আছে সে?

করমচাঁদ বললে—ওরই তো ছেলে। ছেলেকে নিয়ে এখন বড়ো মুশকিলে পড়েছে সে!

আমি সত্যিই বড়ো অবাক হয়ে গেলাম ইন্দ্রনাথের খবর শুনে। ইন্দ্রনাথের বিয়ের সময়েও গিয়েছিলাম তাদের বাড়িতে। সেই বিরাট লনওয়ালা বাড়ি। ইন্দ্রনাথ তখন ল' পাস করেছে। ইংরেজীতে এম-এ'ও পাস করেছে। সেই সময়েই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তার পয়সা উপায় করার দরকার ছিল না তখন।

তখনই জেনেছিলাম যে ইন্দ্রনাথ বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে।

আর সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবেই বা না কেন? তার কীসের অভাব? বাপের টাকা ছিল, বাপের বিরাট বাড়িটা সে-ই পেয়েছে। তারপর খুব রূপসী মেয়েকে বিয়েও করেছে।

মনে আছে সে-বিয়েতে আমি গিয়েছিলাম, করমচাঁদও গিয়েছিল। বিয়েতে জাঁক-জমক হয়ই। সেটা খুব নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু তা বলে অতো জাঁক-জমক?

সেই জাঁক-জমক দেখে করমচাঁদের মতো মানুষও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত কাণ্ড-কারখানা দেখে সেও বলেছিল—আরে, ইন্দ্রনাথরা তো খুবই বড়োলোক!

বাড়ির সামনে সেই বিরাট লনটা আমরা আগেই দেখেছিলাম। আগে যখন ওদের বাড়িতে আমরা একবার-দু'বার গিয়েছি তখনই ও-সব দেখছি। কলকাতা শহরে ও-রকম খুব কম বাড়িই ছিল। তারপর চাকর-বাকরের সমারোহও দেখবার মতো।

কিন্তু বিয়ে-বাড়ির সমারোহের সঙ্গে সে-সব যেন তখন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির সামনের রাস্তায় সে কী অসংখ্য গাড়ি! গাড়ির সংখ্যায় রাস্তায় লোক-চলাচলও বাধা পাচ্ছিল। আর তার সঙ্গে বাজি ফাটানো। এক-একটা বাজি আকাশে পৌঁছে ফাটছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মালার মতোন ঝুলছিল অনেকক্ষণ ধরে। শুধু নিমন্ত্রিতরাই

নয়, সারা কলকাতার লোকরাই তা সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছিল।

যারা দেখছিল তারা কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছিল—ও-সব কী হচ্ছে রে ওখানে? কী হচ্ছে?

কেউ-কেউ জানতো ব্যাপারটা। আবার কেউ—কেউ ব্যাপারটা জানতো না।

যারা জানতো তারা বলতো—আরে ওটা যে চৌধুরী সাহেবের বিয়ে-বাড়িতে বাজি ফাটানো হচ্ছে—

অনেকে জিজ্ঞেস করতো—কী চৌধুরী? কোন্ চৌধুরী?

—আরে জানিস না, কেদার চৌধুরী, আই-সি-এস। তাঁর ছেলের বিয়ে আজ, তাই অতো বাজি ফাটানো হচ্ছে—

—কোন্ ছেলে?

—আরে, ওঁর একটাই তো ছেলে। ছেলেটা কিছু না। ছেলেটা মাত্র ওকালতি করে। বাপের যা টাকা আছে তাই ভাঙিয়েই সারা জীবন আরামে কাটিয়ে দেবে।

কথাটা মিথ্যে নয়।

কেদার চৌধুরী আদি যুগে ছিলেন এক বিরাট জমিদারের ছেলে। পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত এক জমিদার-বংশের সন্তান। তখন দেশ ভাগ হয়নি। তখন দেশে জমিদারি দেখবার জন্যে নায়েব ছিল, সেরেস্তা দেখতো তারাই। তখন কলকাতাটা এই কলকাতা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু চৌধুরী বংশের কর্তাদের দূরদৃষ্টি ছিল প্রখর। তাঁরা বুঝেছিলেন যে সারা দেশের রাজধানী হলো কলকাতা। গ্রামে পড়ে থাকলে ছেলেরা মানুষ হবে না তেমন। রাজধানীতে না থাকলে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই কারো। তাই গ্রামের জমিদারির টাকায় তখন থেকেই তাঁরা কলকাতায় বেশ কিছু জমি-জমা কিনেছিলেন। তখন জলের দামে তাঁরা কিনেছিলেন এই বাস্তু-জমি।

সেখানে একটা ছোট বাড়িও করেছিলেন।

শেষজীবনে তিনি আর পূর্ববঙ্গে থাকতেন না। গ্রাম থেকে বাড়তি টাকা এনে এই কলকাতার উপকণ্ঠেই এক এক করে জমি-জমা কিনে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে শুধু জমিদারি দেখাশোনা করবার জন্যেই দেশে যেতেন। আর, বছরের বেশির ভাগ সময়টাই কাটাতেন এই কলকাতায়।

কেদার চৌধুরীর বাবা অশোক চৌধুরী মশাই নিজে তেমন লেখা-পড়া করেননি। কিন্তু লেখাপড়া না শেখার জন্যে তাঁর মনে অনুতাপ ছিল। তাই তখনই তিনি ঠিক করেন যে তাঁর তিন ছেলেকে ভালো করে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন।

তাঁর সাধ পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তা নিজের চোখে দেখে যেতে পারেননি। তার আগেই তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু এই কলকাতা শহরে তিনি অনেক জমি-জমা করে গিয়েছিলেন।

ছেলেরা বড়ো হয়ে সেইসব জমি-জমার মালিক হয়েছিল। টাকার সঙ্গে বিদ্যে মিলে-মিশে তিন ছেলেই শুধু টাকাতেই নয়, ইজ্জতের দিক থেকেও বড়ো হয়েছিল একসঙ্গে সমাজের চোখে আর কলকাতার ধনী সমাজের চোখেও।

ইন্দ্রনাথের বিয়েতে তাদের বাড়িতে যখন গিয়েছিলাম তখন এই-সব কথাই ভাবছিলাম। করমচাঁদকেও বলছিলাম।

করমচাঁদ আগেও অনেকবার এসেছে। কিন্তু আকাশে এমন বাজি ফাটবে তা কেউ কখনও ভাবেনি। তখন করমচাঁদেরও বড়ো অবাক লাগছিল সব কিছু দেখে। এত সাহেব-মেমদের ভিড় আগে কোনো বিয়ে বাড়িতে সে দেখেনি।

করমচাঁদ সব দেখে-শুনে হেসে বললে—হ্যাঁ, সত্যিই ইন্দ্রনাথ বড়োলোক রে। আমাদের টাকাই আছে, কিন্তু ইন্দ্রনাথদের টাকাও আছে আর তার সঙ্গে ইজ্জৎও আছে। আমাদের টাকা আছে, কিন্তু এতো ইজ্জৎ নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কীসে টাকা ওদের হলো অতো ?

করমর্চাদ বললে—ওরা যে জমিদার রে। জমিদার ছিল ওরা, সেখানকার যতো ইনকাম হতো সেইসব টাকা নিয়ে এখানে জমিতে ইনভেস্ট করেছে, আর জমির দাম তো কেবল বেড়েই চলেছে। তার জন্যেই অতো টাকা এদের।

এসব যুদ্ধের আগেকার ব্যাপার। তখন সত্যিই সব জিনিসের দাম কম ছিল। তখন কেউ ভাবেইনি যে একদিন এক ইঞ্চি জমিও এখানে পাওয়া যাবে না। অশোক চৌধুরী মশাই কিন্তু সেই যুগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা মানে টাকা নষ্ট করা। তাই তখন তাঁর হাতে যা-কিছু টাকা আসতো সব তিনি কলকাতার আশে-পাশে ঢালতেন। এখন যেখানে পুকুর-ডোবা-জঙ্গল কেবল তাতেই তিনি লগ্নী করতেন টাকাগুলো। হাজার হোক কলকাতা হলো ইণ্ডিয়ার হৃদ্‌পিণ্ড বলতে গেলে। তিনি জানতেন এই কলকাতাতে টাকা ঢাললে কোনোদিন তা জলে ঢালা হবে না।

আর আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমাব কথা দূরে থাক, করমচাঁদের বাবা ঈশ্বরচাঁদও এটা ভাবতে পারেনি। এমনকি তার বাবা স্বয়ং ফুলচাঁদ আগারওয়ালাও বুঝতে পারেনি।

অথচ বাঙালী হয়েও ইন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা অশোক চৌধুরী এ-কথা বুঝতে পেরেছিলেন।

১১১

এতদিন পরে করমচাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সেই অতোদিনকার আগেকার কথাগুলো আবার মনে পড়তে লাগলো।

সত্যিই সে-সব অনেকদিন আগেকার কথা। কোথায় গেল সেই ইন্দ্রনাথ, কোথায় রইলো এই করমর্চাদ, আর কোথায় রইলাম আমি! আজ আমাদের তিন রকম জীবন তিন পথে চলে গেছে। এখন আর

তিন জনের সঙ্গে তিন জনের আগেকার মতো রোজ দেখা হয় না। এখন আমাদের তিন জনের তিনমুখো জীবন।

অথচ আগে ছুটির দিনেও তিন জনের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারতাম না আমরা। কিছু-না-কিছু সূত্র নিয়ে দেখা হতোই। যদিও একজন থাকতো উত্তর কলকাতায়, একজন পূর্ব কলকাতায় আর আমি দক্ষিণ কলকাতায়। এখন প্রায় তিন জনেই বিচ্ছিন্ন।

এই অবস্থায় হঠাৎ দু'জনের দেখা হলে মনে যে আনন্দ হয় তাই-ই হলো তখন।

করমচাঁদ বললে—তুই তো খুব নাম করেছিস রে?

আমি জিজ্ঞেস করি—কেন? কীসের ব্যাপারে?

—তোর গল্প সিনেমায় দেখলুম।

বললুম—সেটা কি নামের ব্যারোমিটার?

করমচাঁদ বললে—ব্যারোমিটার নয়। আমার নাম তো কেউ জানে না, ইন্দ্রনাথের নামও তো কেউ জানে না।

বললাম—ভীম নাগ কিংবা দ্বারিক ঘোষের নামও তো সবাই জানে। তাহলে তারা তো আমার চেয়েও হাজার গুণে বিখ্যাত।

করমচাঁদ আমার কথায় হেসে উঠলো। বললে—তুই এখনও দেখছি সেইরকম আছিস। আমাকেও দেখছিস তো তুই, আমি কি সেই একরকমই আছি! বল্ তুই?

বললাম—তোদের শেয়ারের ব্যবসা, তোরা খারাপ থাকবি কেন?

করমচাঁদ বললে—না রে, দেশের কী দুরবস্থা, দেখছিস তো! তাতে শেয়ার-মার্কেট কখনও ঠিক থাকে?

—কিন্তু তোর চেহারা তো খুব ভালো দেখাচ্ছে!

করমচাঁদ বললে—ও তো মেক-আপ্ রে। আমার যা ব্যবসা তাতে আমাদের চেহারাটা ভালো রাখতে হয়। এই চেহারার পালিশটা না রাখলে তো ক্লায়েন্টরা ভোলে না।

বললাম—আর তোর এই গাড়ি ?

—ওটাও ভড়ং। আমার কারবারে এই গাড়ি, এই স্যুট, এই মেক-আপ্‌টা রাখতে হয়। নইলে ক্লায়েন্টরা বিশ্বাস করে না। দেখছিস না, মাথার একটা চুলও সাদা নেই। অথচ কে বুঝবে আমি চুলে কলপ লাগিয়েছি ?

তারপর একটু থেমে বললে—সেই ছোটবেলার কথাগুলো একবার ভাব তো ? কী আরামের জায়গা ছিল তখন কলকাতা! রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত বাস চলতো। জিনিসপত্র কতো সস্তা ছিল। যখন-তখন ইচ্ছে হলেই বাড়ি-ভাড়া পাওয়া যেতো। আর এখন ? এখন কলকাতায় এক ইঞ্চি জায়গা কেউ পাবে ? হাজার-হাজার টাকা ফেললেও কেউ মাথা গোঁজবার মতো একটা বাড়ি পাবে ?

বললাম—কেন এমন হলো বল্ তো ?

—কেন হলো তা তুই জানিস না ?

—খুব জানি। কিন্তু তুই বল্ না, কেন এমন হলো ?

করমচাঁদ বললে—হলো, আমরা অমানুষ হয়ে গিয়েছি বলে। আমরা আর মানুষ নেই। আমরা জানোয়ার হয়ে গিয়েছি বলেই এমন হলো। টাকার জন্যে মানুষ নিজের ছেলেকেও আর ভালোবাসে না। টাকার জন্যে ছেলেরাও আর বাপদের ভক্তি করে না। ভক্তি-ভালোবাসার জায়গাটা আজ টাকাই জবর-দখল করে নিয়েছে।

করমচাঁদের মুখ থেকে এমন কথা শুনতে পাবো আশা করিনি।

বললাম—আরে করমচাঁদ, এসব তো আমার কথা। একমাত্র আমিই তো আমার বইতে এইসব কথা লিখি বলে অন্য সকলের যতো রাগ আমার ওপর।

করমচাঁদ বললে—তুই কী লিখিস আমি জানি না, ও-সব পড়বার সময় নেই আমার। মাঝে মাঝে আমার ক্লায়েন্টরা আমাকে সিনেমায় নিয়ে যায় বলেই আমি সিনেমা দেখি। নইলে আমার অতো সময়

কোথায় যে সিনেমা দেখবো! তবে বাড়িতে যেদিন থাকি তখন গিয়ে দেখি নাতি-নাতনী, ছেলে, ছেলের বউরা মিলে টি.ভি দেখছে। টি.ভি-টা খানিকটা বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাদের।

—কেন?

করমচাঁদ বললে—বাঁচায়নি? টি.ভি'র আফিম খেয়ে সবাই নেশায় বুঁদ হয়ে আছে বলেই এখনও ছেলে-বাপ-মা'দের খুন-খারাপিটা কম হচ্ছে, নইলে প্রত্যেক বাড়িতে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে যেত।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কতোকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা। একদিন আয় না আমাদের বাড়িতে। সেই আগেকার দিনগুলোর কথা নিয়ে আবার প্রাণভরে আড্ডা দেব!

করমচাঁদ বললে—আমি না-হয় বিজনেসম্যান, কোনোদিন সময় করে নেব। কিন্তু তুই? তোর কি সময় হবে? তোরা তো লেখক, তোরাও কি ব্যবসাদার নোস্? তোরাও নাকি শুনেছি টাকার জন্যেই লিখিস!

জিজ্ঞেস করলাম—কে বললে তোকে?

—আবে আমি জমি-বাড়ির দালাল হলে কী হবে, আমি সব খবর রাখি।

—জমি-বাড়ির দালাল হয়ে সাহিত্যের খবর রাখিস কী করে?

করমচাঁদ বললে—রাখি, রাখি! আমার যে ব্যবসা তাতে আমাকে সব খবরই রাখতে হয়। সব রকম লোকের সঙ্গেই আমাকে মিশতে হয়। লেখকদের কি আর জমি-বাড়ির দরকার হয় না? তাদের কাছেও যে আমাকে যেতে হয় রে। তাদের কাছেই শুনেছি যে তারা ম্যাগাজিনের পুজো-সংখ্যায় উপন্যাস লিখে নাকি হাজার-হাজার টাকা আয় করে।

জিজ্ঞেস করলাম—আর কী শুনেছিস?

করমচাঁদ বললে—আরে, আমার জানা কয়েকজন লেখক আছে যারা দিনের বেলায় মাসকাবারি মোটা মাইনের চাকরি করে আর বাকি সময়ে বসে বসে গপ্পো লিখে গাদা-গাদা টাকা উপায় করে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তারা কী কাজ করে, জবাবে তারা বলবে তারা লেখক। তারা যে সঙ্গে সঙ্গে মোটা মাইনের একটা চাকরিও করে সেটা তারা কখনও মুখে বলবে না। তোরা লেখকরাও দেখছি আর আগেকার মতো লেখক নেই, তোরা সবাই দেখছি আমাদের মতো বিজনেসম্যান হয়ে গেছিস—

কথাটা থামিয়ে করমচাঁদ আবার বললে—যাই ভাই, আমার আবার একটা জরুরী কাজ আছে, আমি চলি—

বললাম—কোথায় চলেছিস?

—ইন্দ্রনাথের বাড়িতে—

আমি অবাক হয়ে গিয়েছি ইন্দ্রনাথের নাম শুনে।

বললাম—ইন্দ্রনাথ? ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বহুদিন দেখা নেই; কেমন আছে সে?

করমচাঁদ বললে—খুব খারাপ!

আমি খবরটা শুনে চম্‌কে উঠেছি। জিজ্ঞেস করলাম—খারাপ?

—হ্যাঁ, খুবই খারাপ।

বললাম—সে কী! তার অতো টাকা অতো বড়ো বাড়ি ও তো সারা জীবন ধরে অতো টাকা উপায় করেছে, ওর বাবারও তো অনেক টাকা ছিল। তার অবস্থা খারাপ হলো কী করে?

করমচাঁদ বললে—ওই ওর বাবার অতো টাকাই ওর সর্বনাশ করেছে।

—কী রকম?

করমচাঁদ যা বললে তা শুনে আমার হৃদ্‌কম্প হতে লাগলো। ছুনিয়ার সব মানুষই তো টাকা চায়। টাকার জন্যেই তো সবাই

পাগল। যারা টাকা চায় না তাদের লোকে প্রাতঃস্মরণীয় মনে করলেও টাকার লোভ কেউ সম্বরণ করতে পারে না। টাকাই তো এ-যুগে ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম! সেই টাকাই কিনা ইন্দ্রনাথের সর্বনাশ করলে! এ কী রকম করে হয়?

করমচাঁদ বললে—হয়, হয়! ইন্দ্রনাথকে দেখেই বুঝতে পারলুম যে টাকাও মানুষের সর্বনাশ করে, বিশেষ করে যদি বেশি টাকা হয়।

—কী রকম?

করমচাঁদ বললে—তুই তো জানিস ইন্দ্রনাথের বাবা-কাকারা আই-সি-এস ছিল। তিনজনেই প্রচুর টাকার মালিক। সকলেরই আলাদা আলাদা বাড়ি, আলাদা আলাদা সম্পত্তি ছিল।

বললাম—সে তো জানি-ই। ইন্দ্রনাথের বিয়ের সময়েই তো ওর বাড়িতে গিয়ে দেখেছি কী অগাধ বড়োলোক ওরা। তা ছাড়া তার পরেও তো অনেকবার গিয়েছি।

করমচাঁদ বললে—হ্যাঁ, কিন্তু সে-সব আর নেই।

—নেই মানে?

করমচাঁদ বললে—নেই মানে নেই!

যদি কোনোদিন খবরের কাগজ পড়ি যে তাজমহল ঝড়ের ঝাপটায় উপড়ে পড়ে গেছে তাহলে যেমন অবাক হয়ে যাবো, এই করমচাঁদের কথাতেও তেমনি হতবাক্ হয়ে গেলাম।

বললাম—বলছিস কী?

—হ্যাঁ রে, যা বলছি তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। তোর মতো আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি কথাটা। অন্য লোকের মুখ থেকে কথাটা শুনে আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই অনেককাল পরে একদিন গেলুম তার বাড়িতে…

করমচাঁদ আবার বললে—গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড।

—কী দেখলি?

—প্রথমেই গেটের দরোয়ান আমাকে আটকে দিলে। বললে—কাকে চাই?

আমি বললুম—ইন্দ্রনাথবাবুকে। ইন্দ্রনাথবাবু বাড়ি আছেন?

দরোয়ানটা আবার জিজ্ঞেস করলে—কী দরকার আপনার?

আমি তো অবাক হয়ে গেলাম দরোয়ানের কথা শুনে। ভাবলুম ইন্দ্রনাথ কি এতোই বড়োলোক হয়ে গেল যে লোকের সঙ্গে দেখা করার সময়ও তার নেই?

কথাগুলো করমচাঁদের মুখ থেকে শুনে আমিও অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—তাই নাকি? আমিও তো আগে অনেকবার গিয়েছি, তখন তো দরোয়ান কোনো বাধা দেয়নি!

করমচাঁদ বললে—তুই কতোকাল আগে গিয়েছিলি?

বললাম—সে প্রায় তিরিশ বছর আগে হবে—

করমচাঁদ বললে—তিরিশ বছরের মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। কতো কী বদলে গেল তার হিসেব নেই। আসলে এই তিরিশ বছরের মধ্যে গোটা পৃথিবী জুড়ে একটা বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল, কতো দেশের ভাগাভাগি হয়ে গেল, কতোবার এই পৃথিবীর ম্যাপের রং-বদল হলো, তার কি ঠিক আছে?

আরো কতো কথা বলতে যাচ্ছিল করমচাঁদ। আমি কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম—ও-সব কথা থাক, তারপর কী হলো তাই বল্?

করমচাঁদ বললে—তারপর আমাকে আমার নিজের নাম বলতে হলো। আমার নামটা শুনে দরোয়ানটা ভেতরে চলে গেল। তার খানিক পরে ফিরে এসে আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। আর কোথায় নিয়ে গেল জানিস?

—কোথায়?

করমচাঁদ বললে—অতো বড়ো বাগান, অতো বড়ো বাড়ি। সে-দিকে সে গেল না। গেল একেবারে বাড়ির পেছন দিকে—

—পেছন দিকে ? কেন ? সামনের দিকেই তো ওর ঘর ছিল।

করমচাঁদ বললে—না, সামনের দিকে নিয়ে গেল না। আমি বরাবর যে-দিক দিয়ে সামনের ঘরের ভেতরে যেতাম সেই দিকেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু দরোয়ানটা সে-ঘরের ভেতরে যেতে দিলে না—

—কেন ? সেদিকে কী হলো ?

দরোয়ানটা বললে—ওদিকে সাহেব থাকে। ইন্দ্রবাবুর ঘর পেছনের দিকে ব'লে আমাকে আরো পেছনে উত্তরের দিকে নিয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম করমচাঁদের কথা শুনে। আগে আমরা যতোবাব ইন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়েছি ততোবার সামনের দিকের ঘরে গিয়েই বসেছি. সামনের দিকের ঘর দক্ষিণ-মুখো, দক্ষিণ দিকে অনেক জানালা-দরজা। জানালা-দরজা খুলে দিলেই দক্ষিণ দিক থেকে হু-হু করে হাওয়া আসে। এত জোরে হাওয়া আসে যে, ঘরের পাখা-দুটোও খুলতে হয় না। সেই ঘরের জানালা-দরজা দিয়ে বাগানের সবুজের সমারোহ দেখা যায়। সেই সবুজের সমারোহ দেখে শুধু চোখ নয়, মনও জুড়িয়ে যায়। আমরা কতোদিন ওখানে বসে-বসে ইন্দ্রনাথের দেওয়া চা খেয়েছি। তখন ইন্দ্রনাথকে আমরা কতো ঈর্ষা করেছি। ওর সৌভাগ্য দেখে আমাদের শুধু ঈর্ষাই হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও হয়েছে। আর তা ছাড়া ওকে তো কখনও টাকা উপায়ও করতে হবে না। বাবার কাছ থেকে পাওয়া টাকা থেকেই তো জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। ওর ল'-কলেজে পড়াটা তো শখের। শখের জন্যেই তো আইন পড়েছে। টাকার জন্যে তো আইন পড়েনি। পড়েছে শুধু সময় কাটাবার জন্যেই।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

করমচাঁদ বললে—তারপর ভাই যখন ইন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে

পৌঁছোলাম তখন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। প্রথমে আমি তাকে চিনতেই পারিনি। সেই চেহারা যে এখন কী রকম হয়েছে, তা না-দেখলে তুই কল্পনা করতেও পারবি না। কোথায় গেল তার সেই কোঁকড়ানো চুল, কোথায় গেল তার সেই গায়ের ফরসা রং!

—তা তোকে ইন্দ্রনাথ চিনতে পারলো?

—ইন্দ্রনাথ আমাকে চিনতে না পারলেও আমি তাকে চিনতে পারলুম। গায়ের সেই ফরসা রং এখন কালো-কুচকুচে হয়ে গেছে। মাথায় মস্ত বড়ো টাক পড়েছে। চোখে ভালো দেখতে পায় না। তবু আমার গলা শুনে চিনতে পারলে।

ইন্দ্রনাথ বললে—কে? কে আপনি?

করমচাঁদ বললে—আমি রে আমি—করমচাঁদ—

ইন্দ্রনাথ বললে—করমচাঁদ, তুই?

করমচাঁদ বললে—হ্যাঁ, আমি রে—

ইন্দ্রনাথ বললে—তুই হঠাৎ?

করমচাঁদ বললে—অনেকদিন পরে এসেছি। দেখলুম তোদের বাড়ির সামনের গেট-এ দরোয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিলে না। আমার নাম জিজ্ঞেস করলে। আমি নাম বলতে ভেতরে চলে গেল। তারপর খানিক পরে ফিরে এসে আমাকে ভেতরে নিয়ে এলো।

ইন্দ্রনাথ বললে—আমাকে কিছু বলেনি। আমার ছেলের অনুমতি নিয়ে তবে তোকে ভেতরে আসতে দিয়েছে—

—তোর ছেলে? তবে যে বললে 'সাহেব'।

ইন্দ্রনাথ বললে—বাড়ির চাকর-বাকর-দরোয়ান, তারা সবাই আমার ছেলেকে 'সাহেব' বলে। তারা সবাই-ই তো আমার ছেলের কাছে মাইনে পায়। তারা জানে 'সাহেব'ই এ-বাড়ির মালিক। তারা জেনে গেছে যে আমি এ-বাড়ির কেউ-ই নই।

করমচাঁদ বললে—সে কী রে? তোর নিজের ছেলে তোর সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করলে?

ইন্দ্রনাথ বললে—হ্যাঁ রে, সেই সুদীপ। তোরা তো তার অন্নপ্রাশনে এসেছিলি। মনে নেই?

করমচাঁদ বললে—খুব মনে আছে। মনে আছে প্রায় দু'হাজার লোককে তুই নেমন্তন্ন করেছিলি। কী বিরাট ঘটা করেছিলি। কতো রকম খাবারের আইটেম করেছিলি তুই। তা কি ভোলা যায়!

ইন্দ্রনাথ বললে—হ্যাঁ ভাই, সেই সুদীপ-ই এই বাড়ির ঝি-চাকর-দরোয়ানের কাছে আজ সাহেব!

করমচাঁদ জিজ্ঞেস করলে—কেন রে, এরকম হলো কেন?

ইন্দ্রনাথের চোখ-দুটো তখন জলে ভিজে এসেছে। বললে—হ্যাঁ ভাই। সেই সে-কালের সমস্ত আদর্শের ভাঁওতাই আমার 'কাল' হয়েছে।

—কিন্তু কেন 'কাল' হলো?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমার বাবাই ভুল করে গিয়েছিলেন।

করমচাঁদ বললে—কিন্তু তোর বাবা তো সে-কালের বাঘা আই-সি-এস ছিলেন। তাঁর ভয়ে তো সমস্ত লোক কাঁপতো। আবার একদিকে সমস্ত লোক তাঁকে ভালোও বাসতো।

ইন্দ্রনাথ বললে—হ্যাঁ ভাই, সত্যিই তাই। ইংরেজরা সে-যুগে তাঁকে 'রায় সাহেব' উপাধি দিয়েছিল তাঁর কাজ দেখে। শুধু ইংরেজরাই নয়, ইণ্ডিয়ানরাও তাঁকে ভয়-ভক্তি করতো। সাধারণত তিনি অত্যাচারীকে শাস্তি দিতেন, গুণীকেও সম্মান দিতেন। সে-সব কথা তো তোদের বলেছি। কিন্তু সেই আদর্শটাই আসলে আমার সর্বনাশ করেছিল। কারণ সেই আদর্শটা যে এ-যুগে বদলে গিয়েছে এখন—

—তার মানে?

ইন্দ্রনাথ বললে—তার মানে এখন তো অত্যাচারীরাই 'পদ্মশ্রী'

'পদ্মভূষণ' খেতাব পায়, আর গুণী যারা তারা পায় অপমান। তাদের সবাই ঘেন্না করে। এটা যেদিন থেকে শুরু হয়েছে, সেই দিন থেকেই সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।

করমচাঁদ বললে—কিন্তু তুইও তো সেই আদর্শ নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছিস—

ইন্দ্রনাথ বললে—না ভাই, আমি স্বীকার করছি আমি নিজেও সেই একই পাপ করেছি। আমি সারা-জীবন টাকাটাকেই ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম বলে মেনে এসেছি। তাই আজ আমার এই দুর্দশা।

করমচাঁদ ঘরটার চারদিকে চেয়ে দেখলে। ঘরে একটুও আলো ঢোকে না, কারণ জানালার বালাই নেই সে-ঘরে, তারপর দিনের বেলাতেই সে-ঘর অন্ধকার। কারণ উত্তর-মুখো ঘর।

করমচাঁদ দেখলে, কথা বলতে বলতে ইন্দ্রনাথের দুটো চোখ জলে ছলছল করছে।

বললে—তাহলে কেন এমন হলো?

ইন্দ্রনাথ বললে—ওই যে বললুম, আমি বাবার আদর্শ মানিনি। আমার সামনে ছিল এ-যুগের আদর্শ। আমি মনে করেছি টাকাটাই হলো ভগবান। সেই টাকাকেই আমি বরাবর পুজো করে এসেছি! আজকাল সবাই-ই যা করে।

যে-লোক নিজেই নিজের দোষ স্বীকার করে তাকে আর কী বলবে করমচাঁদ? তাকে কী বলে সান্ত্বনা দেবে?

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে—তুই হঠাৎ সেই সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ থেকে এদিকে এলি কেন? কোনো কাজ ছিল, না, আমাকে দেখতে এসেছিস?

করমচাঁদ বললে—না, এদিকে এসেছিলাম, হঠাৎ তোর কথা মনে পড়লো। ভাবলুম অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই দেখে যাই ইন্দ্রনাথ কেমন আছে—

ইন্দ্রনাথ বললে—জানিস, এখনও আমি বসে বসে সে-সব দিনের কথাগুলো ভাবি। তোরা ভাবিস ?

করমচাঁদ বললে—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ভাবি। আসলে আমি ভাববার সময় কোথায় পাবো ? আমাকে তো এই বয়েসেও চারিদিকে টো-টো করে ঘুরতে হয়—

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে—এত টো-টো করে কোথায় ঘুরিস ? কী কাজ তোর এতো ?

করমচাঁদ বললে—কাজ কি একটা রে ! হাজারটা কাজ আমার—

—তা তোর ছেলেরা তো আছে। তারা তোর কাজগুলো দেখতে পারে না ? তোর ক'টা ছেলে ?

করমচাঁদ বললে—আমার তো চার ছেলে। তারা চারজনেই আমার কোম্পানীর ডাইরেক্টার। আর আমি হচ্ছি তাদের মাথায়। মানে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার—

—তা কী এমন কাজ যে, পাঁচজন থাকতেও একেবারে সময় পাস না ?

করমচাঁদ বললে—আমাদের পৈতৃক যে-ব্যবসা, ছিল তাই-ই আছে এখনও। সেই ফার্মটাকেই আমি আরো বড়ো করেছি। বাবার দেখানো রাস্তাতেই আমি এখনও চলেছি। বাবার ফোরসাইট ছিল, তার দেখাদেখি আমারও ফোরসাইট হয়েছে। সেই অতোকাল আগে বাবা বলতো—কলকাত্তা শহর বেড়ে বেড়ে একদিন হাজারগুণ বড়ো হবে। আমি সেই একই কাজ করে চলেছি এখনও। এখন টালিগঞ্জ, গড়িয়া, নাকতলা পর্যন্ত শহর বেড়েছে। এর পরে দক্ষিণে ফল্‌তা পর্যন্ত বাড়বে এই তোকে বলে রাখছি—

করমচাঁদের কথা শুনে ইন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে আরো জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

করমচাঁদ বললে—কী রে, অতো কাঁদছিস কেন ?

ইন্দ্রনাথ বললে—ভাই, তুই এতো জায়গায় ঘর-বাড়ি করেছিস, আমায় একটা ঘর দিতে পারিস না ?

—তোর জন্যে ঘর ?

ইন্দ্রনাথ বললে—হ্যা ভাই, আমার একটা ঘর হলেই চলে যাবে।

—কী বলছিস তুই আমি বুঝতে পারছি না। তোর নিজের জন্যে ঘর চাইছিস তুই ? তোর তো এই বাড়ি রয়েছে ! এও তো তোর নিজের বাড়ি !

ইন্দ্রনাথ মাথা নাড়লো।

বললে—হ্যাঁ ভাই, আমি স্বীকার করছি, এটা আমার নিজেরই বাড়ি। কিন্তু—কথাটা বলতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ আবার নিজের চোখ-দুটো কাপড়ের খুঁটে মুছে নিল।

করমচাঁদ জিজ্ঞেস করলো—কী রে, বলতে গিয়ে থামলি কেন ? বল্ ?

জিজ্ঞেস করলাম—তার পর কী হলো ? তারপর ?

করমচাঁদ বললে—তারপর ঠিক সেই সময়ে একটা চাকর এক থালা ভাত নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে সামনের টুলের ওপর রেখে দিলে। দেখলাম মোটা চালের ভাত আর তরকারি। আর এক হাতে এক গেলাস জল। আমি সেই অবস্থায় আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পাবলুম না। একজন খাবে ওইরকম খাবার, আর আমি দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে দেখবো, তা তো সম্ভব নয়—তাই বললাম—'আমি চলি রে, পরে একদিন আসবো' বলে সেখান থেকে চলে এলাম—

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ? তার পরে আর তার কাছে গিয়েছিলি ?

করমচাঁদ বললে—না ভাই, আর সময় পাইনি—

—সে কী রে ? সময় পাসনি মানে ?

—সময় পাইনি মানে সময় পাইনি—

এ আবার কী কথা করমচাঁদের ! নিজের গাড়ি রয়েছে, নিজে সুস্থ

আছে, চারটে বড়ো বড়ো সাবালক ছেলে রয়েছে, আর বলে কিনা সময় পায়নি!

এ-পৃথিবীতে কেউ কি আজ পর্যন্ত বলেছে যে তার সময় আছে! সময় যার থাকে সে তো বেকার! যার সময় আছে সেও বলে তার সময় নেই, আর যার সময় সত্যিই নেই সেও বলে তার সময় নেই!

আর তা ছাড়া সবাই তো সামনের দিকেই চেয়ে থাকে, পেছনের দিকে চেয়ে দেখবার কথা কেউ তো ভাবে না।

কিন্তু পেছনের দিকে চেয়ে দেখাটাই তো স্বাস্থ্যকর। পেছন মানেই ইতিহাস। ইতিহাস-ই তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক। তা যে জানবে না, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

করমচাঁদ চলে গেল। রাস্তায় চলতে চলতে সে আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়েছিল। আবার কথা শেষ হলে চলে গেল।

বললাম—একদিন আমার বাড়িতে আসিস না—

করমচাঁদ বললে—সময় করে আসবো একদিন।

আমি জানতাম যে তার সময় হবে না। আর সত্যিই তার সময় হয়নি।

কিন্তু আমি আমাদের ছোটবেলাকার বন্ধু ইন্দ্রনাথকে ভুলতে পারিনি। করমচাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সেদিন গেলাম ইন্দ্রনাথের বাড়িতে।

সেই ইন্দ্রনাথ!

আমাদের সঙ্গে যখন ইন্দ্রনাথ পড়তো তখন থেকেই তাদের বাড়িতে অনেকদিন গিয়েছি। শুধু তার বাড়িতে নয়, করমচাঁদের বাড়িতেও গিয়েছি। সকলের ঐশ্চর্যই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতো।

আমি দু'জনদের চেয়েই গরীব ছিলাম। আমার লোভ ছিল না টাকার ওপর। জীবনে কখনও টাকায় বড়োলোক হতে চাইনি। বড়োলোক হতে চেয়েছি মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্যে। ভেবেছি টাকা তো অনেক

লোকেরই হয়েছে, তা তো আবার আস্তে আস্তে অনেকের চলে যেতেও দেখেছি।

সুতরাং যা থাকবে না তার জন্যে অতো লালসা করবো কেন? লালসা করবো সেই জিনিসটার ওপর, যা মৃত্যুর পরও চিরদিন না হোক কিছুদিনের জন্যেও অন্তত থাকে। সেইজন্যেই যেটা আমার মতো সাধারণ লোকের কাছে সবচেয়ে বেশি লোভের বস্তু ছিল, সেটা হলো সাহিত্য। সে-সাহিত্য কেউ পড়ে না, কিন্তু লেখকের নামটা যুগ-যুগ ধরে মনে রাখে।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে মনে হলো তার কাছে বোধহয় না গেলেই ভালো হতো।

ইন্দ্রনাথ আমাকে দেখেই বললে—তুই!

করমচাঁদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার কথা তাকে বললাম। বললাম—আমাকেও তাদের গেটের দরোয়ান প্রথমে ঢুকতে দেয়নি। আমাকে যা কখনও করতে হয়নি তাই-ই করতে হলো। নিজের নাম বলবার পর তোর কাছে গিয়ে অনুমতি নেওয়ার পর তবে আমাকে ঢুকতে দিয়েছে।

ইন্দ্রনাথ বললে—আসলে আমার অনুমতি নেওয়া হয়নি। অনুমতি নেওয়া হয়েছে আমার ছেলে সুদীপের। মানে, এ-বাড়ির চাকর-ঝি-বাবুর্চিরা যাকে 'সাহেব' বলে সেই তার!

বললাম—কেন, তোর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তোর ছেলের অনুমতি নিতে হবে কেন?

ইন্দ্রনাথ এ-কথার উত্তর না দিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদতে লাগলো।

আমার মনে পড়তে লাগলো ইন্দ্রনাথের বিয়ের দিনের কথা। কী অপরূপ সুন্দরী বউ হয়েছিল ইন্দ্রনাথের! শুধু গুণে নয়, রূপেও বন্ধুদের সব বউদের ছাপিয়ে গিয়েছিল।

মনে আছে, পরে আমরা ইন্দ্রনাথকে বলেছিলাম—তুই খুব লাকি রে

ইন্দ্রনাথ। ও-রকম ভাগ্যবতী রূপবতী বউ পেয়েছিস, এরকম ক'জনের ভাগ্যে জোটে। টাকাকড়ি কতো পেলি ?

ইন্দ্রনাথ বলেছিল—এক পয়সাও নেননি বাবা। আমার বাবা যৌতুক নেওয়ার বিরুদ্ধে। তবে জিনিসপত্র আমার শালা অনেক দিয়েছে—

—শালা কেন ? তোর শ্বশুর নেই ?

—না, শ্বশুর অনেকদিন আগে মারা গেছেন। একই দাদা আছেন আমার বউ-এর।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—তাঁরা কোথায় থাকেন ?

ইন্দ্রনাথ বলেছিল—সে অনেক দূর ভাই, সাউথ ইণ্ডিয়াতে, সেকেন্দ্রাবাদে।

পরে এ-সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলাম। এত জায়গা থাকতে সেকেন্দ্রাবাদে কেন কেদার চৌধুরী ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন তারও একটা কারণ আছে। কারণটা হলো, ইন্দ্রনাথের বাবার বন্ধু ছিলেন ইন্দ্রনাথের শ্বশুর মেজর নিখিলেশ সরকার। ছোটবেলা থেকে তাঁদের পরিচয়। একই স্কুলে পড়েছেন দু'জন। একই সঙ্গে ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বেরিয়ে একজন সিভিল সার্ভিসে গেছেন, আর একজন গেছেন মিলিটারিতে। কিন্তু তখনও যোগাযোগ ছিল দু'জনের।

কেদার চৌধুরীর ছেলে হলো। সেই ছেলের নাম রাখা হলো ইন্দ্রনাথ। তাতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন নিখিলেশ সরকার।

আর তার বছর পাঁচেক পরে নিখিলেশের মেয়ে হলো। সেই মেয়ের নাম রাখা হলো বীণা। বীণার রূপ দেখে কেদার চৌধুরী নিখিলেশকে বললেন—তোর এই মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেব। তাতে তুই রাজী ?

নিখিলেশ প্রস্তাব শুনে মহা খুশী। বললে—আরে, তাহলে তো

বুঝবো বীণার কপালটা ভালো। আমার মেয়ে তোর মতোন শ্বশুর পেলে বর্তে যাবে!

এসব ইন্দ্রনাথের একেবারে বাল্যকালের কথা।· বড়ো হওয়ার পর যা ঠিক করা ছিল তাই-ই হলো।

কিন্তু তখন নিখিলেশ সরকার নেই। কিন্তু বাগ্‌দান যখন হয়ে গিয়েছে তখন আর তাতে বাধা কী থাকতে পারে! বিশেষ করে বললো মেয়ের ভাই।

সেই বিয়েতেই আমি আর করমচাঁদ গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। সে-দিনের জাঁক-জমকের কথা শুধু আমাদের নয়, সকলেরই মনে আছে।

তারপর যখন ইন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান হলো, সে তার নাম রাখলে সুদীপ চৌধুরী।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে—কেমন নাম হয়েছে বল্?

বললাম—খুব ভালো।

ইন্দ্রনাথ বললে—বীণা বলেছিল নামটা। যাক্, এখন তোর সায় পেয়ে বীণাকে বলবো। সে খুশী হবে।

মনে আছে ছেলের অন্নপ্রাশনের দিনের ঘটার কথা। কতো খরচ-পত্র যে সে করেছিল তার ইয়ত্তা নেই। তার প্রথম সন্তান ছেলে, এটা সে জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা বলে ভেবেছিল।

ততোদিনে বাবা কেদার চৌধুরী মারা গেছেন। বাবা মারা যাওয়াতে ইন্দ্রনাথের যে-শোক হওয়ার কথা তা সে ভুলে গিয়েছিল সুদীপের মতো ছেলেকে পেয়ে। করমচাঁদও তখন সংসার আর পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে মেতে উঠেছে। আমিও তখন লেখাপড়া শেষ করে সাহিত্য-চর্চা করি।

আর ইন্দ্রনাথ?

ইন্দ্রনাথ তখন ওকালতি পাস করে কী করছে খবর রাখবার সময়

পাইনি।

একদিন বাড়ি যাওয়ার পথে বড়োরাস্তায় বাসের জন্যে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ দেখি একটা গাড়ি এসে সামনে দাঁড়ালো।

গাড়ি থেকে যে নামলো সে ইন্দ্রনাথ।

—কী রে, তুই ? কী খবর ?

ইন্দ্রনাথ বললে—তোকে দেখেই নামলুম। বাড়ি যাচ্ছিস ?

বললাম—হ্যাঁ।

—তাহলে আমার গাড়িতে ওঠ্—আমি তোকে পৌছে দেব।

জিজ্ঞেস করলাম—তুই কোন্‌দিকে যাবি ?

ইন্দ্রনাথ বললে—কোর্টে। মামলা আছে—

সাধারণত কোর্টের নাম শুনলেই আমরা ভয় পাই। কিন্তু দেখলুম ইন্দ্রনাথ একেবারে নির্ভীক।

আমি ততক্ষণে তার গাড়িতে উঠে বসেছি। গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

বললাম—হঠাৎ তোর মামলা হলো কা নিয়ে ?

ইন্দ্রনাথ বললে—আরে আমরা যদি মামলা না করি তাহলে উকিল ব্যারিস্টাররা কী করবে বল্ দিকিনি। তারা তো সব বেকার হয়ে যাবে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদেরও তো চাকরি চলে যাবে রে—

আমি অবাক! তখন আমাদের যৌবনকাল। পৃথিবীতে কাউকেই তখন আমরা পরোয়া করি না। সমস্ত কিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ারই বয়েস আমদের।

বললাম—ও-সব বুঝি না ভাই, মামলায় আমাদের বড়ো ভয়।

ইন্দ্রনাথ বললে—ওই মামলায় ভয় করিস বলেই তোদের কিছুই হয়নি। সেইজন্যেই চিরকাল তোরা লেখা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলি।

এ-কথার আমি কী-ই বা জবাব দেব।

গাড়িটা তখন বাড়ি-মুখো চলেছে।

দেখলাম ইন্দ্রনাথের জামা থেকে সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে।

বললে—নে, খা—

বললাম—না রে, খাবো না। সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি—

—কেন রে, সিগারেট খাওয়াটা ছাড়লি কেন?

বললাম—না ভাই, বড্ড দাম বেড়ে গেছে সিগারেটের।

—আরে, এটা খেলে তো তোর পয়সা খরচ হচ্ছে না। খা—

বললাম—না ভাই, অনেক কষ্টে সিগারেট ছেড়েছি। এখন খেলে আবার নেশা হয়ে যাবে। তখন মুশকিল হয়ে যাবে!

ইন্দ্রনাথ বললে—তা অভ্যেস হলে ক্ষতিটা কী?

বললাম—কাগজে দেখছি লেখা হচ্ছে সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয়।

ইন্দ্রনাথ হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—তোরা দেখছি এখনও খবরের কাগজের ওপর বিশ্বাস রাখিস। আরে, খবরটা যদি সত্যি হতো তাহলে মেয়েদের কেন ক্যান্সার হয়? মেয়েরা তো কখনও সিগারেট খায় না।

বললাম—তা জানি না ভাই, আমার তো তোদের মতো অতো টাকা নেই। সিগারেটের দাম এত বেড়ে গেছে যে আমাদের মতো লোকের পক্ষে ওটা বিলাসিতা। জিনিসপত্রের দাম কী-রকম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখছিস তো?

ইন্দ্রনাথ বললে—তা জিনিসপত্রের দাম বাড়লে আমরা আয়ও বাড়িয়ে দেব। আগে একজন এ্যাডভোকেট ব্রীফ্ পিছু নিত তিরিশ টাকা কি বড়োজোর চাল্লশ টাকা। এখন পাঁচশো দশ টাকার কমে কি কোনো এ্যাডভোকেট কথা বলে?

অকাট্য যুক্তি।

তারপর একটু থেমে ইন্দ্রনাথ আবার বললে—আরে, সাহিত্য করে

বা চাকরি করে কিছু হয় না, এটা তোকে বলে রাখছি। আমার বাবা আই-সি-এস ছিলেন। সেই মাসকাবারি বাঁধা-মাইনের জীবন। তাতে কি আজকাল কারো সংসার চলে? সেইজন্যেই তো আমি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা ধরেছি—

—তুই ওকালতি ছেড়ে দিয়েছিস?

ইন্দ্রনাথ সিগারেটের এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বললে—হ্যাঁ, ওকালতি এখন ছেড়ে দিয়েছি। ওতে কিছুছুই হয় না—

—তাহলে কী করছিস এখন?

ইন্দ্রনাথ বললে– ব্যবসা।

—কীসের ব্যবসা?

—জমি-বাড়ির ব্যবসা।

আমি অবাক। বললাম—করমচাঁদও তো শুনলাম ওই একই ব্যবসা করে। সস্তা দরে পোড়ো জমি কিনে তার ওপর বাড়ি তুলে দিয়ে বেচে দেয়। ওতে নাকি খুব প্রফিট থাকে ওর—

ইন্দ্রনাথ বললে—ওটা ওর পৈতৃক ব্যবসা। ওর বাবার ছিল শেয়ার কেনা-বেচার ব্যবসা। আর ও তার সঙ্গে এখন সস্তায় জমি কিনে বেশি দামে বেচে কিংবা সেখানে বাড়ি তৈরি করে বেশি দামে বেচে। কিন্তু আমার সে-ব্যবসা নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে অন্য কীসের ব্যবসা?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমি পুরনো ভাড়াটে সুদ্ধ বাড়ি কিনে দশগুণ বেশি দামে বেচি—

—সে কী রকম?

কথাটা আমি বুঝতে না পারার জন্যেই জিজ্ঞেস করলাম।

ইন্দ্রনাথ আর একবার ধোঁয়া ছেড়ে বললে—জানিস তো, আজকাল বাড়ি পাওয়া মানে ভগবান পাওয়া। কলকাতার আশি পার্সেন্ট লোক ভাড়াটে আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোক বাড়ির মালিক। তাই বাড়ির

খেল্ নসীব কা

এত ক্রাইসিস্!

জিজ্ঞেস করলাম—তা তুই তা নিয়ে কী করিস?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমি তাই ভাড়াটে ভর্তি বাড়ি জলের দরে কিনি।

—কিনে? কিনে কী করিস?

ইন্দ্রনাথ বললে—কিনে ভাড়াটেদের বিরুদ্ধে মামলা করি।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু মানলা করতে তো দশ-বছর পনেরো-বছর পর্যন্ত লাগে শুনেছি।

—তা লাগুক না। তাতে আমাব কী ক্ষতি?

—তাতে তো টাকাও অনেক নষ্ট হয়।

ইন্দ্রনাথ বললে—তা টাকা নষ্ট না করলে টাকা আসবে কেন? কিছু না দিলে কি কিছু পাওয়া যায়?

—আর ঝঞ্ঝাট ঝামেলা?

ইন্দ্রনাথ হাসতে লাগলো। বললে—আরে বেঁচে থাকতে গেলে ঝামেলা তো ভোগ করতে হবেই। সমুদ্রে ঢেউ থাকবে না, তা কি কখনও হয়, না হয়েছে? জীবন মানেই তো ঝামেলা!

আমি ইন্দ্রনাথের কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—সবাই তো ঝামেলা এড়াতেই চায় পৃথিবীতে!

ইন্দ্রনাথ বললে—যারা ঝামেলা এড়াতে চায় তারা আফিসে বাধা-মাইনের কেরানীগিরির চাকরি করেই খতম হয়ে যায়। কিন্তু তাতে তো কারো টাকা হয় না। করমর্চাদদের দেখিসান? তারা কী রকম বড়োলোক তা তো সবাই জানে!

বললাম—তা সংসারে টাকাটাই কি সব?

—সব নয়?

ইন্দ্রনাথ একটু গম্ভীর হয়ে আমার দিকে চাইলে।

বললাম—না, সব নয়।

ইন্দ্রনাথ বললে— টাকা যদি সব না হয় তো টাকাওয়ালা লোককে সবাই খাতির করে কেন? কতো বড়ো বড়ো কবি রয়েছে পৃথিবীতে, কতো বড়ো বড়ো লেখক রয়েছে, কই তাদের তো কেউ খাতির করে না! অথচ বিড়লা-টাটাকে খাতির করে সবাই। গান্ধীকে খেতে পরতে দিচ্ছে কে, তুই বল্?

আমি চুপ করে গেলাম।

ইন্দ্রনাথ বললে—কী হলো, চুপ করে গেলি কেন তুই? গান্ধীকে খেতে পরতে দিচ্ছে কে, তুই বল্?

আমি আর কী বলবো! ইন্দ্রনাথের কথার কোনো জবাবই খুঁজে পেলাম না আমি।

ইন্দ্রনাথ আবার বললে—তা হোক, একদিন তোর ভুল ভাঙবে। সেদিন বুঝবি আমার কথা সত্যি, না তোর কথা সত্যি!

তারপর একটু থেমে আবার বললে—তুই যতোই তর্ক করিস, আমি তোর কথা কোনোদিন মানবো না।

—তাহলে স্কুলে ছেলেদের পড়ার বইতে স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী পড়ানো হয় কেন? কেন টাটা-বিড়লাদের জীবনী পড়ানো হয় না?

ইন্দ্রনাথ বললে—এটা তো চালাকি! ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে 'ত্যাগ' শেখে, যাতে লোভী না হয়, তাই ওইসব সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনী পড়ানো হয়। আর যারা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বই লেখে তারা যাতে মোটা টাকা উপায় করতে পারে, তাই ও-সব বই লেখে। সবাই যদি বড়োলোক হয়ে যায় তাহলে যে বড়োলোকদের ভাঁড়ারে টাকার টান পড়বে।

ইন্দ্রনাথের অদ্ভুত যুক্তি সব।

বললাম—তোদের তো বিরাট বাড়ি আছে, পূর্বপুরুষের জমিদারির-অনেক টাকা জমা আছে, তোদের আরো কতো টাকার দরকার?

ইন্দ্রনাথ বললে—টাকার দরকারের কি শেষ আছে রে! আজকাল সব কথাতেই তো টাকা লাগে।

—কিন্তু তা কতো? কতো টাকা লাগে তার জন্যে?

ইন্দ্রনাথ বললে—কতো টাকা লাগে তা কি কেউ হিসেব কষে বলতে পারে? ওই যে তোদের নেতা, ও তো ছাগল-দুধ খায়, খদ্দরের নেংটি পরে, আর ট্রেনের থার্ড ক্লাসে চড়ে বেড়ায়। ও-সব তো ভড়কি! জানিস, ওদের জন্যে আমাদের কোটি কোটি টাকা খরচ হয়?

ঌ ঌ ঌ

এ-কথার পর আমার আর কিছু বলবার রইলো না।

কিন্তু ইন্দ্রনাথ থামলো না।

বলতে লাগলো—আর এইটে বোঝেনা বলেই তো আজ বাঙালী-দের এই দুরবস্থা। বাঙালী যে আজ সব ব্যাপারে পেছিয়ে আসছে, এটা কী জন্যে? বল্ না তুই কী জন্যে?

আমি আর কী বলবো!

ওদিকে গাড়িটা তখন আমার বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

বললাম—আমার বাড়ি এসে গিয়েছে। আমি এখানে নামি রে—

গাড়ি থামালো ইন্দ্রনাথ।

আমি নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে।

এর পরে আমি আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দিন-গুলো তখন আরো বড়ো হতে লাগলো, আর সময়গুলোও তখন আরো দ্রুতগতি হয়ে চলতে লাগলো। আমরা সবাই-ই তখন আরো ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যার-যার নিজের-নিজের কাজে।

তখন যুদ্ধ থেমে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে।

দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে বটে, ইংরেজরাও তখন চলে গিয়েছে বটে,

কিন্তু দেশ তখন তিন-চার ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। রক্তের দাগ তখনও সব জায়গা থেকে ভালো করে মোছেনি।

যুদ্ধের মধ্যেই ইন্দ্রনাথের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

সেই যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তার বাল্যকাল থেকে।

বাবা কেদার চৌধুরী তখন চাকরি থেকে রিটায়ার করবো-করবো করছেন। আর শ্বশুর লিখিলেশ সরকার তখন যুদ্ধের মধ্যে মারা গিয়েছেন। তবু বাগ্‌দত্তা বীণার বিয়ে ঠিক জায়গাতে ঠিক পাত্রের সঙ্গেই হয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের তাণ্ডব চললেও বিয়েতে জাঁক-জমকের কিছু কম্‌তি হয়নি।

তখন রাস্তায় রাস্তায় মরা মানুষের ভিড় স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। তারা সব না-খেতে-পাওয়া মানুষ। 'ফ্যান দাও', 'ফ্যান দাও' চিৎকারে মানুষের দয়া-মায়া-বোধশক্তি সবকিছু লোপ পেয়েছে।

তবু সেই দুর্ভিক্ষের হাহাকারের মধ্যেও ইন্দ্রনাথের বিয়েতে ঘটার কিছু কম্‌তি করেননি কেদার চৌধুরী।

আমরা যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম তারা ইন্দ্রনাথের বউ-এর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে।

তারপর একদিন ইন্দ্রনাথের বাবা কেদার চৌধুরী অনেক সম্পত্তি রেখে মারা গিয়েছিলেন। যেহেতু ইন্দ্রনাথ বাবার এক ছেলে তাই সমস্ত সম্পত্তির মালিকানাও একলা ইন্দ্রনাথের ওপরেই বর্তালো।

সে-শ্রাদ্ধের ঘটা তেমন করে করা না হলেও সেটা ইন্দ্রনাথ পুষিয়ে দিলে তার বিবাহ-বার্ষিকীর ঘটা দিয়ে।

সেদিন আমাদের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল তার কাকারা আর খুড়তুতো ভাই-বোনেরা। বিবাট শাখা-প্রশাখা সম্বলিত পরিবার। কিন্তু সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা-সম্পর্ক বজায় রেখে দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। পরস্পরের বিপদে-আপদে তাদের আসা-যাওয়া অক্ষুণ্ণ ছিল।

সেই বিবাহ-বার্ষিকীর সুযোগেই আমাদের আরো ভালো করে

ঘনিষ্ঠ হয়ে ইন্দ্রনাথের বউ-এর সঙ্গে মেশবার সুবিধে হলো।

দেখলাম ইন্দ্রনাথের বউ নিপাট ভালো মানুষ!

সেই আসরে আমাদের সামনেই ইন্দ্রনাথ তার স্ত্রীকে বললে—এ কী, তুমি আজকে এই শাড়িটা পরেছ?

তার স্ত্রী শুধু বললে—কেন, শাড়িটা খারাপ কী?

—আর সেই ডায়মণ্ড নেকলেসটা? যেটা তোমাকে আজকে পরবার জন্যে কিনে দিলুম!

মিসেস চৌধুরী বললেন—অতো দামী হার পরতে আমার লজ্জা করলো—

—লজ্জা? সে আবার কী? আজকে পরবার জন্যেই ওটা তোমাকে কিনে দিলুম! আর সেটাই তুমি পরলে না? লোকে বলবে কী বলো তো?

লজ্জায় মিসেস চৌধুরী মাথা নিচু করে বললেন—অতো দামী হার কিনে দিলে কেন? আমি তো চাইনি।

ইন্দ্রনাথ আমাদের দিকে চেয়ে বললে—শুনলি তো তোরা আমার বউ-এর কথা! বলছে, দামী হার পরতে আমার লজ্জা করছে! আরে, এইসব দিনে পরবার জন্যেই তো অতো দামী শাড়ি, দামী গয়না কিনে দিলুম—

আমরা আর কী বলবো! ইন্দ্রনাথের কথা শুনে চুপ করে রইলাম।

ইন্দ্রনাথ বললে—জানিস, আমি বীণার জন্যে সাড়ে বারো হাজার টাকা দিয়ে একটা হীরের নেকলেস আর সাড়ে চারশো টাকা দিয়ে একটা বেনারসী শাড়ি কিনে দিলাম আজকের উৎসবের দিনে পরবার জন্যে। আর তোরা ত্যাখ্ না কী একটা বাজে ময়লা ষাট টাকা দামের শাড়ি পরে আছে। একে কী বলবো?

আমরাই বা ইন্দ্রনাথের এ-কথার কী জবাব দেব?

নিজের স্ত্রীকে সাড়ে বারো হাজার টাকা দামের নেকলেস আর

সাড়ে চারশো টাকা দামে কেনা বেনারসী শাড়ি পরিয়ে যে-মানুষ স্ত্রীর আর নিজের ইজ্জৎ বাড়াতে চায় তার কথার জবাবে আমরা কী-ই বা বলবো। আর আমাদের কী-ই বা বলবার থাকতে পারে!

আর শুধু কি এই?

আরও আছে!

এর পরে অনেক দিন আর অনেক মাস দেখা হয়নি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। আমরা যে-যার নিজের কাজ আর নিজেদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ব্যস্ততা কার নেই। সমস্যা কার-ই বা নেই?

বিশেষ করে দেশ ভাগাভাগি নিয়ে যে কাণ্ডকারখানা হলো তার মধ্যে কারই বা মাথার ঠিক ছিল তখন! আমরা যে এরই মধ্যে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে পেরেছি সেইটেই তো একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। তখন থেকেই ইণ্ডিয়াতে শুরু হলো ভাইতে ভাইতে বিচ্ছেদ, তখন থেকেই শুরু হলো জয়েণ্ট ফ্যামিলির উচ্ছেদ। তখন থেকেই শুরু হলো টাকার মূল্যের পতন, তখন থেকেই শুরু হলো মানুষের নৈতিক অবমূল্যায়ন। তখন থেকেই শুরু হলো একই বাড়িতে থেকে একই পরিবারের মধ্যে থেকে আলাদা আলাদা হাঁড়িতে আলাদা আলাদা রান্নার আয়োজন। তখন থেকেই শুরু হলো একই ফ্যামিলির সদস্যদের মধ্যে পরস্পরকে অবিশ্বাস করার ঘটনা।

সে এক যুগান্তকারী দুর্ঘটনা!

এ-দেশে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের সময়তেও যা হয়নি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়েও যা ঘটেনি, বর্গীদের হাঙ্গামার সময়েও যা ঘটেনি, তাই-ই ঘটতে লাগলো দেশে। 'হিন্দু-কোড্-বিল' আইন পাস হয়ে গেল, একই পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে গেল অনেকগুলো ভাগে। কোর্টে কোর্টে উচ্ছেদ আর বিচ্ছেদের মামলা পাহাড় হয়ে জমতে লাগলো দিনের পর দিন, মানুষ তখন হন্যে হয়ে উঠলো অন্যকে ছোট করতে, অন্যকে হারিয়ে দিতে, অন্যকে টেক্কা দিতে। আর এই টেক্কা

দিতে চাওয়ার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, ভাই-এর সঙ্গে ভাই-এর, বাপের সঙ্গে ছেলে-মেয়ের সম্পর্কের কংক্রীটে চিড় ধরতে লাগলো।

আর ঠিক সেই সময়ে তার সঙ্গে শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক অরাজকতা।

আগেও পার্টি ছিল।

সে-সব পার্টির প্রধান কাজ ছিল ইংরেজকে দেশ থেকে হটানো। আর যে-পার্টি সেই কাজে বেশি নাম করতো, তদের দলে মেম্বারের সংখ্যা বেশি হতো। জেল-খাটা লোকেদেরই মানুষ বেশি সম্মান, বেশি শ্রদ্ধা করতো।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানুষ তাদেরই সম্মান বেশি করতে আরম্ভ করলো যারা বিলেত থেকে ডিগ্রী আনতে পারতো। তাদেরই বেশি শ্রদ্ধা করতে লাগলো যারা সমাজে বেশি টাকার মালিক বলে পরিচিত হতো।

অর্থাৎ তখন থেকেই মনুষ্যত্বের বাজার-দর কমতে লাগলো আর বাড়তে লাগলো টাকার বাজার-দর। আর তার ফলে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়লো তারা, যারা সৎ, যারা সত্যবাদী, যারা ধর্ম-ভীরু।

আর এর ফলে সাড়ে বারো হাজার টাকা দামের হীরের নেকলেস আর সাড়ে চারশো টাকা দামের বেনারসী শাড়ির ইজ্জৎ বেড়ে গেল। সস্তা দামের খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবির ইজ্জৎ মাটির ওপর পড়ে গিয়ে ধুলোয় লুটোপুটি খেতে লাগলো।

আমরা যারা এই যুগের মানুষ তারা এইসব অদল-বদল চোখের সামনে দেখেও চুপ করে থাকতে বাধ্য হলাম।

এরই মধ্যে এই আবহাওয়ায় একদিন ইন্দ্রনাথ এসে নেমন্তন্ন করে গেল।

কী নেমন্তন্ন ?

ইন্দ্রনাথের প্রথম পুত্রসন্তানের অন্নপ্রাশন।

দেখি ইন্দ্রনাথ ছেলের নাম রেখেছে—সুদীপ !

জিজ্ঞেস করলে—নামটা ভালো রাখিনি ?

স্বীকার করতেই হলো—খুব ভালো নাম রেখেছিস ! কে রাখলো নামটা ?

—বীণা।

এবারও স্বীকার করতে হলো যে নামটা অপূর্ব !

ইন্দ্রনাথও বললে—হ্যাঁ ভাই, যাকে নামটা বলেছি সে-ই এ্যাপ্রিসিয়েট করেছে। বীণা তো বি-এ পাস। তার খুব সাধ ছিল ছেলে হবে আমাদের, আর ছেলে হলে তার নাম রাখা হবে সুদীপ। শেষকালে তার ইচ্ছেটাই পূর্ণ হলো। ছেলেটা ভাই সত্যিই খুব লাকি—

—কেন ? কিসে বুঝলি লাকি ?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমার চারটে মামলা চলছিল, সেই চারটে মামলাতেই আমি জিতেছি। মামলাগুলোতে আমার খরচ হয়েছে সব মিলিয়ে তিন লাখের মতোন, আর প্রফিট হবে কম করে সাত লাখ টাকা। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে আমার নেট প্রফিট চার লাখ টাকা—

কথাগুলো বলে ইন্দ্রনাথের মুখে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো।

বললাম—আর তোর হয়রানি ? তোর হয়রানির দাম ?

ইন্দ্রনাথ হাসতে হাসতেই বললে—হয়রানি ? কীসের হয়রানি ?

বললাম—এই যে রোজ কোর্টে গিয়ে উকিল-মুহুরি আর পেশকারদেব সঙ্গে মিশে তদবির তদারক করা, এতে হয়রানি নেই ? এতেও তো অনেক এনার্জি চলে যায়, এতেও তো অনেক খরচ হয় !

ইন্দ্রনাথ বললে—সেটা তো ইন্‌ভেস্ট্‌মেণ্ট ! ইন্‌ভেস্ট্ না করলে প্রফিট কি হয় ?

বুঝলাম এই মামলা-মকর্দমা করাটাই হলো ইন্দ্রনাথের প্রফেসন। মানে ব্যবসা।

ইন্দ্রনাথও তাই বললে। বললে—যে-কোনো ব্যবসার মতো এটাও ব্যবসা। অন্য কোনো ব্যবসাতে কি এত লাভ, এত প্রফিট হতো? অথচ আমার এই ব্যবসাতে কোনো স্টাফ দরকার হয় না। ফ্যাক্টরি বা অন্য কোনো রকম ব্যবসার মতো এ-ব্যবসাতে স্টাইক বা লক্-আউট করবার দরকার হয় না। সে-সব রিস্ক এ-ব্যবসাতে নেই।

ইন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনে যতোবার আমার দেখা হয়েছে ততোবার সে তার নিজের কথাই সাত-কাহন করে বলেছে। নিজের কথা বলতে তার কখনও কোনো কামাই হয়নি!

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু তোর নিজেরই বাড়ি রয়েছে। তাহলে তোব মামলায় এত জিতিস কী করে?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমার বাবা কেদার চৌধুরী তো নামজাদা আই-সি-এস ছিল, সব জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা তো তা জানে সে-কথা। তাই বাড়ির মামলা উঠলেই আমি জিতি। আর তা ছাড়া আমিও তো ল' পাস। আইনের ফাঁক-ফোকর তো সবই আমার জানা। আর যেখানে দেখি কেস আমার বিরুদ্ধে সেখানে আমি নগদ টাকা ছাড়ি—

—তার মানে?

—তার মানে আমি টেনেণ্টকে টাকা ছাড়ি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম ইন্দ্রনাথের কথা শুনে।

জিজ্ঞেস করলাম—টাকা ছাড়িস মানে? কতো টাকা ছাড়তে হয়?

ইন্দ্রনাথ বললে—তা দরকার হলে পঞ্চাশ হাজার, ষাট হাজারও ছাড়তে হয়।

আমি তবু বুঝতে পারলাম না।

উকিলি বুদ্ধি সবাই বুঝতেও পারে না।

ইন্দ্রনাথ শেষকালে নিজেই বুঝিয়ে দিলে সবিস্তারে।

বললে—ধর, একটা পুরনো বাড়ি, ভাড়াটেতে ভর্তি। কেউ দেয় পঁচিশ টাকা ভাড়া, কেউ দেয় পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া, আবার কেউ হয়তো পনেরো টাকা। এই বাড়িগুলোই হলো শহরের ক্যান্সার স্পট্। বাড়ির যে মালিক সে ওই সামান্য টাকা পেয়েই পেট চালায়। মামলা করে ও-সব বাড়ির ভাড়াটেদের ওঠানো যায় না। ক্যালকাটা করপোরেশনও ও-সব বাড়ি থেকে বেশি ট্যাক্স আদায় করতে পারে না। দালালের কাছে খবর পেয়ে আমি ওই বাড়ির মালিকের কাছে গিয়ে তাকে অনেক টাকার লোভ দেখাই।

—তারপর ?

তারপর পঁচিশ কি তিরিশ হাজার টাকায় বাড়িটা কিনে ফেলি। বাড়ির মালিকও ওই টাকা পেয়ে বেজায় খুশী হয়ে যায়। সে লুফে নেয় নগদ টাকাগুলো।

—তার পর ? তারপর কী করিস ?

ইন্দ্রনাথ বললে—তারপর শুরু হয় আমার খেল্। আমি ভাড়াটে-দের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করি। কোর্টে কেস আরম্ভ হয় ধীরে ধীরে। যাতে তাড়াতাড়ি শুনানীর দিন পড়ে সেইজন্যে পেশকারকে দু'তিন হাজার ঘুষ দিই।

—তারপর ?

—তারপর তুই জানিস তো যে কোর্ট মানেই ঘুষের আড়ত। প্রতি পদে পদে ঘুষ ছড়িয়ে আঠারো বছরের মামলাকে আট মাসে টেনে আনি।

—তারপর ?

—তারপর আর কী। তুই তো জানিস ঘুষ দিলে সব-সিদ্ধি ত্রয়োদশী। সেই কোর্টের রায় যাতে শীগ্‌গির-শীগ্‌গির বেরোয় তার জন্যে তদবির-তদাবক করে উকিল-মুহুরি সকলকে টাকা খাইয়ে তাড়াতাড়ি জজের রায় বার করে আনি—

বললাম—তা ভাড়াটেরা হাইকোর্টে মামলা করে না ?

ইন্দ্রনাথ বললে—করে। আবার কেউ বা করেও না। তাদের মধ্যে তো বেশির ভাগ মানুষই গরীব মানুষ। আর তার জন্যে কারই বা অতো সময় আছে !

—কেউ কেউ তো হাইকোর্টেও যায়।

—যায়। কিন্তু হাইকোর্টেও তো আমার লোক আছে। ওপর থেকে নিচু পর্যন্ত সবাই আমার চেনা। তাই লোয়ার কোর্টে যা করে কাজ ফতে করি, হাইকোর্টে সেই একই কায়দায় কাজ ফতে করি।

একটু থেমে ইন্দ্রনাথ আবার বলতে লাগলো—আর তখন শুরু হয় পুলিশের কাজ। তুই নিশ্চয়ই পুলিশদের চিনিস। পুলিশকে হাত করতে আর কী-ই বা কষ্ট। সমস্ত জায়গায় যা করি, সেখানেও সেই একই কায়দায় কাজ ফতে করি।

—কী রকম ?

—টাকা। আবার কী ? পৃথিবীতে টাকায় তো সবাই-ই জব্দ। তুই লেখক হয়ে এটা জানিস না ?

বললাম—তার পর ?

—তারপর কোর্টের অর্ডার পেয়ে যখন বাড়ির পজেসন্ নিতে যাই তখনও টাকা ছড়াই আর আমার কার্য সিদ্ধি হয়ে যায়।

কথাগুলো বলবার সময় ইন্দ্রনাথের মুখে কেমন যেন একটা গর্বের উল্লাস ফুটে উঠতো। আমি আর তখন কোনো উচ্চ-বাচ্য করতাম না।

৪৪৪

করমর্চাঁদের কথাগুলো শোনবার পর আমার সেইসব আগেকার কথা মনে পড়তে লাগলো।

মনে পড়তে লাগলো সেইসব দিনের কথা যখন মাঝে মাঝে যেতাম ইন্দ্রনাথের বাড়িতে আর ইন্দ্রনাথ তার ছেলে সুদীপের

প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতো।

বলতো—জানিস, সুদীপ বড় হলে খুব শাইন করবে।

জিজ্ঞেস করতাম—কী রকম ?

—আরে, এখন এই ছোটবেলা থেকে এমন ইনটেলিজেণ্ট হয়েছে যে আমি দেখে চমকে উঠি। সেদিন ওদের স্কুলে গিয়েছিলাম। স্কুলের হেড-মাস্টার বললেন—মিষ্টার চৌধুরী, আপনার ছেলে খুব ব্রিলিয়াণ্ট, আমাদের স্কুলের নাম রাখবে ও। ওর দিকে একটু নজর রাখবেন। ও আমাদের স্কুলের একটা প্রাইড্—

—তারপর ?

—তারপর আর কী ? আমার তো একটাই ছেলে। ও যদি বড়ো হয় তাতে আমার আনন্দ হবে না ?

বলতাম—তা তো বটেই—

—আর জানিস, শুধু লেখাপড়াতেই নয়, টেনিসেও ও ফার্স্ট হয়েছে। ওদের ইণ্টার-স্কুল টেনিস-টুর্নামেণ্টেও ও রেকর্ড করেছে।

তারপর পাশের ঘর থেকে ইন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালো ছেলেকে।

ছেলে বাপের ডাকে আমার সামনে এলো।

ইন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে।

বললে—এই দেখ সুদীপ তোমার আংকেল। একে উইশ্ করো—

সুদীপ আমাকে দেখে বললে—গুড্ মর্নিং আংকেল—

ইন্দ্রনাথ আবার বললে—এবার হ্যাণ্ডশেক করো—

সুদীপ আমার দিকে ডান-হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

আমিও অগত্যা আমার হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করলাম।

তারপর সুদীপও আমার হাত ধরে বললে—হাউ-ডু-ইউ-ডু—

তারপর ইন্দ্রনাথ ছেলেকে বললে—তোমার সেই ইংলিশ কবিতাটা শুনিয়ে দাও তো আংকেলকে—

সুদীপও একটা ইংরিজী কবিতা গড়-গড় করে আবৃত্তি করে গেল। আমি আর ইন্দ্রনাথ দু'জনেই সেই আবৃত্তিটা মন দিয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলাম।

ইন্দ্রনাথ শেষকালে আমাকে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী-রকম লাগলো?

আমাকে বলতেই হলো—ওয়াণ্ডারফুল!

ইন্দ্রনাথ বললে—ঠিক বলেছিস তুই। প্রথম-প্রথম আমিও ওর আবৃত্তি শুনে অবাক হয়ে যেতাম। এইজন্যেই তো ওকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বিদ্যাসাগর স্কুলে ভর্তি করিয়ে আর ওর সর্বনাশ করবো না। নিজেদের যা ক্ষতি হয়েছে তা হয়েছে, ছেলের যেন আর সে-ক্ষতি না হয়—

এ-কথার জবাবে যা বলতে হয় তাই-ই বললাম। বললাম—খুব ভালো করেছিস তুই। বিদ্যাসাগব স্কুলে পড়েই আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।

সুদীপ ততক্ষণে বাড়ির ভেতবে চলে গিয়েছে।

তারপর শুরু হতো ছেলের আরো গুণপনার বিবরণ।

ইন্দ্রনাথ বলতো—জানিস, আমার বাবা আই-সি-এস হলে কী হবে, দিশী স্কুলে পড়িয়ে আমার সর্বনাশ করিযে দিয়ে গেছে। আমি যদি ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হতাম তো আজকে আমার এই দশা হতো?

আমি বলতাম—কেন, তোর দশা খারাপ কীসে হলো? তুই তো অনেক টাকা কামাচ্ছিস!

—আরে দূর, কোর্টে কোর্টে মামলা-মকর্দমা করে টাকা উপায় করাটা কি খুব ভালো কাজ হলো? এ তো ওই করমচাঁদদের কাজ! এতে তো ইজ্জৎ নেই। করমচাঁদদের কি ইজ্জৎ আছে? ওদেরও তো অনেক টাকা!

ইন্দ্রনাথকে তখন আমার সান্ত্বনা দেওয়ার পালা।

বলতাম—না, শুকনো' ইজ্জৎ নিয়ে কী হবে? এ-যুগে টাকা হওয়াটাই তো ইজ্জৎ হওয়া রে! আই-সি-এস'দের আর ক'টা টাকা হয়? বাঁধা মাইনেতে কি আজকাল কারো পেট ভরে? দেখছিস না মারোয়াড়ি-গুজরাটিরা একটা বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠির পেছনে কতো টাকা খরচ করে? তাদের সেইসব এক-একটা চিঠির দামই পড়ে পঞ্চাশ-ষাট টাকা করে। যার নেমন্তন্নের চিঠি যতো দামী, সমাজে তারই ততো খাতির!

ইন্দ্রনাথ বলতো—সেই ইজ্জতের জন্যেই তো আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে টাকা কামাবার জন্যে আমার এই কারবার ধরেছি।

—অতো টাকা কী করিস তুই?

ইন্দ্রনাথ বলতো—কি আর করবো। সব সুদীপের জন্যে জমাই।

—তাহলে তো অনেক ইনকাম-ট্যাক্স দিতে হয়!

ইন্দ্রনাথ বলতো—আমি অতো বোকা নই রে! তুই তো জানিস আমি ল' পাস করেছি। ইনকাম-ট্যাক্সের আইন-কানুনও জেনে গিয়েছি। আমাকে ঠকানো অতো সোজা নয়—

এ-সম্বন্ধে আমার অনেক কথাই বলার ছিল, কিন্তু চেপে গেলাম। কারণ বন্ধুদের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ।

—তোর কি সে-ব্যাপারে কোনো এক্সপার্ট আছে?

ইন্দ্রনাথ চৌধুরী বললে—না ভাই, আমার ফিনান্সিয়াল ব্যাপার আমার নিজের সিক্রেট, আমি তা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করবো কেন? আমি নিজেই আমার ফিনান্সিয়াল এক্সপার্ট। আমি নিজেই ইনকাম-ট্যাক্স অফিসে নিজের কেস দেখি, প্লীড্ করি।

এ-সম্বন্ধে আমার আর কী-ই বা বলবার থাকতে পারে। তাই আমি আর আমার কথা বাড়ালাম না।

ইন্দ্রনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আর তুই? তোর ট্যাক্স-কন্‌সালটেণ্ট্ আছে?

আমি বললাম—আমি তো ট্যাক্স দিই না—

—কেন?

আমি বললাম—আমার আর ইনকাম কোথায় যে, ট্যাক্স দেব? লিখে কি টাকা হয়?

ইন্দ্রনাথ বললে—তা যে-কাজে ইনকাম হয় না সে-কাজ কেন করিস? লেখক না হয়ে তুই তো পাবলিশার হলেই পারতিস! তাতে তোর অনেক টাকা হতো। পাবলিশিং বিজনেস-এ একটা সুবিধে, ওতে সেল্‌স্-ট্যাক্স নেই। তুই তাতে অনেক টাকা লুকোতে পারতিস—

বললাম—আমি তো ব্যবসা করছি না, আমি সাহিত্যিক হতে চেষ্টা করে যাচ্ছি—

ইন্দ্রনাথ আমার দিকে খুব তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালো। সত্যিই তার চোখে আমি সংসারের একটা নগণ্য কীট যেন। মনে হলো সে যেন আমাকে করুণা করতে লাগলো।

তা হোক। ·আমার তাতে দুঃখ নেই, লজ্জা নেই। টাক না-থাকা লোকদের যারা করুণা করে আমিই বরং তাদের করুণা করি।

ইন্দ্রনাথ বললে—তোকে বন্ধু বলেই বলছি, একটু টাকার কথাটাও ভাবিস। টাকাটাই সংসারে আসল জিনিস। এখন তুই বুঝছিস না, কিন্তু বুড়ো হলে বুঝবি। বুঝবি যে টাকা থাকলে বেঁচে সুখ, টাকা হলো বুকের বল।

আমি বললাম—তুই যে এত লাখ-লাখ টাকা উপায় করিস তাতে কোনো ট্যাক্স না দিয়ে পার পাস কী করে?

ইন্দ্রনাথ বললে—পার পাওয়ার অনেক রাস্তা আছে। আমি টাকা কখনও চেকে নিই না, নিই সব ক্যাশে।

—সব ক্যাশে ?

—হ্যাঁ, সবই আমার ক্যাশ টাকার কারবার। এই যে ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার কলকাতায়, কাউকে কি চেক নিতে দেখেছিস ? দেখবি না। কেন ? কেন এরকম হয় ? ইনকাম-ট্যাক্স দিতে হয়না বলে।

—কিন্তু সেটাও তো ইমকাম ! ক্যাশ টাকার জন্যেও তো রসিদ দিতে হয়।

ইন্দ্রনাথ বললে—সই তো আমাকেও দিতে হয়। কিন্তু যে-টাকা নিই সে-টাকাটায় সই করি না। সই করি কম টাকার ওপরে। এটা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। আমি যাদের টাকা দিই তারাও কম টাকার ওপর শোধ করে। তারা আমাকে যে-টাকা দেয় সেটাও আমি কম করে দেখাই।

কী-সব অদ্ভুত ব্যাপার ! আমি এসব আগে জানতুম না। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে এসব কথা না হলে আমি এ-সম্বন্ধে কিছু জানতেও পারতুম না।

ইন্দ্রনাথ বললে—তুই জানিস না বোধ হয় যে যারা টাকাওয়ালা লোক তারা প্রায়ই রেসের মাঠে যায়।

আমি আরো অবাক।

জিজ্ঞেস করলাম—তাই নাকি ? আমার তো ধারণা ছিল যারা গরীব লোক তারাই শুধু রেস খেলতে যায়।

ইন্দ্রনাথ বললে—না রে, তা নয়। যতো বড়ো বড়ো সিনেমার লোক, ফিল্ম-স্টার, শেয়ার-মার্কেটের দালাল, তারা সবাই রেস খেলতে যায়।

—তাই নাকি ? তাদের অতো টাকার লোভ কেন ?

ইন্দ্রনাথ বললে—যাদের বেশি টাকা তাদেরই তো টাকার ওপর বেশি লোভ—তা তুই জানিস না ?

জিজ্ঞেস করলাম—কেন ?

—আরে, পৃথিবীর তো সেইটেই নিয়ম। তোদের কবিই তো লিখে গেছে—'এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভূরি ভূরি। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।' এটা পড়িসনি ?

আমি বললাম—সেটা তো জানি, কিন্তু ফিল্ম-স্টাররা রেস খেলতে যায় কেন, তা বুঝতে পারলাম না।

ইন্দ্রনাথ বলে উঠলো—আরে তা জানিস না ? কালো টাকাকে সাদা করবার জন্যে।

—তার মানে ?

ইন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলে।

বললে—তাদের বাড়িতে অনেক কালো টাকা আছে, কিন্তু সেগুলো কোথা থেকে এসেছে তা কাউকে জানাবার উপায় নেই। তাই রেসের মাঠে গিয়ে যদি কেউ একলাখ টাকা জেতে তো তারা তার কাছে গিয়ে তার টিকিটটা দেড়লাখ টাকা দিয়ে কিনে নেয়। যে-লোকটা রেসে জিতলো সে তার টিকিটের বদলে একলাখ টাকার জায়গায় দেড়লাখ টাকা পেয়ে গেল। আর ওদিকে ফিল্ম-স্টারের সেই একলাখ টাকা সাদা হয়ে গেল। বুঝলি ? বুঝলি কিছু ?

বললাম—না—

ইন্দ্রনাথ বললে—তাহলে তুই কিসের সাহিত্যিক ? তোর দ্বারা কিছ্ছু হবে না—সাহিত্যিককে শুধু তো সাহিত্য জানলেই হয় না, তাকে আবার সঙ্গে সঙ্গে ফিলজফি, সায়েন্সও জানতে হয়। তার সঙ্গে হিস্ট্রিও জানার দরকার হয়। জানা দরকার হয় শেয়ার-মার্কেট, ইনকাম-ট্যাক্স-এর আইন-কানুন, সব-কিছু। তাকে হতে হয় 'টোট্যাল্-ম্যান্'।

তারপর বললে—এই ছাখ্ না, সুদীপকে আমি কী ভাবে মানুষ করছি। তাকে সংসারের সব-কিছু জানিয়ে 'টোট্যাল্-ম্যান্' করে দেব। আমার যা-কিছু টাকা আছে সব-কিছু খরচ করবো তার শিক্ষার

জন্যে। একজন মানুষকে যে-ভাবে বড়ো হলে প্রকৃত মানুষ করা যায় তাই-ই করবো সুদীপের জন্যে। তোরা দেখবি একদিন সুদীপ বড়ো হয়ে কী হয়!

আমাদের বিশ্বাস ছিল ইন্দ্রনাথের কথার ওপর। আমরা জানতুম ইন্দ্রনাথ প্রকৃত অর্থে কাজের মানুষ। সে তখনও পর্যন্ত যা বলে এসেছে তা করে তার প্রমাণ দিয়েছে। শুধু মুখের কথা দিয়ে নয়, কাজ দিয়েও সে প্রমাণ দিয়েছে।

সুতরাং সে যে ছেলে সুদীপকে তার মনের মতোন করে তৈরি করে তুলবে সে-বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

১১১

সেদিন সে-প্রসঙ্গ এই পর্যন্ত।

জীবন সম্বন্ধে মানুষের যতো রকম ব্যাখ্যা মানুষ করেছে তা আজ পর্যন্ত কোনোটাই শেষ কথা হয়ে ওঠেনি। বোধহয় তা কোন্যেদিন শেষ কথা হয়ে উঠবেও না।

একজন বিদেশী কবি বলে গিয়েছেন একটা চমৎকার কথা। তিনি বলে গিয়েছেন—

'I slept and dreamed that
Life was beauty
I woke and found that
Life was duty.'

তাৎপর্যটা হচ্ছে—আমি ঘুমিয়ে পড়লাম আর স্বপ্ন দেখলাম যে জীবন হচ্ছে সুন্দর। কিন্তু যেই ঘুম থেকে জেগে উঠেছি সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম যে জীবন মানে সৌন্দর্য নয়, জীবন হচ্ছে কর্তব্য-কর্ম।

সকলেরই জানা আছে এসব কথা। এসব কথা বই থেকেই পড়া। কেউ পড়ে বা দেখে শেখে, আবার কেউ বা ভুগে শেখে।

কিন্তু তবু সত্যিই কি কেউ কিছু শেখে ?

আমার তো সন্দেহ হয়। জীবনের সমস্তটা দেখেও কিংবা পড়েও অনেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে গিয়ে শেখে।

কিন্তু তখন মনে হয় বড়ো দেরি হয়ে গেছে। তখন শিখেও কিছু লাভ হয়না তার। তখন মনে হয় শুরু থেকে জীবন সম্বন্ধে যদি এটা জানতে পারতাম তাহলে অন্যভাবে জীবন আরম্ভ কবতাম।

আসলে পৃথিবীর দু'চারজন ছাড়া জীবনেব শেষ মুহূর্তে পৌছিয়ে সব মানুষই ভাবে—যদি এটা আগে জানা থাকতো !

তখন তারা হা-হুতাশ করে, তখন পৃথিবীটা ছেড়ে যেতে তাদেব মায়া হয়। তখন মনে হয়—আগে জানা থাকলে এমন ভুলটা করতাম না !

কিন্তু মানুষের যৌবন ?

মানুষের যৌবন বলে—আমি সব জেনে গিয়েছি, আমাব জানা বা আমার শেখা বা দেখার কিছু বাকি নেই।

তাই অস্কার ওয়াইলড্ লিখে গিয়েছেন :

"One's real life is so often the life that one does not live."

আমারা বেশির ভাগ লোকই বাইরে একবকম, আর ভেতবে আর একরকম। যা মুখে বলি তা কাজে করি না। এই বাইরের জীবনের সঙ্গে আমাদের ভেতরের জীবনের আকাশ-পাতাল ফাবাক বলে আমবা শেষকালে এত কষ্ট পাই।

অথচ জীবনে অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। দেখলাম—কেউ চাকরি করেও স্বাধীন রয়েছে, আবার কেউ বা স্বাধীন থেকেও দাসত্ব করছে। কেউ বা দিনের বেলায় চাকর, রাতের বেলায় স্বাধীন। আমাদের টলস্টয় জীবনের চল্লিশ বছব বয়েস পর্যন্ত পরাধীন ছিলেন, তারপর থেকে আশি বছর পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বেঁচেছিলেন।

একদিন কলেজ স্ট্রীট থেকে ফেরার সময় দেখি ইন্দ্রনাথ একটা বাড়ি থেকে একলা বেরিয়ে আসছে।

আমি এগিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রে, এখানে কী করতে ?

ইন্দ্রনাথ আমাকে দেখেই দুই হাতে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুললো।

বললে—এসেছিলাম এই জ্যোতিষীর কাছে।

—জ্যোতিষী ? তুই আবার জ্যোতিষ বিশ্বাস করিস নাকি ?

গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

বললে—আমার বউ মারা গেছে ভাই !

—কে ? কে মারা গেছে ? কার কথা বলছিস তুই ? মিসেস চৌধুরী ?

—হ্যাঁ। বলতে বলতে ইন্দ্রনাথের দুটো চোখ যেন একটু ছল্‌ছল্‌ করে উঠলো।

বললাম—কী হয়েছিল ?

ইন্দ্রনাথ বলতে লাগলো—কী আবার হবে। বলতে গেলে তার কিছুই হয়নি! সামান্য একটু-আধটু জ্বর-টর তো সকলেরই হয়ে থাকে। প্রথমদিকে তাই আমি সে-দিকে গা'ও করিনি। বীণাও করেনি। একটা পার্টি ছিল ডিনারের, সেইখানে খেয়ে আসার পরই অনেকবার বমি হলো। বীণা বললে—ও কিছু না, বোধহয় বদ্-হজম হয়েছে। বমি হয়ে গেল, ভালোই হয়েছে। কিন্তু তারপর আমি নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। তখনও কিছু শুনিনি। তারপর সকালবেলাই আমার যথারীতি এ্যাডভোকেটের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। হাইকোর্টের মামলা। খুব জরুরী ছিল। এ্যাপীল কেস্! এ-রকম কাজ আমার প্রায় রোজই থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেছি লোয়ার কোর্টে—

—কেন ? লোয়ার কোর্টে কেন ?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমার তো রোজই কোথাও-না-কোথাও একটা কেস থাকেই—

—কেন ? ক'টা কেস তোর ?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমার তো এখন হাইকোর্ট আর লোয়ার কোর্ট মিলিয়ে সাতটা কেস চলছে একসঙ্গে। রোজই তো কেস থাকে। তাই আর বাড়িতে আসার সময় পাইনি। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে এসে দেখি বীণার অসুখ খুব সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ফোন করলাম। ডাক্তার এসে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। সেখানেও তারা কিছু করতে না পারায় নার্সিং-হোমে ট্র্যান্সফার করলাম।

—তারপর ?

তারপর সেই নার্সিং-হোমে সাত দিন ধরে বাঁচা-মরার লড়াই চলবার পর শেষকালে বীণা আমাদের ছেড়ে চলে গেল !

—এ কতোদিন আগেকার ঘটনা ?

—তা প্রায় আজ সাত মাস হয়ে গেল।

বললাম—এই জ্যোতিষীর কাছে কার জন্যে এসেছিলি ? তোর নিজের জন্যে ?

ইন্দ্রনাথ বললে—না না, আমার নিজের জন্যে কেন হবে ? আমি নিজে তো সাক্সেস্ফুল। মানুষ সংসারে জন্মে যা-যা কিছু চায়, তা সবই আমি পেয়েছি। আমার নিজের কখনও টাকার অভাব হবে না, এত টাকা আমার আছে। কিন্তু আমি জানতে এসেছিলুম আমার সুদীপের ভাগ্য !

বললাম—কেন ? সুদীপও তো তোর খুব ব্রিলিয়ান্ট্ ছেলে, তুই আমাকে বলেছিলি।

—হ্যাঁ, ব্রিলিয়ান্ট্ তো বটেই। কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ তো তবু

জানতে ইচ্ছে হয়। জানতে এসেছিলুম ওর ভাগ্যটা বা ভবিষ্যৎটা কেমন?

বললাম—তাহলে তোর মতো লোকেরও ভাগ্যের ওপর দুর্বলতা আছে? ও-সব দুর্বলতা তো আমাদের থাকবে, তোর কেন থাকবে?

ইন্দ্রনাথ বললে—কেন? আমি কি একটা মহাপুরুষ নাকি? তোরা কী ভাবিস আমাকে? আমার দুর্বলতা থাকবেনা তা বলে? মামলা বরাবর করি বটে, কিন্তু প্রত্যেকটা মামলাতেই কি আমার জিৎ হয়েছে? হার হয়নি আমার?

—তোরও হার হয়েছে?

—সে কী রে? মামলায় হার-জিৎ হবে না? তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, বেশি রভাগ মামলাতেই জিতেছি। কিন্তু কিছু কিছু মামলাতে তো হেরেওছি!

যাক, এতদিন পরে ইন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে যে সত্যিকথাটা শুনতে পেলাম এটাও তো যথেষ্ট! যে ইন্দ্রনাথকে বরাবর আশাবাদী ভাবতাম সে-ও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলে যে তারও ভবিষ্যৎ জানতে ইচ্ছে হয় —তা সে নিজেরই হোক আর তার ছেলেরই হোক!

অবশ্য আমরা তার ছেলেকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি। তার চেহারা দেখেই বোঝা যেতো সে বুদ্ধিমান। শুধু বুদ্ধিমান বললে কম বলা হবে, গড়পড়তা ছেলেদের চেয়েও সে বেশি বুদ্ধিমান তা তার হাব-ভাব, চাল-চলন, ব্যবহার, সব-কিছু দেখেই বোঝা যেতো। তাদের বাড়িতে গেলেই সেই ছোটবেলা থেকে দৌড়ে আমাদের কাছে আসতো। 'আংকেল' 'আংকেল' বলে অভ্যর্থনা করতো। তখন সে তার যতো কিছু খেলনা আছে তা আমাদের দেখাতো। একটু বড়ো হলেই দেখতাম র‍্যাকেট নিয়ে তাদের বাড়ির বাচ্চা চাকরদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতো। তার সঙ্গে খেলবার জন্যে ইন্দ্রনাথ একটা ছোট ছেলেকে মাইনে দিয়ে রেখে দিয়েছিল। কারণ বাড়িতে সুদীপ ছাড়া অন্য কোনো সমবয়সী ছেলে-

মেয়ে ছিল না, সে যাতে নিঃসঙ্গ বোধ না করে তার ব্যবস্থা করে রেখে-ছিল ইন্দ্রনাথ আর তার স্ত্রী। লেক-ক্লাবে ইন্দ্রনাথ তাকে মেম্বার করিয়ে দিয়েছিল যাতে লেখাপড়া খেলাধুলোর সঙ্গে সাঁতারটাও শেখে। তার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থাও ছিল। সে-গাড়ি তার ট্রেনারের সঙ্গে সকালবেলা লেক-ক্লাবে নিয়ে যেতো। আর তারপর সেখান থেকে সাঁতারের ট্রেনিং দেওয়ার পর আবার গাড়ি করে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতো।

তারপর পড়তে বসা। তখন ব্রেক-ফাস্ট শেষ করে প্রাইভেট টিউটর আসতো অঙ্ক করাতে। তার এক ঘণ্টা পরেই লাঞ্চ। লাঞ্চ শেষ হতে-না-হতেই স্কুলের বাস আসতো। তখন সুদীপ ইউনিফর্ম পরে গিয়ে উঠতো সেই বাসে। তারপর বিকেল চারটে সাড়ে-চারটের মধ্যে আবার বাড়ি ফিরে আসতো।

তারপর বাড়ির সামনের বিরাট লন্-এর ওপর সেই সমবয়েসী ছোকরার সঙ্গে চলতো ব্যাডমিনটন খেলা কিংবা টেনিস। পাড়ার কোনো ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে তার ওপর নিষেধ ছিল।

ছেলেকে আদর্শ ছেলে হিসেবে তৈরি করতে হলে তার বাপকেও আদর্শ বাপ হতে হবে। তাই ইন্দ্রনাথও ছেলের কাছে যাতে আদর্শ হয় সেই চেষ্টাই করতো সে।

ইন্দ্রনাথ যাতে নিজে আদর্শ পিতা হতে পারে সেইজন্যেই কখনও সিগারেট বা মদ স্পর্শ করতো না। নিজেকে নানারকম ভাবে সংযত করে রাখতো।

প্রায়ই বলতো—ছেলেরা যে খারাপ হয় তার জন্যে দায়ী বাপরাই। বাপেরা যদি পান, সিগারেট, মদ খায় তাহলে ছেলেরাও পান, সিগারেট, মদ খেতে শিখবে। তাই আমি ও-সব ছেড়ে দিয়েছি।

কথাটা যে খাঁটি সত্যি তা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম। তাই তার কথায় আমরা সায়ও দিতাম।

ইন্দ্রনাথও বলতো—তাই ভাই আমার স্ত্রীও আমাকে ও-সব খেতে

বারণ করতো।

আমরা বলতাম—তোর অনেক সৌভাগ্য যে তুই ও-রকম স্ত্রী পেয়েছিস!

ইন্দ্রনাথও আমাদের কথার সমর্থন করতো।

বলতো—ঠিক বলেছিস ভাই, আমার স্ত্রীর জন্যেই আমার সুদীপ এইরকম আদর্শ ছেলে হয়েছে।

সত্যিই সুদীপ ছিল ইন্দ্রনাথের গর্ব করার মতো ছেলে।

আমরা যখনই ইন্দ্রনাথের বাড়িতে যেতাম তখনই সুদীপ আমাদের 'আংকেল' 'আংকেল' বলে আন্তরিক অভ্যর্থনা করতো।

বলতো—আংকেল, এতদিন আসোনি কেন?

তারপর স্কুলে প্রত্যেক বছরেই প্রাইজ পেতো সুদীপ। প্রত্যেক বছরেই প্রায় একটা-না-একটা প্রাইজ পেতো। কখনও সে ফার্স্ট হতো, কখনও সে সেকেণ্ড, আবার কখনও থার্ড প্রাইজ। তার নিচেয় কখনও সে ফোর্থ বা ফিফ্থ্ হতো না।

একবার তো সে মেডেলও পেয়েছিল।

প্রত্যেকবারই সে তার প্রাইজ-পাওয়া বই বা মেডেল দেখাতো।

বলতো—এই দেখ আংকেল, আমি এবার ফার্স্ট হয়েছি ক্লাসে, এই বইটা আমি প্রাইজ পেয়েছি—

আমরা দেখে তারিফ করতাম তার।

মনে আছে আমরা তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে অনেক ভালো ভালো বই কিনে উপহারও দিতাম। সেগুলো পেয়ে যে সে কী-রকম আহ্লাদ করতো তা বলে শেষ করতে পারা যাবে না। আর দু'দিনের মধ্যে শেষ করে ফেলতো। আর আমাদের সঙ্গে দেখা হলে বলতো—আংকেল, তোমার দেওয়া বইটা ভারি ওয়াণ্ডারফুল—

আমরা কী বই দিতাম তা এখন এতদিন পরে আর মনে নেই। মনে হয় তার ইংরিজী-প্রীতি শুনে আমরা ইংরিজী বই-ই তাকে উপহার

দিতাম।

ইন্দ্রনাথ বলতো—আমার সুদীপটা একটা জিনিয়াস, জানিস—

বলতাম—কীসে বুঝলি ?

ইন্দ্রনাথ বলতো—ভাই, ডিক্‌স্‌নারিটা পর্যন্ত মুখস্থ করে ফেলেছে—

—কী করে জানলি ?

ইন্দ্রনাথ বলতো—ওর প্রাইভেট টিউটর আমাকে বলেছে। বলেছে—একে যেন এ-কথা বলবেন না। বললে ওর অহঙ্কার হবে, আর অহংকার হলেই একেবারে পতন অনিবার্য। আমার তো অনেক স্টুডেন্ট আছে, কিন্তু সুদীপের মতো স্টুডেন্ট আমার একটাও নেই।

আমরা ইন্দ্রনাথের পুত্র-গর্ব দেখে খুশী হতাম। ভাবতাম—একেই বলে লক্ষ্মীলাভ। বাংলায় যাকে বলে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ, তাই—

জিজ্ঞেস করতাম—ছেলেকে কোন্ লাইনে দিবি ঠিক করেছিস ?

ইন্দ্রনাথ বলতো—আমিও তো তাই ভাবছি। ও তো অল্‌রাউণ্ডার। বীণা বলেছিল, ওকে ল'-লাইনে দিতে। আমার তো ল'-লাইন, আর তার ওপর মামলা করাই আমার প্রফেসান, তাই বড়ো হলে আমাকে হেল্‌প্ করতে পারবে এমন লাইনেই দেওয়া ভালো। তবে তার তো এখন অনেক দেরি।

তা তো সত্যি! তখন তো সবে ও স্কুলের ছাত্র। এত আগে থাকতে সে-আলোচনা করে লাভ নেই।

মনে আছে একবার ঘটা করে সে সুদীপের 'বার্থ-ডে' সেলিব্রেশন করেছিল।

সব ছেলেরাই বাপ-মায়েদের কাছে সমান প্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রনাথের কথা আলাদা। তার মতো কারই বা ছেলে আছে, আর কোন্ ছেলেরই বা ইন্দ্রনাথের মতো বাপ আছে। ইন্দ্রনাথ শুধু যে ধনী তা-ই নয়, আই-সি-এস বাপের ছেলে বলেও তার একটা আলাদা মর্যাদা আছে, যেটা

করমচাঁদের বা আমার কারোরই নেই। ইন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করলে সবাই একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখতো আমাদের। আমরা তার বন্ধু বলে আমাদেরও অন্যদের কাছে সম্ভ্রমের প্রাপ্যটা দ্বিগুণ, পাঁচগুণ, দশ-গুণ হয়ে উঠতো।

আর তা ছাড়া ইন্দ্রনাথ তো শুধু আই-সি-এস'এব ছেলেই নয়, সে যে সুদীপের মতো ছেলের বাপ! আর এ-যুগে যখন টাকাই মর্যাদার শেষ উচ্চতম বিন্দু তখম তার নাম শুনলে যে সবাই শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়াব কী আছে!

তা সেই 'বার্থ-ডে সেলিব্রেশন' পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে আমরাই ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম যেন।

মনে আছে সেদিন ইন্দ্রনাথ কতো দামী-দামী আহার্যের আয়োজন করেছিল: কতো সম্ভ্রান্ত লোকদের নেমন্তন্ন করেছিল, কতো দামী-দামী উপহার তার সুদীপ পেয়েছিল, আর ইন্দ্রনাথের স্ত্রী কতো আন্তরিকতার সঙ্গে সকলকে অভ্যর্থনা আপ্যায়ন করেছিল।

সকলকেই বলেছিল--আপনাবা ওকে আশীর্বাদ করুন যেন ও দীর্ঘায়ু হয়, আমাদের বংশের নাম উজ্জ্বল করে।

আমরা ওর কথামতো সুদীপকে সেই আশীর্বাদই করেছিলাম। আমাদের আশীর্বাদ কতোখানি ফলবান হবে সে-সম্বন্ধে আমরা ওয়াকি-বহাল হলেও ওটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বলেই ধবে নিয়ে-ছিলাম। ধরে নিয়েছিলাম ওটাই নিয়ম। ওটাই ফর্ম্যালিটি। তবে দেখেছিলাম যাকে ঘিরে ওই অনুষ্ঠান সে খুব হাসিখুশী, খুব কেতা-দুরস্ত, খুব ভদ্র আর খুব সপ্রতিভ।

সত্যিই মনে হয়েছিল অন্যান্য ব্যাপারে ইন্দ্রনাথ যেমন সার্থক মানুষ, সন্তানের ব্যাপারেও সে ঠিক তেমনিই সৌভাগ্যবান।

ভালো সন্তান পাওয়াও তো মানুষের একটা সৌভাগ্য। কারণ সন্তানই তো মানুষের শেষবয়েসের নির্ভরতা, শেষবয়েসের সান্ত্বনা,

শেষবয়েসের আশ্রয়-স্থল।

তা শেষবয়েসের সেই আশ্রয়-স্থল সন্তান নিয়ে কী এমন দুর্বি-পাক হলো যে ইন্দ্রনাথকে জ্যোতিষীর আশ্রয় নিতে হয়েছে?

সেই কথাতেই এলো ইন্দ্রনাথ।

বললে—জানিস, বীণার মৃত্যুতে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম রে! মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার—

—জ্যোতিষী কী বললেন?

ইন্দ্রনাথ বললে—আপনার কি স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে?

আমিও অবাক হয়ে গেলাম শুনে।

জিজ্ঞেস করলাম—কী করে জানলেন জ্যোতিষী?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমিও তো তাই শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জ্যোতিষীকে তো আমি আমার সম্বন্ধে আগে কিছুই বলিনি। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে বলতে গেলে কাউকে কিছুই আগে আমি বলিওনি। শ্রাদ্ধটাও নমো-নমো করে সেরেছিলুম। তাই বিশেষ কারো সে-কথা জানবারও নয়। আমার ছেলের জন্ম-পত্রিকা দেখেই জ্যোতিষী বলে দিলেন—এই জাতকের কি সম্প্রতি মাতৃবিয়োগ হয়েছে?

—বলে দিলেন?

—হ্যাঁ, ভাই। বলতেই আমি চম্‌কে উঠেছি—

—তারপর?

ইন্দ্রনাথ বললে—কথাটা শুনেই তাঁর ওপরে আমার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম—এই ছেলের ভবিষ্যতে কী আছে বলে দিন?

জ্যোতিষীই বললেন—এই জাতকের অর্থ-ভাগ্য খুব ভালো।

শুনে ইন্দ্রনাথ খুশী হলো খুব।

—তারপর?

—তারপর আমি আরো জিজ্ঞেস করলাম—এর পিতার চেয়েও কি

এর অর্থ-ভাগ্য ভালো ?

—শুনে কী বললেন ?

ইন্দ্রনাথ বললে—জ্যেতিষী আরো ভালো করে দেখতে লাগলেন সুদীপের কুষ্ঠীটা। বললেন—এর পিতার চেয়ে দশগুণ অর্থ এই জাতকের। জাতক পিতার অর্থের প্রত্যাশাই করবে না।

—তাই নাকি ? জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এত কথা বলা যায় ?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমিও তো তা জানতাম না। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আমার মনটা খারাপ না হলে তো আমি জ্যোতিষীর কাছে আসতুমও না। আমার তো কোনোকালে জ্যোতিষের ওপর বিশ্বাস ছিল না। হঠাৎ মনে হলো, খবরের কাগজে তো জ্যোতিষী-সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞাপন দেখি। কোর্ট থেকে বেরিয়েই তাই একজন জ্যোতিষীর কাছে চলে এসেছিলুম। আমার বাবা আই-সি-এস হলেও তাঁর বিশ্বাস ছিল জ্যোতিষের ওপর। তাই সুদীপ যখন জন্মালো তখন তিনি খুব খুশী হলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে একজন পণ্ডিতকে দিয়ে একটা জন্মপত্রিকা করিয়ে নিয়েছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর ওটা আমি আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম। আমার বাবা নাতিকে খুব ভালোবাসতেন। শেষজীবনে সব সময় সুদীপকে কাছে কাছে রাখতেন। দিনে-রাত্তিরে সব সময় সুদীপ তার ঠাকুরদাদার কাছেই শুতো। যতোদিন সুদীপ ছোট ছিল ততোদিন সে দাদুকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতো। আর তার দাদুই ছিল তার বাপ-মা'র চেয়ে বেশি প্রিয়। তাই তার দাদু মারা যাওয়ার আগে তাঁর নিজের সমস্ত সম্পত্তি নাতির নামে দানপত্র করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

ইন্দ্রনাথ সে-কালের সব কথা অনর্গল বলে যেতে লাগলো। কতো সব পুরোনো দিনের স্মৃতি জড়ানো সেই কলেজ-জীবনের কথা, সেই যুগের আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেওয়ার কথা। আরো অনেক

কথা। তার মুখে যেন হঠাৎ কথার খই ফুটতে লাগলো।

দেখলাম ইন্দ্রনাথ কিছুই ভোলেনি। এত বড়োলোক, এত ব্যস্ত লোক হয়েও সে সব কথা মনে রেখেছে। কোন্ কোন্ প্রফেসার আমাদের কী কী পড়াতেন, কেমন করে পড়াতেন, কবে কবে পড়াতেন তা সে যেন মুখস্থ করে রেখেছে।

বললাম—সে-সব কথা এখনও তোর মনে আছে?

ইন্দ্রনাথ বললে—মনে থাকবে না? কী বলছিস তুই?

বললাম—বেশির ভাগ লোকেই তো টাকা হলে ছোটবেলার বন্ধুদের ভুলে যায়!

ইন্দ্রনাথ বললে—টাকা অবশ্য এখন আমার হয়েছে, কিন্তু টাকাটাই কি জীবনের সবকিছু? তোর কথা, করমচাঁদের কথা কি কখনও ভুলতে পারি? আর তা ছাড়া আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আরো বেশি করে মনে পড়ে যাচ্ছে সেই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা! তোদের মনে পড়ে আমার সেই বিয়ের দিনের কথা? তুই তোর প্রথম বইটা আমার নামে উৎসর্গ করেছিলি।

—এত ব্যস্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে-কথা তোর মনে আছে?

—কী বলছিস তুই? মনে থাকবে না? আমার স্ত্রী তোর বই-এর খুব ভক্ত ছিল, তা তো তুই জানিসই।

বললাম—হ্যাঁ, সে-কথা আমাকে একবার বলেছিলেন তিনি।

—হ্যাঁ, তুই পরে আর আমাকে অন্য বই দিসনি, কিন্তু আমার স্ত্রী পয়সা খরচ করে বাজার থেকে কিনে পড়তো—

বলে একটু থেমে আবার বললে—অবশ্য, হ্যাঁ, আমি তোর কোনো বই পড়বার সময় পাইনি সময়ের অভাবে। তবে আমার বউ-এর মুখে শুনেছি তোর বইগুলো নাকি খুব ভালো। লোকে তোর বই পড়বার জন্যে কাড়াকাড়ি করে। বই লিখেও তো অনেক টাকা হয়। পাবলিশার্সরা টাকা ঠিকমতো দেয় তোকে?

আমি সে-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললাম—আমার কথা থাক, তুই তোর ছেলের কথা বল্—

কিন্তু ইন্দ্রনাথ বললে—আমি যে-কথা জিজ্ঞেস করছি সেই কথা বল্-না তুই। আজকাল তো সাহিত্যের ব্যাপারে অনেক পুরস্কার-টুরস্কার দেওয়া হচ্ছে দেখেছি। তুই কিছু পুরস্কার-টুরস্কার পেয়েছিস ? আর একটা কথা, লিখে ভালোমতো পেট চলে ?

আমি বললাম—ও-সব এখন থাক। তুই তোর সুদীপের কথা বল্। জ্যোতিষী সুদীপের সম্বন্ধে আর কী বললে ?

ইন্দ্রনাথ বললে—খুব ভালো।

—খুব ভালো মানে ?

—খুব ভালো মানে খুব ভালো।

তবু ব্যাপারটা মোটেই স্পষ্ট হলো না আমার কাছে।

জিজ্ঞেস করলাম—খুব ভালো মানে কী ?

ইন্দ্রনাথ বললে—খুব ভালো মানে সুদীপের খুব টাকা হবে। আমার চাইতেও সুদীপের অনেক বেশি টাকা হবে। একেবারে টাকার পাহাড় হবে ওর। কথাটা শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি।

—তুই কি সত্যিই জ্যোতিষ বিশ্বাস করিস ?

—যদি বিশ্বাস না করি তো জ্যোতিষী সুদীপের কুষ্ঠীটা দেখেই বললে কেন যে এর সম্প্রতি মাতৃবিয়োগ হয়েছে। আমার স্ত্রীর মৃত্যুটা নিশ্চয়ই সুদীপের কুষ্ঠীতে লেখা ছিল। আর তা না হলে ও-কথা জ্যোতিষী বলবে কেন ? আর তাইতেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ওপর আমার বিশ্বাসটা আরো বেড়ে গেল।

এর পর আমি আর কী বলবো। তাই চুপ করে রইলাম।

ইন্দ্রনাথ আবার বলতে লাগলো—যাক, সুদীপের ভবিষ্যৎটা জেনে আমি আমার মনে খুব শান্তি পেয়েছি ভাই। আমি ভাবতাম আমার একটা মাত্র ছেলে, সে যদি টাকা-কড়ি রোজগার না করতে পারে

তবে তার মতো দুর্ভাগ্যের কথা আর কী হতে পারে বল্ ?

জিজ্ঞেস করলাম—জ্যোতিষী বলে দিলে তোর ছেলের অনেক টাকা হবে ?

—হ্যাঁরে, হ্যাঁ। তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ? অথচ আমি আমার ছেলের সম্বন্ধে কিছুই বলিনি আগে থেকে। সে নিজে থেকেই বললে—এই কুষ্ঠীর মালিক জীবনে এত টাকার মালিক হবে তার হিসেবই থাকবে না—

যে-কোনো বাবাকে তার ছেলের সম্বন্ধে এই কথা বললে এমন কেউ নেই যিনি খুশী হবেন না। ইন্দ্রনাথকে দেখে মনে হলো যে, সে সেই কথা শুনে খুবই খুশী হয়েছে।

বললাম—আমাদের বন্ধুদের মধ্যে তুই-ই দেখছি একমাত্র ভাগ্যবান বাপ। আমার ছেলে নেই আর করমচাঁদের ছেলেরাও সাধারণ ছেলে ছাড়া আর কিছু নয়—

কথাটা যে-কোনো বাবার পক্ষেই মুখরোচক, বিশেষ করে ইন্দ্র-নাথের মতো বাবার পক্ষে তো বটেই। পুত্রগর্বে ইন্দ্রনাথের মুখটার চেহারা খুশীতে ডগমগ করতে লাগলো।

শুধু বললে—বীণা মারা যাওয়ার পর এক ছেলে ছাড়া আর তো আমার কেউ রইলো না। ওই ছেলেই আমার একমাত্র ভরসা রইলো। সে যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সেই চিন্তাটাই আজ আমার একমাত্র চিন্তা। সেইজন্যেই আজ জ্যোতিষীর কাছে এসেছিলুম।

বললাম—কিন্তু ওই ছেলের জন্যে তোর এত চিন্তা কেন ? তোর ছেলে তো প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়।

ইন্দ্রনাথ বললে—সে তো অনেক ছেলেই প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ছেলে কি মানুষ হয় ? আমাদের সময়কার কথাই ধর না। আমাদের সঙ্গে যারা স্কুলে-কলেজে ফার্স্ট হতো, তারা আজ কোথায় গেল ? তাদের তো আজকাল নামই শোনা

যায় না !

বললাম—তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু ছোটবেলায় লক্ষণ দেখে তো বোঝা যায় যে বড়ো হলে সে কী-রকম হবে! সেদিক থেকে তোর ছেলে এখনই ব্রিলিয়াণ্ট !

ইন্দ্রনাথ বললে—কিন্তু জীবনের শেষ পরীক্ষাটাই তো আসল রে। সেই শেষ পরীক্ষায় যে ফার্স্ট হবে তাকেই বলবো পুরুষ-সিংহ। আমি সেই পরীক্ষাটায় ছেলে ফার্স্ট হবে কিনা সেইটেই জানতে এসেছিলুম।

—তাতে কী বললে জ্যোতিষী ?

ইন্দ্রনাথ বললে—জ্যোতিষীরও সেই একই মত। তিনি বললেন—আপনার ছেলে সেই জীবনের শেষ পরীক্ষাতেও ফার্স্ট হবে। এ-কথার পর আমি আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। তাঁর টাকা মিটিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

১১১

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। তখন ইন্দ্রনাথকে দেখে সত্যিই আমাদের ঈর্ষা হতো।

আমরা মানে, আমি আর করমচাঁদ দু'জনেই ভাবতাম ইন্দ্রনাথ আমাদের চেয়ে সত্যিই অনেক ভাগ্যবান। শুধু যে তার স্ত্রী-ভাগ্য এবং সন্তান-ভাগ্য ভালো তাই-ই নয়, তার পিতৃভাগ্যও ভালো ছিল। যার অমন আই সি-এস বাবা তার আর কীসের ভাবনা। তার বাবা যে টাকা জমিয়ে গিয়েছেন তা-ই তো তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তার ওপর সে হাজারগুণ টাকা নিজে উপার্জন করেছে। তার সঙ্গে এবার তার ছেলে সে-টাকার হাজারগুণ বাড়াবে !

সব দেখে-শুনে করমচাদ আমাকে বলতো—জানিস, আসলে ইন্দ্রনাথের ভাগ্যটাই ভালো। অথচ আমার ছেলেরা তো ইন্দ্রনাথের

ছেলের মতো হয়নি।

আর স্ত্রীর মৃত্যু ?

তা হলোই বা স্ত্রীর মৃত্যু ! স্ত্রী তো কারো চিরকাল বেঁচে থাকে না। তাতে তো ইন্দ্রনাথের কোনো অসুবিধেও হয়নি। স্ত্রী ছেলেকে মানুষ করে নিজের কর্তব্য করে চলে গিয়েছে। সুতরাং সেদিক থেকে ইন্দ্রনাথকে ভাগ্যবান বললে অন্যায় হবে না।

আর টাকাটাই যখন ইন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে মুল্যবান জিনিস তখন আরো সন্তান হলে তার আরো বেশি টাকা খরচ হতো। বিশেষ করে এই পরিবার-পরিকল্পনার যুগে।

তা এতদিন পরে করমচাঁদের কাছে ইন্দ্রনাথের দুঃখের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—তা কেন এমন হলো বল্ তো ?

করমচাঁদ বললে—কী জানি ভাই, কিছুই তো বুঝতে পারলুম না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—ওর সুদীপের সঙ্গে দেখা হলো তোর ?

—না, ভাই। চাকর-বাকররা জানতে পারলে যে আমি এসেছি। তাদেরও আমি চিনি, সব পুরনো স্টাফ তারা। তারাও আমাকে চিনতে পারলে। কিন্তু আমাকে দেখে আগেকার মতো তারা আমাকে সেলামও করলে না। শুধু বললে—সাহেব না বললে তারা আমার সঙ্গে বাবুর দেখা করতে দেবে না। সাহেব নাকি রাগ করবে।

—সাহেব কে ?

করমচাঁদ বললে—আমার তো মনে হলো সাহেব মানে ইন্দ্রনাথের সেই ছেলে সুদীপ !

বললাম—সে কী ? সুদীপ ? এককালে সুদীপ তো আমাদের দেখতে পেলেই 'আংকেল' 'আংকেল' বলে দৌড়ে আসতো ! আমরা তাকে কোলে করে আদর করতাম। তার জন্মদিনে আমরা প্রত্যেক-

বার ইন্দ্রনাথের বাড়ি গিয়েছি। কতো উপহার দিয়েছি। সে সেইসব উপহার পেয়ে কতো খুশী হয়েছে। এককালে ইন্দ্রনাথও তো কতো প্রশংসা করতো তার সুদীপের।

করমচাঁদ বললো—সে-সব আমারও মনে আছে।

—আরে, একদিন সেই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তো আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে তখন সুদীপের কুষ্ঠী নিয়ে এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিল। জ্যোতিষী তাকে নাকি বলেছিল যে তার ছেলে কোটি কোটি টাকার মালিক হবে।

—তা তাই-ই তো হয়েছে।

বললাম—হ্যাঁ, ছেলেকে ইন্দ্রনাথ তো হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট করে দিয়েছে। তাতে তার নাকি খুব প্র্যাকটিশ হচ্ছে।

—আমিও তাই শুনেছি। সে নাকি এক-একটা কেসে একবার দাঁড়াবার জন্যে সতেরো শো টাকা করে নেয়।

আমি বললাম—তা সে তো ভালো কথা। খুবই ভালো কথা। কিন্তু তুই আর কিছু শুনিসনি?

করমচাঁদ বললে—কী শুনবো?

—সুদীপ নাকি বিয়ে করেছে?

—কে বললে তোকে?

বললাম—লোকমুখে শুনলুম। কিন্তু একটা কথা জেনে অবাক হয়ে গেলুম, সে-বিয়েতে ইন্দ্রনাথ নাকি কাউকেই খবরও দেয়নি, নেমন্তন্নও করেনি। এটা কেমন করে হলো?

করমচাঁদ বললে—দেখি, আমি খবরটা নেব। নিয়ে তোকে জানাবো!

বললাম—এ-খবরটা তো ইন্দ্রনাথকে গিয়ে জিজ্ঞেস করা যায় না। নইলে আমিই তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতুম। ব্যাপারটা তো প্রকাশ করবার মতো নয়।

—কেন ?

বললাম—হয়তো অসবর্ণ বিয়ে করেছে। কিংবা হয়তো ছেলে প্রেম করে অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে এনেছে। লজ্জায় হয়তো সে-কথা কাউকে বলতে পারছে না। জানাজানি হয়ে গেলে লজ্জায় পড়ে যাবে, তাই খবরটা লুকিয়ে রেখেছে।

করমচাঁদ বললে—ঠিক আছে, আমি যেমন করে হোক খবরটা বার করবোই।

—কী করে খবরটা বার করবি ? ইন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে ?

করমচাঁদ বললে—দেখি, কী করতে পারি এ-ব্যাপারে।

বলে সে তার কাজে চলে গেল। সেও ইন্দ্রনাথের মতো ব্যস্ত-বাগীশ লোক। তার হাজারটা কাজ সংসারে। তার এত কাজ যে তার ছেলেরা সবাই মিলেও তা শেষ করতে পারে না। কলকাতা, কলকাতা শহরের বাইরে যেখানে যতো খালি জমি-জায়গা-পুকুর আছে সব জায়গায় তার বাড়ি তৈরি হচ্ছে আর সেইসূত্রে এমন সব মহলের সঙ্গে তার মেলা-মেশা, যেখানে প্রবেশ করা আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব।

মাসকয়েক পরেই সে এক খবর নিয়ে এলো। একেবারে জবর-খবর। মানুষের সংসারে এমন অনেক মানুষই আছে যাদের একটি মাত্র সন্তান বর্তমান। ইন্দ্রনাথও তেমনি একজন মানুষ।

একটা কারণে সে সৌভাগ্যবান। সেটা হলো সন্তানটি পুত্র-সন্তান এবং সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত। এর চেয়ে বেশী গুণ মানুষ আর কী কামনা করতে পারে ? সংসারে ক'টা পিতার পুত্র-সন্তান একাধারে এত সচ্চরিত্র, এত স্বাস্থ্যবান আর এত শিক্ষিত !

আর আসলে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ইন্দ্রনাথ যে বেশি ভেঙে পড়েনি, তার কারণ ওই সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান আর শিক্ষিত সুদীপ। সুদীপের মুখের দিকে চেয়েই ইন্দ্রনাথ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার স্ত্রীর

মৃত্যুর মতো চরম শোক সহ্য করতে পেরেছিল।

সুদীপ তখন ল' পাস করে প্র্যাকটিশ সুরু করে দিয়েছে। ইন্দ্রনাথও আইন পাস, ছেলেও তাই।

প্রথম দিনেই ইন্দ্রনাথ ছেলেকে উপদেশ দিয়ে দিলে।

বললে—দেখ, তুমি যে লাইনে যাচ্ছো, সেখানে অনেক প্রলোভন। বড়ো হওয়ার লক্ষ্যে যদি পৌঁছতে চাও তো সেই টাকার প্রলোভন তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। তা পারবে ?

সুদীপ বললে—চেষ্টা করবো।

—হ্যাঁ, কাজ ভালো করে করলে তোমার টাকার কখনও অভাব হবে না। এইটে জেনে রেখো। অনেকের ধারণা অন্যায় ভাবে টাকা উপায় করলে তবেই টাকা হয়। কিন্তু তা নয়। আসলে কাজ ভালো করে করলেই টাকা আসতে বাধ্য।

সুদীপ বললে—ভালো করেই আমি কাজ করবো।

—হ্যাঁ। অনেকে কাজ ভালো না করে শুধু টাকা চায়। তাতে টাকা একেবারেই হয় না।

এর পর থেকে ইন্দ্রনাথ যখনই সময় পেয়েছে তখনই ছেলেকে উপদেশ দিয়ে এসেছে।

তাতে ছেলের উপকারই হয়েছে বরাবর।

ইন্দ্রনাথ আরো বলেছে—বরাবরই টাকার জন্যে বহু লোক ওকালতি পড়তে গেছে। তুমি ভেবেছ এ-লাইনে বুঝি অনেক টাকা। কিন্তু তাহলে কেন অনেক এ্যাডভোকেট উপোস করে ? উপোস করে এই-জন্যে যে তারা কাজটার দিকে মন দেয় না, কেবল টাকার দিকে মন দেয়। আর তা ছাড়া আর একটা কথা। তুমি তো গরীব নও, ওকালতি না করলেও তোমার চলবে। তোমাকে আমি যতো টাকা দিয়েছি তাতে তো তোমার জীবনটা চলে যাবেই, এমনকি তোমার অধস্তন তিন পুরুষেরও চলে যাবে। তাদের কারো কিছু কাজ করে খেতে হবে

না। তা তো জানো তুমি?

সুদীপ বলেছে—হ্যাঁ, আমি জানি।

ইন্দ্রনাথ বলেছে—হ্যাঁ, আমিও ওকালতি পাস করে টাকার জন্যে কখনও লোভ করিনি। লোভ করেছি আমার বুদ্ধি-বৃত্তির খেলা দেখাবার জন্যে! অনেকে যেমন দাবা খেলে আনন্দ পায়, আমিও তেমনি আইন-জ্ঞান নিয়ে দাবা-খেলা খেলেছি।

সুদীপ নাকি বাবার কথা শুনে খুশী হয়েছিল।

কিন্তু বাবার সঙ্গে তার দেখাই বা হতো কতক্ষণ? বাবা তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই নিজের কাজে বেরোত, আর কখন বাড়ি ফিরবে তার কোনো হিসেবই থাকতো না।

এমনি করেই চলছিল ইন্দ্রনাথের সংসার।

ছেলের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের অনেকদিন রাত্রে দেখা হতো।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করতো—কেমন চলছে তোমার কাজকর্ম? আজ কোনো কেস-টেস ছিল?

সুদীপ বলতো—রোজই তো কেস থাকে। আজ একটা ডিভোর্সের কেস ছিল, আর একটা কেস ছিল ভাড়াটে বাড়িওয়ালার কেস।

কেবল উচ্ছেদ আর বিচ্ছেদের মামলা করতে করতেই একজন এ্যাডভোকের সারাটা জীবন কেটে যায় হাইকোর্টে। সুতরাং কোনো এ্যাডভোকেটেরই কাজের কোনো শেষ নেই।

ইন্দ্রনাথ সুদীপের ব্যস্ততা দেখে খুশী। অদৃশ্য ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা জানালে—ছেলে যেন সারাজীবন তার মতো এমনি ব্যস্তই থাকে।

হঠাৎ একদিন ইন্দ্রনাথের হুঁশ হয়। ভাবে—তাই তো, ছেলের তো এবার বিয়ে দেওয়ার বয়েস হয়েছে। এতদিন নিজের কাজ-কারবার দেখতে গিয়ে ছেলেটার বিয়ের কথা মনেই আসেনি।

বিয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে যেটা বড়ো ব্যাপার, সেটা হলো টাকাকড়ি। সব মেয়ের বাবাই দেখবে পাত্রের টাকাকড়ি কেমন আছে, কতো টাকা পাত্র রোজগার করে। কতো টাকা ছেলের নামে ব্যাঙ্কে জমা আছে। আর তা ছাড়া বাড়িটা তো ছেলেরই নামে।

সেদিক থেকে ছেলের কোনো কম্‌তি ছিল না। তার মতো বয়েসে অতো টাকা কলকাতার কোনো ছেলেরই থাকবার কথা নয়। আর যে-টাকাগুলো ব্যাঙ্কের খাতার বাইরে রাখা ছিল সেটার হিসেব না জানলেও ক্ষতি ছিল না।

সুতরাং বিয়ের বাজারে সুদীপ যে একজন দামী পাত্র সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এ-যুগে একটা ছেলের বাপ হওয়া তো একজন বাপের পক্ষে সৌভাগ্যের সূচক। বিশেষ করে, এই পরিবার-পরিকল্পনার যুগে।

শুনেছি 'মৎস্য-পুরাণে' নাকি লেখা আছে যে দশটা কুয়োর সমান হলো একটা পুকুর, দশটা পুকুরের সমান নাকি হলো একটা দীঘি, দশটা দীঘির সমান নাকি হলো একটা পুত্র, আর দশটা পুত্রের সমান হলো নাকি একটা বৃক্ষ।

বৃক্ষ তো ইন্দ্রনাথের বাগানে অনেক আছে, কিন্তু একটা ছেলে?

মেয়ে থাকলে আজকাল তার বিয়ে দেওয়ার অনেক সমস্যা আছে। বিয়ে না-হয় এক জায়গায় দেওয়া হলো। কিন্তু জামাই?

জামাই-ও মনের মতো হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা?

তা সেই ইন্দ্রনাথের যখন একটাই ছেলে তখন যে-কোনো মেয়ের বাপ-ই তার মেয়ের সঙ্গে এই ছেলের বিয়ে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে! সুদীপ এমন একটা ছেলে যার নিজের নামে পৈতৃক দশ-বারো লাখ টাকা দামের বাড়ি, ব্যাঙ্কে সাদা টাকা অশি-নব্বই লাখ টাকা জমা, শেয়ারে ডিবেঞ্চারে কুড়ি-তিরিশ লাখ টাকা খাটছে, আর লকারে সোনা-রুপো-হীরে-মুক্তোর গয়না যে কতো আছে তার ঠিক নেই।

আর হিসেব-বহির্ভূত টাকা ?

সেও তো নিশ্চয়ই কয়েক লাখ টাকা হবেই। সে-সব টাকাও সুদীপের কাছে গচ্ছিত থাকে। ইন্দ্রনাথ কোনো টাকাই নিজের কাছে রাখে না। তেমন নির্বোধ সে নয়। সে জানে ছেলের নামে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ সুদীপও চতুর। ইন্দ্রনাথ জানে কেমন করে টাকা উপায় করতে হয়। আর সুদীপ জানে কেমন করে টাকা রক্ষা করতে হয়।

ইন্দ্রনাথ যা টাকা উপায় করে সঙ্গে-সঙ্গে তা এনে ছেলের হাতে তুলে দেয়।

বলে—এই নাও—

সুদীপও তেমনি ছেলে। টাকা পেলেই নিয়ে নেয়।

ইন্দ্রনাথ আর তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে জানতো যে তার ছেলে বুদ্ধিমান। তার হাতে টাকা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়। যারা ইন্দ্রনাথের কাছে আসতো তাদের কাছে ইন্দ্রনাথ বলতো—ভাই, টাকা-পয়সার কথা আমার ছেলেই জানে। আমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাই না।

শুধু দরকারের-সময় ইন্দ্রনাথ সুদীপকে ডাকতো।

বলতো—আমায় কিছু টাকা দে তো খোকা—

ছেলে জিজ্ঞেস করতো—কতো টাকা ?

—এই হাজার-পাঁচেকের মতো।

ছেলে বিনা বাক্যব্যয়ে বাবাকে পাঁচহাজার টাকা এনে দিত। আর আবার যখন ইন্দ্রনাথের টাকার দরকার হতো তখন আবার ছেলের কাছে চেয়ে নিত।

তাই যখন পাত্রীপক্ষ এসে ইন্দ্রনাথের কাছে ছেলের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন ইন্দ্রমাথ বলে—ছেলের বাপ হয়ে নিজের মুখে আমি আর কী বলবো। আপনারা হাইকোর্টের বার এ্যাসোসিয়েশনে গিয়ে কিংবা

পাড়ার লোকেদের জিজ্ঞেস করবেন, তাহলেই সব খবর পেয়ে যাবেন—

তারা বলে—তা কি আর নিইনি ভেবেছেন? আমরা সব খবর নিয়েই তবে এসেছি—

তারপর বলে—মেয়ে দেখবার সময় আপনার কখন হবে তাই শুধু আমাদের বলুন—

ইন্দ্রনাথ বলে—ওইটেই তো হয়েছে মুশকিল। দাঁড়ান আমি ক্যালেণ্ডারটা একবার দেখি।

সে-মাসের ক্যালেণ্ডারে রবিবার ছাড়া আর কোনো ছুটির দিন নেই। আর একটা রবিবার ছাড়া আর তিনটে রবিবারে উকিলের চেম্বারে যাওয়ার কথা।

শেষ পর্যন্ত তাই-ই সাব্যস্ত হলো।

ইন্দ্রনাথ সেই রবিবারেই পাত্রী পছন্দ করতে গেল। মোটামুটি পাত্রী পছন্দও হলো।

শেষকালে বললে—আমার ছেলে একবার পাত্রীকে দেখবে।

পাত্রীপক্ষ বললে—নিশ্চয়ই। পাত্র তো দেখবেই। তা কবে পাত্রের সময় হবে?

ইন্দ্রনাথ বললে—দেখি, কবে তার সময় হয়। সেও তো বড়ো ব্যস্ত মানুষ! তার কাছেও তো দিন-রাত মক্কেলের ভিড়। কোনোদিন রাত একটার আগে সে তাদের হাত থেকে ছুটি পায় না।

তা সময় কারই বা আছে আজকাল। আমারও নেই, করমচাঁদেরও নেই, ইন্দ্রনাথের নেই, ইন্দ্রনাথের ছেলেরও সময় নেই।

তবু তো ছেলের বিয়ে দিতে হবে।

সুদীপ বললে—আমার তো এক মিনিটও সময় নেই, দেখছো তো তুমি! আমি কখন পাত্রী দেখতে যাই? আমার কাজের কি কামাই আছে?

সত্যিই সুদীপ ব্যস্ত। ইন্দ্রনাথ নিজে যেমন ব্যস্ত, ছেলেও

তেমনি।

ইন্দ্রনাথ বললে—তা পাত্রী দেখবার সময় যদি না থাকে তাহলে দেখো না। পাত্রীকে আমি নিজে দেখেছি। আমার দেখাতে যদি বিয়ে করতে চাও তো বিয়ে করে নাও। পাত্রীটি দেখতে খুবই সুন্দরী। আমার নিজের খুব পছন্দ হয়েছে।

কিন্তু সুদীপ বললে—এখন আমার বিয়ে করবারও সময় নেই। আমার হাতে পঞ্চাশটা মামলা। কবে কখন কোন্ মামলাটা ওঠে তার তো কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

—কিন্তু সামনে তো কোর্টের ছুটি রয়েছে দু'দিন—

সুদীপ বললে—সে দু'দিন তো আমি কলকাতায় থাকবো না—

—কেন? কলকাতায় থাকবেনা কেন? কোথায় যাবে?

সুদীপ বললে—উলুবেড়িয়ায়।

—উলুবেড়িয়ায়? কেন?

সুদীপ বললে—আমার এক ক্লায়েন্টের মেয়ের বিয়ে। সেখানে আমাকে যেতেই হবে। আমাকে বিশেষ করে বলেছে, আমিও তাকে কথা দিয়ে দিয়েছি—

—তাহলে, তার পর? অন্য কোনো ছুটির দিন?

সুদীপ বললে—সব ছুটির দিনগুলো আগে থেকেই বুকড্ হয়ে গেছে।

—তাহলে কবে পাত্রী দেখবে, বলো তুমি?

সুদীপ বললে—সে পরে তোমাকে বলবো'খন—এখন তো আমি পারছি না।

ইন্দ্রনাথ অবশ্য জানতো যে যারা খুব নাম-করা এ্যাডভোকেট তারা সাধারণত সামাজিক বা ব্যক্তিগত কোনো কাজে-কর্মে সময় দিতে পারে না। তাদের পারিবারিক কাজ-কর্মের ব্যাপারে তাই দুর্নামপাবার দুর্ভোগ ঘটে।

কিন্তু সব এ্যাডভোকেট-ই তো বিয়ে করে ! বিয়ে করার জন্যে সময় পায়নি কেউ, এমন তো কখনও হয়নি।

আর ইন্দ্রনাথ নিজেও তো একজন উকিল ! ওকালতি প্র্যাকটিশ না করলেও উকিল-এ্যাডভোকেটদের সঙ্গেই তো তার দিন-রাত কাটে ! তবু তো তার বিয়ে হয়েছে।

তাহলে ? ছেলের কি বিয়ে হবে না ? আই-সি-এস কেদার চৌধুরীর এতকালের পরিবার কি নির্বংশ হয়ে যাবে ?

১১১

এ-সমস্তই করমচাঁদের কাছে শোনা খবর।

জিজ্ঞেস করলাম—এসব খবর তুই কোথা থেকে পেলি ?

করমচাদ বললে—বলবো, সবই বলবো তোকে। বলবো বলেই তো অনেক কাজ ফেলে তোর কাছে এসেছি। এই অবস্থায় ইন্দ্রনাথকে দেখে আমার একটা নতুন লাভ হলো ভাই—

—কী লাভ ?

করমচাঁদ বললে—ধারণা হলো টাকাই সব নয়।

—কী রকম ?

—টাকার জন্যেই তো আমরা এত সব খেটে মরছি ! এখন বুঝতে পারছি আমরা শুধু আলেয়ার পেছনে ছুটছি। ইন্দ্রনাথও তো এত কষ্ট করতো শুধু টাকার জন্যে। একটা ভাড়াটে ভর্তি বাড়ি সস্তা দরে কিনে মামলা করে সেইসব ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করতো, আর তার পরে মোটা দরে সেইসব বাড়ি বেচতো। তাই করে ইন্দ্রনাথ লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছে ভাই—

তা আমি শুনেছি ইন্দ্রনাথের কাছে।

করমচাঁদ বললে—তাহলে ইন্দ্রনাথের ছেলে সুদীপের বিয়ের ব্যাপারটা বলে নিই।

সেই বিয়েটাও একটা অদ্ভুত কাণ্ড। অতো টাকা থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রনাথের যে অতো দুর্গতি তা শুধু ওই ছেলের বউ-এর জন্যেই। আগে কতোবার ইন্দ্রনাথ ছেলেকে বিয়ে করতে বলেছে, তখন ছেলে সময় না-থাকার অজুহাত দেখিয়ে সে-বিয়ে করেনি।

একদিন সেই সুদীপই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো।

সেদিন ইন্দ্রনাথ দিনের সমস্ত কাজ সেরে একটু বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরে দ্যাখে তারই বসবার ঘরে খুব আলো জ্বলছে। এমন আলো তো রোজ জ্বলে না। কয়েকটা গাড়িও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবলো—এত রাত্রে কারা আবার তার কাছে এলো!

ঘরের বাইরে থেকে দেখলো, কারা সব অচেনা মানুষ তার ঘরে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে।

হঠাৎ দেখতে পেলে তাদের মধ্যে তার সুদীপও বসে আছে।

আর একটা মেয়ে তাদের সকলকে আপ্যায়ন করছে। বার বার ঘুরে-ঘুরে সকলকে বলছে—আর একটু নিন, এত কম খেলে চলবে কী করে। আর একটা কাটলেট দিচ্ছি আপনাকে, খেতেই হবে—

সবাই খেতে এত ব্যস্ত, হাসি ঠাট্টা-গল্প করতে এতই মশগুল যে ইন্দ্রনাথকে তখনও কেউ দেখতে পায়নি।

সুদীপ একজনকে বলে উঠলো—এই, তুই কিছু খাচ্ছিস না যে? কী হলো তোর?

সে-লোকটা বললে—আর খেতে ভালো লাগছে না ভাই, পেট একেবারে ভরে গেছে।

—আরে, খেয়ে নে, এসব খেলে তোর শরীর খারাপ হবে না। এ-খাবার ভালো হোটেল থেকে অর্ডার দিয়ে বানানো।

হঠাৎ তার খাস-চাকর রূপলাল সুদীপের কাছে গিয়ে বললে—সায়েব, বাবু এসেছে—

—বাবু? কোন্ বাবু?

—মালিক।

ইন্দ্রনাথ এতক্ষণ বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু দেখছিল। ভেতরে ঢোকেনি। তারই বাড়িতে প্রায় দশ-বারোজন খানা-পিনা করছে আর সে নিজে বাড়ির মালিক হয়েও সে-সব কিছুই আগে জানতে পারলে না। ছেলের যদি বাড়িতে পার্টি দেবারও সখ হয়ে থাকে তো সে বাবাকে আগে থেকে জানালেই পারতো। আর ওই মহিলাটাই বা কে? সকলকে আপ্যায়ন করবার অধিকারই বা কে ওকে দিলে? আগে তো কখনও ইন্দ্রনাথ ওকে এ-বাড়িতে ছ্যাখেনি!

সুদীপ মনে মনে যেন বাবার আসার খবর পেয়ে খুব বিব্রত হয়েছে মনে হলো। অন্যদিন তো এমন তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসেনা বাবা। আজ এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লো কেন?

—শীগগির বাবুকে পেছনের ঘরে নিয়ে যা—

—পেছনের কোন্ ঘরে?

সুদীপ বললে—ওই যে পেছনে গ্যারেজে একটা ছোট ঘর আছে, সেই ঘরে—

রূপলাল যেন হতবাক হয়ে গেল সাহেবের কথা শুনে।

বললে—সে-ঘরে তো পাখা নেই, শোবার খাট নেই—

—মিছিমিছি বকবক করিসনি। যা বলছি তাই কর গিয়ে—

কথাগুলো রূপলালকে বলা হলেও ইন্দ্রনাথের কানেও এলো। সাহেবের কথাগুলো শেষ হলেই রূপলাল বাবুর কাছে এসে দাঁড়ালো।

ইন্দ্রনাথ অন্যদিন বাড়িতে এসেই সোজা এই বাইরের ঘরে ঢুকে পড়ে। তখন ইন্দ্রনাথকে আপ্যায়ন করে ওই রূপলালই। আরো অনেক ভৃত্য, কাজের লোক আছে। বাগান দেখাশোনা করবার জন্যেও আলাদা লোক মজুত আছে। বাড়ি-ঘর ঝাড়ামোছা করবার জন্যে লোকেরও কমতি নেই, যেমন রান্না করার জন্যেও কোন লোকের

কমতি নেই।

রূপলাল বাইরে এসে বললে—আসুন বাবু, আমার সঙ্গে আসুন—

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবো রে?

—আজ্ঞে, সাহেব আপনাকে নিয়ে বাড়ির পেছনদিকের ঘরে যেতে বলেছে।

ইন্দ্রনাথ রূপলালের পেছনে যেতে যেতে বললে—পেছনের দিকের ঘরে? কেন?

—বাইরের ঘরে এখন সবাই খানা-পিনা করছে।

—খানা-পিনা করছে তো আমার ঘরে কী হলো?

রূপলাল বললে—আপনার ঘরে মেম-সাহেবরা রয়েছে।

—মেম-সাহেবরা মানে?

—আজ্ঞে, সাহেব যে বিয়ে করে এনেছে মেমসাহেবকে। মেমসাহেবের বাড়ির যারা মেমসাহেব তারা সে-ঘরে খানা-পিনা করছে।

—সাহেব বিয়ে করেছে?

—হ্যাঁ, বাবু!

—বলছিস কী তুই?

রূপলাল বললে—হ্যাঁ বাবু, সাহেব বিয়ে করে মেমসাহেবকে ঘরে নিয়ে এসেছে! তার সঙ্গে বাবুরাও বাড়িতে এসেছে। সাহেবের শ্বশুরবাড়ির বিবিরাও অনেকে এসেছে। সারা বাড়ি আজকে লোকে লোকে ভর্তি!

আশ্চর্য! ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে—কখন এলো সবাই?

রূপলাল বললে—আজ দুপুরবেলা।

ইন্দ্রনাথ বলে উঠলো—কিন্তু তোর সাহেব তো আমারই ছেলে, তার বিয়ে হলো আর আমি কিছু জানতে পারলুম না?

রূপলাল বললে—আমিও তো জানতুম না বাবু। দুপুরবেলা সাহেব

মেমসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হওয়ার পর আমাকে বললে—আজ দশ-বারোজন সাহেব-মেম আসবে বে রূপলাল, তারা এখানে খাবে। তুই সব-কিছু দেখিস—

—তারপর?

রূপলাল বললে—তারপর আমি তাড়াতাড়ি হোটেলে গিয়ে খবর দিয়ে তাদের কাছে টাকা জমা দিয়ে দিলাম।

—কোন্ হোটেলে?

—ওই-যে গড়িয়াহাটার মোড়ে যে নতুন একটা হোটেল হয়েছে, সেখানেই—

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে—কত টাকা জমা দিলি?

—সাহেব আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল। তারা যা-টাকা চাইলে তাই-ই আমি জমা দিয়ে এলাম। তারা কথা দিলে যে সন্ধ্যে সাতটার সময়ে পনেরা জনের মতো খাবার-দাবার আমাদের বাড়িতে দিয়ে যাবে। তারপর তারা ঠিক সময় মতোই খাবার দিয়ে গেল গাড়ি করে।

—তারপর?

—তারপর সাহেব আমাকে বললে যে আজ বড়োবাবু এলে আর এ-ঘরে নিয়ে আসিসনি।

কথাগুলো সবই কান পেতে শুনলো ইন্দ্রনাথ।

রূপলাল বললে—আপনি বসুন এখানে হুজুর, আমি আসছি—

ইন্দ্রনাথ বললে—এ-ঘরে বসবার তো চেয়ার-টেয়ার কিছু নেই। একটা টুল-ঠুল কিছু দিয়ে যা—আর শোবোই বা কোথায়? এ-ঘরে তো খাট-বিছানা কিছুই নেই—

রূপলাল বললে—আমি পরে সব দিয়ে যাবো। এখন সাহেব-মেমসাহেবদের কারো খাওয়া-দাওয়া হয়নি। সাহেবের শ্বশুরবাড়ির লোকজনরাও এসেছে। তারা আজ এ-বাড়িতেই থাকবে। তাদের

সকলকে দেখাশোনা করতে হবে একলা আমাকেই। আমি আসি—বলে রূপলাল আর দেরি করলে না। ঘর ছেড়ে সে চলে গেল।

ইন্দ্রনাথ সেই ঘরের মধ্যেই চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তার অতো টাকা থাকা সত্ত্বেও যে একদিন এমন অবস্থা হবে, তা ইন্দ্রনাথ কল্পনাও করতে পারেনি।

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মনে হলো—অন্ধকারেরও যেন চোখ আছে। যেমন কথায় বলে দেওয়ালেরও কান আছে। এ-ও যেন সেইরকম।

ইন্দ্রনাথের মনে হলো অন্ধকারের মধ্যে যেন দুটো চোখ স্পষ্ট ভেসে উঠলো।

ইন্দ্রনাথ মনে মনে চিৎকার করে উঠলো—কে তুমি? কে? কে তুমি বলো?

চোখ-দুটোর ভেতর থেকে একটা মেয়েমানুষের গলার স্বর বেরিয়ে এলো।

বললে—আমি! আমি বীণা।

—বীণা—তুমি? তুমি এখন কোথা থেকে এলে?

হঠাৎ বীণা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

—হাসছো যে?

বীণা বললে—হাসবো না? তুমিই তো বলেছিলে যে তোমার টাকা আছে, তোমার ভয় কী? এখন? এখন কী হলো?

ইন্দ্রনাথ বলে উঠলো—তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? এসো না আমার কাছে!

আবার চোখ-দুটো খিলখিল করে হেসে উঠলো।

ইন্দ্রনাথ আবার বললে—আবার তুমি হাসছো?

—হাসবো না, তো কাঁদবো? তখন তো তুমি আমার কথা শুনতে না। তুমি বলতে আমার লেখাপড়া জানা ছেলে রয়েছে, আমার ভাবনা কী? বুড়ো বয়েসে আমার ছেলেই আমাদের দেখবে। তা এখন?

ছেলে তো তোমার এখনও রয়েছে। তাহলে তুমি কাঁদছো কেন? তোমার বাড়ি, তোমার শোবার ঘর, সে-সব কোথায় গেল? সে-সব তো এখন পরের বাড়ির লোক দখল করে নিয়েছে। তোমার টাকা তোমাকে বাঁচাতে পারলো?

ইন্দ্রনাথ তখনও হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

একবার ডাকলো—তুমি কোথায়? কোথা থেকে কথা বলছো তুমি?

চোখ-ছুটো তখনও অন্ধকারের মধ্যে হাসছে!

হাসতে-হাসতেই বলতে লাগলো—তুমি তো অন্য বাড়ির ভাড়াটে-দের বাড়ি থেকে উৎখাত করে সস্তা দামে কিনে, মোটা দামে অন্য লোককে বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছো। তখন আমি বলিনি যে তারা একদিন তোমাকে অভিশাপ দেবে? তখন বলিনি তোমার ছেলেকে অতো ভালোবেসো না?

ইন্দ্রনাথ বললে—নিজের ছেলেকে ভালোবাসবো না তো কাকে ভালোবাসবো? ছেলে কি আমাদের পর?

চোখ-ছুটো বললে—হ্যাঁ, পর। আজকালকার যুগে ছেলেও নিজেদের নয়।

ইন্দ্রনাথ বললে—ছেলে যদি নিজেদের না হয়, কে তাহলে আপন?

—একমাত্র আপন হলো টাকা। যা টাকা তুমি উপায় করেছো সবই তুমি ছেলেকে দিয়ে দিয়েছো। কেন দিলে?

ইন্দ্রনাথ বললে—দিয়েছি ইনকাম-ট্যাক্সের জন্যে। মরে যাওয়ার পর অতো টাকা রেখে গেলে তো এস্টেট-ডিউটিতে চলে যাবে!

—তার মানে?

—তার মানে ডেথ-ট্যাক্সের ভয়ে।

চোখ-ছুটো আবার জোরে জোরে হাসতে লাগলো।

বললে—কিন্তু যে-সব কালো টাকা তোমার কাছে ছিল সেগুলোও কেন সুদীপকে দিতে গেলে? সেও তো অনেক টাকা, প্রায় আশি-

নব্বই লাখ টাকা। সেগুলো ?

এর আর কোনও জবাব বেরোল না ইন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে।

ঌঌঌ

গল্প বলতে বলতে করমচাঁদ থামলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—ইন্দ্রনাথের বাড়ির হাঁড়ির এত খবর তুই জানলি কি করে ?

করমচাঁদ বললে—সে এক অদ্ভুত কাণ্ড ভাই—

—কী রকম ?

করমচাঁদ বললে—আমার যে ড্রাইভার আছে তার নাম সুখলাল। ইন্দ্রনাথের বাড়ির চাকর রূপলাল তার আপন ভাই—

—সেকি রে !

—হ্যাঁ, আমি আগে জানতুম না। আমি যেদিন প্রথম ইন্দ্রনাথের বাড়িতে যাই, সেইদিন বাইরে বেরিয়ে আসবার পর সুখলালই আমাকে বললে যে তার ভাই রূপলাল এই বাড়িতেই চাকরি করে।

—তারপর ?

—তারপর আর কী, সেই সুখলালকে তার ভাই সব কথাই বলেছে। কী করে ইন্দ্রনাথ তার ছেলেকে মানুষ করেছে। বিয়ে করার পর ইন্দ্রনাথ আর তার বউ তাদের একমাত্র ছেলেকে কেমন করে রাজার আদরে মানুষ করেছে। তাকে কতো বড়ো ইংরিজী-স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়েছে। ছেলেকে মানুষ করার জন্যে কতো বড়ো বড়ো মাস্টার রেখেছে, ছেলের পেছনে কতো হাজার-হাজার টাকা খরচ করেছে। সব খবরই রূপলাল বলেছে। আর ইন্দ্রনাথ কেবল দিন-রাত মামলা-মকর্দমা করে টাকা উপায় করার ধান্দা নিয়ে মেতে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত একদিন যখন ইন্দ্রনাথের স্ত্রী মারা গেল সেদিনও তার ছেলে বাড়িতে ছিল না। সে তখন কোন্ এক ককটেল-পার্টি থেকে মদ খেয়ে

রাত একটার সময় বাড়ি ফিরেছে—

আমি সব শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—তাই নাকি?

করমর্চাদ বললে—হ্যাঁ, প্রথমটায় আমারও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু রূপলাল কেন মিথ্যে কথা বলতে যাবে, মিথ্যে কথা বলে তো তার কোনও লাভ নেই। নিজের ভাইকেই সে এসব কথা বলেছে। অন্য কোনো বাইরের লোককে তো সে বলেনি।

—ইন্দ্রনাথ ছেলেকে সেজন্যে কিছু বলেনি?

—বলবে আবার কী। ইন্দ্রনাথের তো ওই একই ছেলে। ইন্দ্র-নাথ তো ছেলে-অন্ত প্রাণ! ছেলে তো কলেজে ভালো ছেলের দলে। কখনও পরীক্ষায় ফেল করেনি। ফার্স্ট-সেকেণ্ড-থার্ডের মধ্যে থেকেছে!

সেই ছেলে যদি কক্‌টেল-পার্টিতে যায়, সেটা তো গৌরবেরই ব্যাপার। তার ছেলে এমন সমাজে মেশে যেখানে কক্‌টেল-পার্টিটা মর্যাদার লক্ষণ বলে গণ্য। গরীব লোকেরা মদ খায়, সেই মদ খেয়ে মাতলামি করলে পুলিশে ধরে। কিন্তু সমাজের যারা মাথা তারা তো মদ খায় না, কক্‌টেল খায়। সেটা এ্যারিসটোক্রেসির চিহ্ন।

কিন্তু এতদিন ছেলে যা-কিছু করেছে তাতে ইন্দ্রনাথের কখনও আপত্তি হয়নি। আপত্তি হলো সেইদিনই যখন রূপলাল তাকে বাইরের ঘরে ঢুকতে না দিয়ে বাড়ির পেছনের একটা ঘরে পুরে দিয়ে বাইরে চলে গেল। বলে গেল—আমি পরে আসবো—

কিন্তু কোথায় রূপলাল?

সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর রূপলাল একসময়ে এলো।

বললে—এই নিন হুজুর, আমি আপনার খাবার এনেছি—

ইন্দ্রনাথ বললে—একটা আলো আনলি না?

রূপলাল বললে—কেন, এ-ঘরের আলো কী হলো?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমি তো সুইচ্ টিপেছি, তবু আলো জ্বলছে না।

রূপলাল বললে—তাহলে বাল্বটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। এ-ঘরে তো কেউ থাকে না, তাই কেউ জানতে পারেনি। আপনি এই থালাটা একটু ধরুন, আমি অন্য ঘর থেকে একটা ভালো বাল্ব নিয়ে আসছি।

বলে চলে গেল রূপলাল।

ইন্দ্রনাথ সেই খাবারের থালাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ, আর শেষ পর্যন্ত রূপলাল সত্যিই একটা বাল্ব লাগিয়ে দিতেই ঘরটা আলোয় আলো হয়ে গেল।

সে-ঘরটা অনেকদিন ব্যবহার হয়নি। ঘরের মধ্যে একটা খাট ছিল, তাও খোলা। সেই খাটে যদি শুতে হয় তো সেটাকে জোড়া লাগিয়ে ব্যবহারযোগ্য করতে হবে।

ইন্দ্রনাথ দেখলে খাবার প্লেটে অনেকরকম খাবার সাজানো রয়েছে। ইন্দ্রনাথ এত রকমের খাবার রাত্রে খায় না। এসব খাইয়ে ছেলে বন্ধু-বান্ধব আর শ্বশুরবাড়ির লোকদের বোধহয় নিজের ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন দিতে চাইছে।

রূপলাল কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

বললে—হুজুর খান, খেয়ে নিন্—

ইন্দ্রনাথের তখন খাওয়ার মতো মানসিকতা নেই।

বললে—আমি এসব খাবো না। তুই এসব নিয়ে যা—

রূপলাল বললে—তাহলে আপনি কী খাবেন?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমি যা রোজ খাই তা-ই খাবো।

—কিন্তু আজকে রুটি-তরকারি কিছুই রান্না হয়নি।

ইন্দ্রনাথ বললে—তাহলে এসব নিয়ে যা।

রূপলাল খুব অনুগত ভৃত্য।

সে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে রইলো।

তারপর বললে—আপনি কিছুই খাবেন না?

—না।

—তাহলে দোকান থেকে রুটি-তরকারি নিয়ে আসবো?

—তাই আন্!

বলে পকেট থেকে দু'টো টাকা বার করলে।

বললে—যা, এই দু'টাকার মধ্যে যা পাওয়া যায় তা-ই কিনে আন্। আমি আজকের এই খাবার কিছুই ছোঁব না।

রূপলাল কী করবে বুঝতে পারলে না।

ইন্দ্রনাথ আবার বললে—কই, কথা শুনছিস না যে? খাবার কিনে নিয়ে আয়!

রূপলাল বললে—সাহেব যদি জানতে পারে আপনি এ-বাড়ির খাবার খাননি তাহলে কিন্তু আমাকে খুব বকবে।

ইন্দ্রনাথ রেগে গেল খুব।

বললে—তা তুই আমার চাকর, না আমার ছেলের চাকর? কে তোর মনিব, বল্?

রূপলাল কিছু জবাব দিলে না।

ইন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কথা বলছিস না যে? বল্, কে তোর মনিব?

রূপলাল ভয়ে ভয়ে বললে—হুজুর, আপনিই আমার মালিক—

—তাহলে আমি যা বলছি তাই কর। দোকান থেকে আমার জন্যে রুটি-তরকারি এনে দে।

হঠাৎ ভেতর-বাড়ি থেকে সাহেবের গলা শোনা গেল। সাহেব রূপলালকে ডাকছে।

—এই রূপলাল, কোথায় গেলি তুই? রূপলাল—

রূপলাল চাকরি যাওয়ার ভয়ে চিৎকার করে উঠলো—যাই, সাহেব—

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল।

তখন সেই নিঃসঙ্গ ঘরের মধ্যে ইন্দ্রনাথ একলা চুপ করে বসে রইলো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই চোখ-দুটো! চোখ-দুটো তখন আবার হেসে উঠলো।

—কী হলো? আবার কী ভাবছো তুমি?

ইন্দ্রনাথ বললে—দেখ, তুমিই দেখ এত টাকা থাকতেও আমার কী দশা হয়েছে! আমার নিজের ঘর থাকতেও আমার আজ থাকবার ঘর নেই।

—বেশ হয়েছে! তোমার খুব শিক্ষা হয়েছে! তুমি কতো লোককে ঘর-ছাড়া করেছো মনে নেই? তাদের অভিশাপ মনে করেছো তোমার ওপর লাগবে না? তারা তোমার সামনে কতো কেঁদেছে। তখন তো তুমি তাদের কথায় কান দাওনি!

ইন্দ্রনাথ বললে—কিন্তু তুমিই তো বলতে আমাদের একটা ছেলে। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, মাত্র একটা ছেলে, তাকে মনের মতো মানুষ করে তুললে শেষজীবনে আমাদের দু'জন বুড়ো-বুড়ীকে সেই-ই দেখবে। বলোনি?

চোখ-দুটো আবার বললে—কোথায় মানুষ করেছো? ওকে কি মানুষ হওয়া বলে? তুমি তো সারা জীবন মামলা-মকর্দমা করে অন্য লোকদের ভিটে-মাটি-ছাড়া করলে? ছেলের জন্যে কখনও সময় খরচ করেছ?

এ-কথার কোনো জবাব দিলে না ইন্দ্রনাথ।

বললে—ও তো ওকালতি পাস করেছে, এ্যাডভোকেট হয়েছে, অমানুষ তো হয়নি ও—

চোখ-দুটো বললে—তোমার নিজের সমস্ত টাকা ছেলের হাতে তুলে দিতে গেলে কেন?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমার কাছে থাকলে যে ইনকাম-ট্যাক্সের লোক ধরবে। টাকা নিজের কাছে রাখবারও বুদ্ধি দরকার হয়। আমি সারা জীবন টাকা উপায় করার বিদ্যেটা শিখেছি, কিন্তু টাকা রাখবার বিদ্যেটা তো শিখিনি। ওটাও যে একটা বিদ্যে তা তখন জানতুম না। তাই ছেলের হাতেই সব টাকা বরাবর তুলে দিয়েছি—

এসব কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ আবার রূপলাল ঢুকলো।

ইন্দ্রনাথ বললে—কী রে, ওরা সবাই গিয়েছে?

রূপলাল বললে—না হুজুর, এখনও কেউ যায়নি। দু'চারজন ছাড়া আর-সবাই আছে। এই নিন, আমি হোটেল থেকে আপনার জন্যে রুটি-তরকারি এনেছি, আপনি খেয়ে নিন—

বলে একটা টুলের ওপর রূপলাল খাবারটা রাখলো।

ইন্দ্রনাথ বললে—খাবার তো আনলি, কিন্তু আমি শোব কোথায়?

রূপলাল বললে—আমি আমার খাটিয়াটা এনে দিচ্ছি, তাতে শোবেন?

ইন্দ্রনাথ বললে—তাই-ই দে—শুতে তো হবে!

তারপর রূপলাল তাই-ই করলে। কোথা থেকে তার একটা খাটিয়া সে এনে দিলে!

বললে—আজকে এখানেই শুয়ে থাকুন। কালকে আমি অন্য ব্যবস্থা করে দেবো।

বলে সে বাইরে চলে গেল।

১১১

করমচাঁদ কথা বলতে বলতে থামলো।

তারপর বললে—আমার ড্রাইভার সুখলালের কাছে এইসব কথা শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না ভাই। আমি তাই একদিন গেলাম ইন্দ্রনাথের বাড়ি। আগে কতোবার সেই বাড়িতে গিয়েছি

আমরা। তুই তো জানিস সেইসব কথা। মনে আছে ইন্দ্রনাথের বাড়ির সেই বাহার দেখে আমাদের কতো হিংসে হয়েছে? ভাবতুম কতো সুখে আছে সে, কতো আরামে আছে। তারপর যখন তার ছেলের অন্নপ্রাশন হলো তখনও গিয়ে দেখেছি কী সে জাঁক-জমক! তারপর আবার যখন ইন্দ্রনাথের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তার শ্রাদ্ধের দিনে গেলাম তখন অবশ্য কোনো জাঁক-জমক ছিল না। আবার যখন তার ছেলে বি-এ পরীক্ষায় ইংরিজীতে অনার্স নিয়ে পাস করলো তখনও আমাদের সকলকে নেমন্তন্ন করে পার্টি দিলে। সব মনে আছে তো তোর? মনে আছে ইন্দ্রনাথ সেদিন বলেছিল যে, সে ছেলের বিয়ের সময়ে এমন পার্টি দেবে সে, যা দেখে কলকাতার লোক চম্‌কে উঠবে। সে-সব কথা নিশ্চয়ই মনে আছে—

বললাম—খুব মনে আছে!

—তা সেই ইন্দ্রনাথকে অনেকদিন পরে দেখে আমার সেইসব কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো। ভাবলাম সেইসব কথা তাকে মনে করিয়ে দিই। মনে করিয়ে দিই যে বেশি অহঙ্কার ভালো নয়। কিন্তু ভাবলাম মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে লাভ নেই। শুধু বললাম—তোর এ-দশা হলো কেন?

ইন্দ্রনাথ বললে—এর জন্যে কেউ-ই দায়ী নয়। দায়ী আমি নিজেই—

—জিজ্ঞেস করলাম—কেন?

—ভাই, আমি ছেলেকে বড্ড বেশি ভালোবাসতুম, এইটেই হয়েছিল আমার দোষ। আমি আমার ছেলের দোষ দেখতে পেতাম না। বেশি টাকা হলে বোধহয় এইরকমই হয়। আমার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা ছিল। আমি সেইসব টাকা ছেলের কাছে গচ্ছিত রাখতাম। ভাবতাম আমার ছেলে যখন এত ইন্‌টেলিজেন্ট তখন সে নিশ্চয়ই তা সামলাতে পারবে। আমার স্ত্রীর যতো গয়না ছিল, সে-সব প্রায় সবই ছেলেকে

দিয়ে দিয়েছিলাম।

আমি বললাম—ছেলেকে দিলি কেন?

ইন্দ্রনাথ বললে—তখন কি জানি সেই ছেলে এমন হবে? আমি-আমার মনের মতো করেই ছেলেকে মানুষ করেছিলাম।

—কিন্তু সেই ছেলে এমন বিগড়ে গেল কেন?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমারই ভুল হয়েছিল, তাই—

—কী ভুল?

ইন্দ্রনাথ বললে—ছোটবেলা থেকেই তার নামে অনেক টাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। এখন বুঝছি বেশি টাকা থাকা খারাপ!

—কেন? খারাপ কেন? তোরও তো অনেক টাকা ছিল। তুই তো খারাপ হোস্‌নি।

ইন্দ্রনাথ বললে—আরে, সে-টাকার সঙ্গে এ-টাকার অনেক তফাত।

—কেন?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমার বাবার ছিল সাদা টাকা, কিন্তু আমি যে-টাকা উপায় করেছি সে-টাকা ছিল কালো টাকা। সাদা টাকার সঙ্গে কালো টাকার অনেক তফাত।

—কেন? তফাতটা কী?

ইন্দ্রনাথ বললে—কালো টাকা তো কেউ বাড়িতে জমায় না। সে-টাকা দিয়ে লোকে গয়না গড়ায়। দেখছিস না, আজকাল সোনার দাম যতো বাড়ছে, কলকাতা শহরে ততো গয়নার দোকান হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় এত গয়নার দোকান হওয়ার কারণটা কী? অথচ মহিলারা কি আজকাল কেউ সোনা-মুক্তো-হীরের গয়না প'রে রাস্তা-ঘাটে বেরোয়? সবাই পরে গিলটির গয়না। তাহলে কেন এত সোনার গয়নার দোকান সৃষ্টি হচ্ছে?

আমি বললাম—ওই কালো টাকা সাদা করবার জন্যে?

ইন্দ্রনাথ বললে—না।

—তাহলে ?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমার ছেলে সেই টাকা নিয়ে বড়ো বড়ো সোসাইটিতে গিয়ে মিশে জাতে ওঠবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো ! টাকা না থাকলে, ও তাদের সঙ্গে মেশবার সুবিধেও পেত না, আমারও তাহলে এত দুর্দশা হতো না—

—তারপর ?

ইন্দ্রনাথ বলতে লাগলো—তারপর কী হলো তা তো তুই দেখতেই পাচ্ছিস। এই দ্যাখ্-না এত বেলা হলো এখনও পর্যন্ত আমাকে এক কাপ চাও খেতে দেয়নি !

—কেন এরকম হলো ? তোর রূপলাল কী করতে আছে ?

ইন্দ্রনাথ বললে—আরে, এখন রূপলাল তো আর আমার চাকর নয়। সে এখন মেমসাহেবের চাকর। মেমসাহেবের হুকুম ছাড়া তো আর কিছু করতে পারে না, সে মেমসাহেবের হুকুম তামিল করবে, না আমার কাজ করবে ?

করমচাঁদ আবার বলতে লাগলো—তা বাড়িতে তো সকালে সকলের জন্যেই চা হয় ?

ইন্দ্রনাথ বললে—সকলের জন্যেই হয়, কেবল আমার জন্যেই হয় না।

—কেন ?

ইন্দ্রনাথ বললে—এইটেই রূপলালের মেমসাহেবের হুকুম ! সবাই চায়, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।

—তা এই অবস্থায় তুই এখনও এ-বাড়িতে পড়ে আছিস কেন ? এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেই পারিস ?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমি যে চলে যাবো, তা চলে যেতেও তো টাকা লাগে ! আমার টাকা কোথায় ?

—কেন ? তোর কোনো নিজের নামে টাকা নেই ?

ইন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে এবার জল পড়তে লাগলো।

বললে—সামান্য টাকা আছে। ডেথ-ট্যাক্সের ভয়ে আমি সব টাকা ছেলেকেই গিফ্‌ট্ করে দিয়েছি যে!

—কেন ছেলেকে দিলি?

ইন্দ্রনাথ বললে—দিলুম, যাতে আমি মারা যাওয়ার পর ছেলের ওপর চাপ না পড়ে। ইনকাম-ট্যাক্সের লোকেরা যাতে তার ওপর অত্যাচার না করে। এমনকি বীণার গয়নাগুলো পর্যন্ত ওকে দিয়ে দিয়েছি—

তারপর চোখের জলটা মুছে নিয়ে বললে—এই দ্যাখ্ না, যাতে বেশি টাকা খরচ না হয় তার জন্যে ঘরে একটা পাখা পর্যন্ত নেই। প্রথমে রূপলাল ছেলেকে বলে-কয়ে একটা পাখা লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মেমসাহেবের হুকুমে সেটা আবার খুলে নিয়ে গিয়েছে—

করমচাঁদ বললে—তা তোর এতবড়ো বাড়িতে তো অনেক ঘর রয়েছে। সেখানে থাকতে না দিয়ে এই ঘুপ্‌সি ঘরে তোকে রেখে দিয়েছে কেন?

ইন্দ্রনাথ বললে—কিন্তু সে-সব ঘর তো একটাও খালি নেই—

—কেন? সে-ঘরগুলো কি খালি পড়ে আছে?

ইন্দ্রনাথ বললে—খালি পড়ে থাকবে কেন, সে-সব ঘর তো ভর্তি হয়ে গেছে—

—কেন? কতো লোক আছে এ-বাড়িতে?

ইন্দ্রনাথ বললে—তা কি আমি দেখেছি? রূপলালের কাছে আমি যা শুনেছি তাই-ই বলছি। বাড়িতে একটা ঘরও খালি পড়ে নেই—

—সে-সব ঘরে কারা থাকে?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমি তো নিজের চোখে কিছু দেখিনি। রূপলাল যা বলেছে তা-ই শুনেছি।

—রূপলাল তোকে কী বলেছে?

—রূপলাল বলেছে তার সাহেবের শ্বশুর-শাশুড়ী, শালা-শালী সবাই এসে নাকি ঘর-টর দখল করে নিয়েছে।

করমচাঁদ বললে—তা তুই তোর ছেলের বউকে ডেকে একদিন সব কথা বলিস না কেন ? সব বুঝিয়ে বললেই পারিস ?

ইন্দ্রনাথ বললে—আমি আমার পুত্রবধূর সঙ্গে কথা বলবো ? কী বলছিস তুই ? তার তো কারো সঙ্গে কথা বলবার সময়ই নেই।

—কেন ? সময় নেই কেন ? সেও কি উকিল নাকি ?

—না না, উকিল হতে যাবে কেন। এমনিই সাধারণ একজন মেয়ে-মানুষ !

—তাহলে কথা বলবার সময় পায়না কেন ?

ইন্দ্রনাথ বললে—রূপলালের কাছে শুনেছি তার মেমসাহেব নাকি সকালবেলা সুইমিং-ক্লাবে যায়, তারপর সেখান থেকে এসে ব্রেকফাস্ট খায়। তারপর যায় 'বিউটি পারলারে'। সেখানে গিয়ে সাজগোজ করবে। সেখান থেকে ফিরে আসে দুপুর বারোটার সময় লাঞ্চ খেতে। তারপরে একটু রেস্ট। তখন কারো সঙ্গে কথা বলা বারণ। তারপর যাবে ক্লাবে—সেখানে আমার ছেলেও যাবে—

—তারপর ?

ইন্দ্রনাথ বললে—তারপর আমার কথা ভাববার আর সময় কখন হবে তাদের ? তাই আমাকে এই গুদাম-ঘরে রেখে দিয়েছে। আর আমিও দিনরাত কেবল শেষের দিন গুনছি—

কথা বলতে বলতে করমচাঁদ থামলো।

বললে—যাই এখন, আমার আবার অনেক কাজ। সারা কলকাতায় আমার বাড়ি তৈরি হচ্ছে। যেখানে না যাবো সেখানেই গোলমাল বাধবে ! যাই আমি—

বলে চলে গেল।

আমি বললাম—ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যদি তোর ড্রাইভারের কাছ থেকে

নতুন কোনো খবর পাস তো আমাকে জানাতে ভুলিসনি!

১১১

শুয়ে শুয়ে ভাবি যে এই ইন্দ্রনাথকে নিয়ে যদি কিছু লিখি তো কেমন হয়?

মৎস্য-পুরাণের সেই কথাটাও মনে পড়তে লাগলো। সেই যে তাতে লেখা আছে—"দশটা কুয়োর সমান হলো একটা পুকুর, দশটা পুকুরের সমান হলো একটা দীঘি, দশটা দীঘির সমান হলো একটা পুত্র···"

ইন্দ্রনাথেরও তো সেই একটা ছেলেই আছে—তাহলে এমন হলো কেন?

এর জন্যে কে দায়ী? তার ভাগ্যই কি দায়ী? না কি ওর ছেলেই দায়ী?

না কি ইন্দ্রনাথের টাকাই দায়ী?

আমি কিছু ভেবে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলুম না। একবার মনে হলো ইন্দ্রনাথই এর জন্যে দায়ী। ইন্দ্রনাথ তো সারা জীবন ধরে টাকাই চেয়ে এসেছে, পরমার্থটা কোনো দিনই চায়নি সে।

আবার ভাবলাম ইন্দ্রনাথের কী দোষ?

ইন্দ্রনাথ তো একলাই কেবল টাকা চায়নি। ইন্দ্রনাথের মতো ইণ্ডিয়ার কোটি-কোটি লোকই শুধু টাকাই চেয়ে এসেছে। তাদের কি সকলেই এই একই শাস্তি পাচ্ছে?

আর শুধু ইণ্ডিয়ার লোকরাই বা কেন, যে সমস্ত বড়োলোক দেশ, যেমন ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, সেখানেও তো সবাই ইন্দ্রনাথের মতো টাকাকেই ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম বলে ধরে নিয়েছে। তাহলে সেখানেও কি ইন্দ্রনাথের মতো লোকরা এই কষ্ট পাচ্ছে?

না, তা কেন হবে?

সেখানে তো 'ওল্ড-এজ-হোম' আছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'সিটিজেন্স রিটায়ারিং হোম'।

আর সেইজন্যেই বোধহয় সেখানকার ইন্দ্রনাথরা এত কষ্ট পায় না।

আর তাছাড়া এখানেও তো সেইরকম অল্প-অল্প করে হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা তো এখনও নগণ্য। এখন আমাদের মতো লোকের কী হবে?

সেদিন করমচাঁদ অনেক কাজের মধ্যেও যাবার পথে একবার আমার বাড়িতে এলো।

জিজ্ঞেস করলাম—কী খবর?

করমচাঁদ বললে—রূপলাল আমার ড্রাইভার সুখলালকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, তাই গিয়েছিলাম রে ইন্দ্রনাথের কাছে।

—কী খবর তার?

করমচাঁদ বললে—ইন্দ্রনাথ আর অতো কষ্ট সহ্য করতে পারছে না। আমাকে বললে একটা সস্তা ঘর ভাড়া করে দিতে। বললে—তুই তো জমি-বাড়ির ব্যবসা করিস, তা তার মধ্যে একটা ঘর ভাড়া করে দিতে পারিস? মাসে পঁচিশ টাকার বেশি ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

আমি তো শুনে অবাক।

যে-লোক পঁচিশ হাজার কেন, কম করে পঁচিশ লক্ষ কেন, পাঁচ কোটি টাকার মালিক ছিল, সে আজ আমার কাছে পঁচিশ টাকার বাড়ি ভাড়া চাইছে!

জিজ্ঞেস করলাম—তুই কী বললি?

করমচাঁদ বললে—আমিও ভাই টাকার পেছনে অনেক দৌড়ো-দৌড়ি করেছি। কিন্তু ইন্দ্রনাথের দশা দেখে আমার খুব দয়া হলো।

—কী ঠিক করলি?

করমচাঁদ বললে—আমি ঠিক করেছি আমি ইন্দ্রনাথকে একটা ছোট ঘর দেব। কিন্তু ভাড়া নেব না।

—বাড়িটা কোথায় ?

—পশ্চিম পুটিয়ারিতে। সেখানে আমি একটা বাড়ি তৈরি করছি, এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেখানে সব ফ্ল্যাটগুলোই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আমি ইন্দ্রনাথের জন্যে একতলায় একটা ঘর করে দেব, ঠিক করেছি—

বললাম—পশ্চিম পুটিয়ারিতে ? আরো কাছাকাছি একটা ঘর করে দিতে পারলি না ? সেখানে কি ইন্দ্রনাথ থাকতে পারবে ?

করমচাঁদ বললে—তা ছাড়া আর তো কোনও জায়গা খালি নেই। পঁচিশ টাকা ভাড়ায় এক ইঞ্চি জায়গাও কলকাতায় পাওয়া যাবে না। আর ও কিনা পঁচিশ টাকায় একটা ঘর ভাড়া করতে চাইছে!

বললাম—কবে তুই ওকে ঘরটা দিতে পারবি ?

করমচাঁদ বললে—কবে দেব বলতে পারছি না। তবে এক মাস দু'মাস তো লাগবেই—

—অতো দিন কি ও অপেক্ষা করতে পারবে ?

করমচাঁদ বললে—কিন্তু আমি কি করতে পারি ? ছ'মাস আগে যদি ও বলতো তাহলেও চেষ্টা করতে পারতুম। কিন্তু এখন যে আমার আরো ছ'টা বাড়ির কাজ একসঙ্গে চলছে !

—তাহলে ?

করমচাঁদ বললে—এখন দেখি কী করতে পারি !

বলে করমচাঁদ চলে যাচ্ছিল।

আমি তাকে বললাম—এর পরে যদি কোনদিন ইন্দ্রনাথের কাছে আবার যাস তো আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাস। অনেকদিন ওকে দেখিনি। একটু দেখা করে আসবো।

করমচাঁদ বললে—তাকে দেখে আর কী করবি ! দেখে শুধু তোর

দুঃখই হবে। তার চেহারা আর সেরকম নেই। এখন তাকে দেখতে গেলে সে আরো কাঁদবে। তার ক্ষিধে পেলেও আজকাল কেউ খেতে দেয় না। আগে তবু একটু-আধটু তাকে দেখতো, কিন্তু রূপলাল তো এখন নেই—

—কেন? রূপলাল কোথায় গেল?

—সে ক'দিনের জন্যে দেশে গিয়েছিল। সেখান থেকে সে আর ফেরেনি। মারা গেছে—

—তাহলে এখন কে তাকে দেখছে?

করমচাঁদ বললে—কেউ না, ঘর থেকে বসে বসেই ইন্দ্রনাথ চেঁচায়। যার নাম মনে পড়ে তাকেই ডাকে। কেউ যদি শুনতে পায় তো আসে। তখন খাবার দিয়ে যায়। আর না-হয় তো খেতে দেয়ই না। সেইজন্যেই তো এত তাড়তাড়ি করছে ও। অন্য বাড়িতে থাকলে অন্ততঃ ঠিক সময়মতো সে তাকে খেতে দেবে।

বললাম—তা ইন্দ্রনাথ নিজের নামে কোনও টাকাই রাখেনি?

করমচাঁদ বললে—রেখেছে নিশ্চয়ই। তা না হলে কোন্ ভরসায় পঁচিশ টাকা দিয়ে ঘরভাড়া নিতে চাইছে! শুধু তো ঘরভাড়া নয়, তার ওপর চাকরকে মাইনেও দিতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার জন্যেও আজকালকার বাজারে মোটা খরচ আছে। সে সব খরচ চালাবে কী করে?

এ-কথা শোনার পর আমার আর বলবার কী থাকতে পারে?

তবু বললাম—ইন্দ্রনাথের এত বুদ্ধি ছিল, আর এইটুকু বুদ্ধি ছিল না যে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, কিংবা স্ত্রীই হোক, টাকার ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই।

করমচাঁদ বললে—সে বিশ্বাস থাকলে কি আর শেষজীবনে তার এই কষ্ট হয়?

বললাম—আমি যেদিন যাবো সেদিন ওকে এই কথাটা জিজ্ঞেস

করবো যে সে কি এই পৃথিবীতে বাস করে না, না কি সে সেই পৌরাণিক যুগে বাস করে। এটা তার বোঝা উচিত ছিল যে এটা কলি-যুগ। এখানে টাকাকে হাত-ছাড়া করতে নেই। স্ত্রী ত্যাগ করা চলে, ছেলে-মেয়েকে ত্যাগ করলেও কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু টাকাই এ-যুগে ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম, টাকাই এ-যুগে সব-কিছু—

—এসব কথা আর এখন ওকে বলে কী হবে? যখন একটার পর একটা ভাড়াটে বাড়ি সস্তাদরে কিনেছে আর মামলা করে ভাড়াটেদের ওঠিয়ে মোটা দরে সেই বাড়িগুলো বেচেছে, তখন তো এসব কথা একবারও ভাবেনি!

যা হোক, করমচাঁদ তখন আর দাঁড়ায়নি। তারও নিজের অনেক কাজ। পরের কথা অতো ভাবতে গেলে তার নিজের কাজ অচল হয়ে যাবে।

সে চলে গেল।

যাওয়ার সময়ে বলে গেল—এর পরে যেদিন আমার পশ্চিম পুটিয়ারির বাড়িটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সেদিন ওর বাড়ি থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাবো সেখানে। সেদিন তোকেও আমার সঙ্গে ওর বাড়িতে নিয়ে যাবো—ও তোর সঙ্গেও একবার দেখা করতে চায়—

১১১

মানুষের জীবন নিয়েই একদিন পৃথিবীতে উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছিল।

সেটা ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা।

তারপর সাহিত্য সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তালে তাল মিলিয়ে অনেক দূরে এগিয়েছে।

কিন্তু প্রথম বাধা এলো বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটার পব থেকেই!

সেই কথাগুলোই বলি।

করমচাঁদ সেদিন এসেই বললে—চল্, ইন্দ্রনাথদের বাড়িতে যাই—

—তার বাড়ি ঠিক করে ফেলেছিস? সেই পশ্চিম পুটিয়ারিতে?

—হ্যাঁ, আমি ঠিক করেছি ইন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমি কোনো ভাড়া নেব না। আজই আমি সেখানে ওকে নিয়ে যাবো—

জিজ্ঞেস করলাম—আর তার কাজকর্ম কে করবে? তার রূপলাল তো মারা গেছে বললি—

করমচাঁদ বললে—সুখলালকে বলে আর একটা লোক যোগাড় করেছি। তাকে সকালবেলাই পশ্চিম পুটিয়ারির বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছি। সে সুখলালের খুব বিশ্বাসী লোক। তার হাতে টাকাও দিয়ে এসেছি। ইন্দ্রনাথকে নিয়ে সেখানকার বাড়িতে পৌঁছোবার পরেই যাতে ইন্দ্রনাথের জন্যে ভাত ডাল, একটা তরকারি রেঁধে রাখতে পারে। ইন্দ্রনাথও চান-টান করে এতক্ষণে তৈরি হয়ে আছে। আমরা গেলেই তার মালপত্র নিয়ে তাকে তুলে নেব। তুলে নিয়ে একেবারে পশ্চিম পুটিয়ারির বাড়িতে নামিয়ে দেব।

বললাম—তার ছেলে আর পুত্রবধূ আপত্তি করবে না তো?

—আপত্তি? বলছিস কী তুই? তারা তো বেঁচে যাবে রে। বুড়োটাকে বাড়িতে আর পুষতে হবে না, খাওয়া-দাওয়ার খরচ-খরচাও আর করতে হবে না।

মনটা বড়ো বিষণ্ন হয়ে পড়লো ইন্দ্রনাথের দুঃখের কথা শুনে।

বললাম—জানিস, 'মৎস্য-পুরাণে' পড়েছি—দশটা কুয়োর সমান হলো একটা পুকুর, দশটা পুকুরের সমান হলো একটা দীঘি। দশটা দীঘির সমান হলো একটা পুত্র···সেই একটা ছেলেই কিনা বাপকে এমন করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে!

করমচাঁদ এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

বললাম—ত্যাখ, আমার মনে হচ্ছে মানুষ বোধহয় আজ আবার

আরশোলা হয়ে গেছে।

—আরশোলা ?

করমচাঁদ বোধহয় কথাটা বুঝতে পারলে না।

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম। বললাম—আজ থেকে কুড়ি কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতে প্রথম আরশোলার আবির্ভাব হয়। আরশোলা নোংরা অন্ধকার জায়গাতেই থাকতে ভালোবাসে। সেই কুড়ি কোটি বছর পরে আজকের মানুষও তাই। আরশোলা যে শুধু নোংরা অন্ধকার জায়গাতে থাকতে ভালোবাসে তাই-ই নয়। তাদের হাব-ভাব, ব্যবহার, চাল-চলনও নোংরা। আজ মানুষও আবার সেই কুড়ি কোটি বছর আগেকার আমলে ফিরে গেছে। সেও আজ নোংরা মনের অধিকারী হয়ে গিয়েছে। আজ ইন্দ্রনাথের ছেলে বাপকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আবার এমন একদিন আসছে যখন তোর ছেলেরাও একদিন তুই বুড়ো হয়ে গেলে তোকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে, আমার ছেলে থাকলে আমাকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত। দেখে নিস পৃথিবীতে যতো ছেলে আছে তারা সব বুড়ো বাবাদের ইন্দ্রনাথের ছেলের মতো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। সব দেখে-শুনে মনে হয় মানুষ আবার বুঝি কুড়ি কোটি বছর আগে পেছিয়ে যাবে—। সেই কুড়ি কোটি বছর আগে যখন পৃথিবীতে জীব বলতে শুধু আরশোলাই ছিল, আর কিছু ছিল না—

এতক্ষণ ধরে করমচাঁদ আমার কথাগুলো একমনে শুনে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনো উত্তর দিচ্ছিল না। গাড়িটা তখনও সমান গতিতে ইন্দ্রনাথের বাড়ি লক্ষ্য করে ছুটে চলছিল।

আর, তা ছাড়া বলবার কী-ই বা ছিল আমাদের!

যখন ইন্দ্রনাথের বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন লোহার গেট বন্ধ করে দরোয়ান পাহারা দিচ্ছিল।

আমরা এগোচ্ছি দেখে দরোয়ান বাধা দিলে।

বললে—সাহেব ভেতরে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে হুজুর !

করমচাঁদ বললে—আমাকে চিনতে পারছো না ? তোমার সাহেবকে গিয়ে বলো সাহেবের বাবা ইন্দ্রনাথবাবুকে দেখতে এসেছি আমরা—

দরোয়ানের কী মর্জি হলো কে জানে ! গেট-বন্ধ-করা অবস্থায় ভেতরে গিয়ে সাহেবের অনুমতি নিয়ে ফিরে এলো। তারপর গেট খুলে দিলে।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

সামনের ড্রয়িং-রুমের পাশ কাটিয়ে যখন বাড়িব পেছনদিকে গেলাম তখন দেখলাম ইন্দ্রনাথের ঘরের দরজা ভেতর থেকে খিল-বন্ধ রয়েছে !

করমচাঁদ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো।

বললে—ইন্দ্রনাথ, দরজা খুলে দে। আমি করমচাঁদ রে ! দরজা খোল। তোকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি—

কিন্তু কোনো উত্তর এলো না ভেতর থেকে।

আবার করমচাঁদ দরজা ঠেলতে লাগলো।

আবার করমচাঁদ ডাকতে লাগলো—

—ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ--

তবু কোনো সাড়া নেই।

আবার ডাক—ইন্দ্রনাথ, ওরে ইন্দ্রনাথ ! আমি করমচাঁদ এসেছি রে, তোকে নিয়ে যেতে এসেছি—

তবু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

—ওরে ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ—

করমচাঁদ শেষকালে হতাশ হয়ে গেল।

বললে—কী হলো ? ইন্দ্রনাথ সাড়া দিচ্ছে না কেন ?

বলে আবার দরজায় ঘা দিতে লাগলো।

সেই শব্দ শুনে বাড়ির আরো দু'একজন চাকর এগিয়ে এলো।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো বাবু? দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন কেন?

করমচাঁদ বললে—ভেতরে তো ইন্দ্রনাথবাবু থাকেন, আমরা তাঁর বন্ধু। তাঁর খোঁজ নিতে এসেছি, ইন্দ্রনাথবাবু আজকে আমাদের এ-বাড়িতে আসতে বলেছিলেন।

চাকরটা বললে—একটু আগেই তো আমি বাবুকে চা দিয়ে গিয়েছি। তখন তো উনি ছিলেন। আচ্ছা, আমি একবার দেখি চেষ্টা করে।

বলে দরজাটার ওপর জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো।

মুখেও বলতে লাগলো—ও বড়োবাবু, বড়োবাবু, দরজা খুলুন, আপনার বন্ধুরা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে—

মুখে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজাতেও ঘা দিতে লাগলো জোরে জোরে।

কিন্তু বেশিক্ষণ ধাক্কা দিতে পারলে না।

হঠাৎ ভেতর থেকে কে একজন উর্দিপরা চাকর এসে বাধা দিলে।

বললে—আরে, কি করছিস, এত শোরগোল কেন? মেম-সাহেবের ঘুম ভেঙে গেছে, শোরগোল বন্ধ করতে বললে আমাকে—

বোঝা গেল ইন্দ্রনাথের পুত্রবধূর খাস চাপরাশি সে।

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললে—আপনারা যান বাবুজ মেমসাহেব বড়ো গোঁসা করছে, আপনারা এখন চলে যান।

এর পর আমরা আর দাঁড়িয়ে কী করবো? দু'জনেই ভারাক্রান্ত মনে চলে এলাম।

১১১

হঠাৎ সেইদিনই আবার দুপুরের দিকে করমচাঁদ হাঁফাতে হাঁফাতে আমার বাড়িতে এসে হাজির হলো।

তাকে দেখেই আমি বিপদের সংকেত পেলাম।

বললাম—কী রে, ইন্দ্রনাথের খবর কিছু পেলি?

করমর্চাঁদ বললে—হ্যাঁ, সেইজন্যেই আবার তাড়াতাড়ি সব কাজ ফেলে চলে এলুম তোর কাছে। তুইচল্ আমার সঙ্গে, শ্মশানে যেতে হবে। ইন্দ্রনাথ মারা গিয়েছে—

আমার মুখ থেকে কোনও কথা বেরোল না। সঙ্গে সঙ্গে যেমন অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থাতেই তার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

গাড়ি যখন ইন্দ্রনাথের বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোলো তখন দেখি 'হিন্দু সৎকার সমিতি'র গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।

আর ওদিকে কয়েকজন লোক ইন্দ্রনাথের মৃতদেহ নিয়ে সেই ভ্যানের ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

আমার মনে হলো ইন্দ্রনাথ যেন বিরাট আকারের একটা আরশোলা। আরশোলা মারা গেলে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে পিঁপড়ে তাকে কুরে কুরে খায়, ইন্দ্রনাথকেও তেমনি কোটি কোটি আরশোলা আক্রমণ করে তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আর ইন্দ্রনাথের বাড়ির ভেতর থেকে তখন টি.ভি.'র গানের শব্দ কানে আসছে। বাড়ির কর্তা যে মারা গেছে সে-খবর যেন কারো কাছে তখনও পৌঁছোয়নি।

গাড়িটা ছেড়ে দিলে, আমার মনে হলো, কুড়ি কোটি বছর আগে যখন প্রথম আরশোলার জন্ম হয়েছিল, এত বছর বাদে তার আকার যেন এখন মানুষের মতো বড়ো হয়েছে আর সেই বিরাট আরশোলাটাকেই শ্মশানে দাহ-সৎকার করতে নিয়ে চলে গেল।

মনে হলো এ-ও এক 'নসীব কা খেল্'। নইলে ইন্দ্রনাথের বাবা অতো বড়ো বুদ্ধিমান আই-সি-এস হয়ে বাড়িটা নিজের ছেলের নামে না দিয়ে, নিজের নাতির নামে কেন উইল্ করে দিয়ে গিয়েছিলেন?

৩

আর একটা 'নসীব কা খেল্'-এর ঘটনা বলি। একদিন আনন্দর অফিসে গিয়েছি। আনন্দ আমার বন্ধু।

কথা-প্রসঙ্গে আনন্দ জিজ্ঞেস করলে—তুমি দেবদাসকে চেনো?

বললাম—দেবদাসকে কে না চেনে? শরৎচন্দ্রের দেবদাসকে সবাই জানে, সে পার্বতীকে ভালোবাসতো। তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে দেবদাস মাতাল হয়ে গিয়েছিল...

আনন্দ বললে—আরে, সে-দেবদাস নয়, সে-দেবদাস নয়। এ অন্য দেবদাস। দেবদাস বোস। এ জীবনে মদ ছোঁয়নি। আর এর কোনও পার্বতীর সঙ্গে প্রেমও হয়নি। এর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বিবাহিত জীবনেও এ খুব সুখী।

বললাম—তা হঠাৎ এই দেবদাসের কথা বলছো কেন?

আনন্দ বললে—বলছি, তুমি লেখক বলে। তোমরা তো গল্পের প্লট খুঁজে বেড়াও চারদিকে। শুধু তুমি নও, পৃথিবীর সব লেখকই তাই করে। গল্পের জন্যে তারা মাথা কুটে মরে। একই গল্প তো সারাজীবন ধরে বার-বার লেখা চলে না, রোজই নতুন-নতুন বিষয়বস্তু খুঁজে বেড়াতে হয়। তাই তোমাকে বলছি, এই আমাদের অফিসের দেবদাসকে নিয়ে লেখো না—

বললাম—এই দেবদাস তোমার অফিসে চাকরি করে?

আনন্দ বললে—হ্যাঁ—

বললাম—ডাকো না একবার তাকে দেখি।

আনন্দ বললে—আরে, সে কি সব সময়ে অফিসে থাকে?

—অফিসে থাকে না মানে? এখনও তো বিকেল পাঁচটা বাজেনি। অফিস তো এখনও ছুটিই হয়নি। অফিসে থাকবে না তো

কোথায় যাবে ?

আনন্দ হো হো করে হেসে উঠলো।

বললে—ভুলে যাচ্ছো কেন যে এটা সরকারী অফিস। সরকারী অফিসে যতো কাজ তার চেয়ে লোক বেশি। কোনও লোক যদি কাজ না-ও করে তাতে ক্ষতি হয় না।

—তাহলে দেবদাস বোস অফিসে আসেই না ?

আনন্দ বললে—অফিসে আসে, এসে সইটা করেই আর্ধেক দিন চলে যায়—

—কোথায় যায় ? বাড়িতে ?

আনন্দ বললে—এখন গিয়ে দেখবে হয়তো একটা সাইকেল-রিক্শার ওপর বসে আছে। বসে বসে ঘুমোচ্ছে।

—সে আবার কী ? তুমি-ই তো এ-অফিসের বড়োবাবু, তুমি কিছু বলো না ?

আনন্দ বললে—না। দেবদাস ছেলেটা খুব ভালো। দেবদাসকে কিছু বলতে আমার কষ্ট হয়।

—কেন ?

—দেখ, যারা ভালো মানুষ, তাদের কিছু বলতে কষ্ট হবে না ?

—কিন্তু অফিস থেকে মাসকাবারী মাইনে নেবে আর অফিসে কাজ করবে না, এটা তো ক্রাইম।

আনন্দ বললে—এ ক্রাইম তো সকলেই করছে। এই যে দেশের মিনিস্টাররা কতো বড়ো বড়ো কথা বলছে, লেক্চার দিচ্ছে, সারা পৃথিবীতে প্লেনে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই তো করছে না। তার বেলায় ?

এর উত্তর আমি কী দেব ?

আনন্দ বললে—মিনিস্টারদের দেখেই তো সবাই শিখছে। যদি ওপরওয়ালারা ফাঁকি দেয় তখন নিচেকার লোকেরা তো ফাঁকি দেবেই।

তাদের দোষ কী?

আনন্দর কথাগুলো যুক্তিহীন নয়।

সে বললে—তা বলে ভেবো না যে দেবদাস বদমাইস লোক দেবদাসের সংসার আছে, তার বউ আছে, ছুটো মেয়ে আছে। তা ছাড়া তার একটা ছোট ভাইও আছে। আর তার বউও একজন আদর্শ স্ত্রী। সে-মহিলাও একটা স্কুলের মাস্টার, সেখানে পড়ায়। আজকাল জানো তো ইস্কুলের মাস্টাররা জজ্-ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে বেশি মাইনে পায়। অজস্র ছুটি। অথচ রোজই হরতাল আর স্ট্রাইক তো লেগেই আছে। তারপর খুব যদি বৃষ্টি হলো তো সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। তারপর আছে গরমের ছুটি, পূজোর ছুটি, ঘেঁটুপূজোর ছুটি, ছুটির তো শেষ নেই স্কুলে—

বললাম—এরকম স্ত্রী যার, এরকম চাকরি যার, তার তো চরম সুখ! তবে অফিসে এসে নাম সই করে চলে যায় কেন?

আনন্দ বললে—সেইটেই তো গল্প। সেই গল্পটা লেখবার জন্যেই তো তোমাকে বলছি—তুমি লেখো আমাদের এই দেবদাসকে নিয়ে। লোকের ভালো লাগবে।

বললাম—লোকের ভালো লাগার চাইতে আমার নিজের ভালো লাগাটাই বড়ো কথা।

আনন্দ বললে—তুমি যেমন মোটা মোটা বই লেখো, ওইরকম মোটা বই লেখো না দেবদাসের জীবন নিয়ে—

বললাম—ভাই, মোটা বই লেখার আর বয়েস নেই। যখন মোটা-মোটা বইগুলো লিখেছি তখন বয়েস কম ছিল, তখন সারা রাত জেগে-জেগে লিখেছি। কিন্তু এখন রাত জেগে লিখতে কষ্ট হয়, এখন চোখের তেজও কমে এসেছে, এখন নার্ভেরও দুর্বলতা এসেছে। এ-বয়েসে আর মোটা বই লিখতে পারবো না। এখন পত্রিকার পূজো-সংখ্যাতেই লিখবো, ততো জায়গা তাতে দেবে না আমাকে, আর আমারও পরিশ্রম কমবে—

আনন্দ বললে—অতো কম করে লিখলে দেবদাসের ওপর অবিচার করা হবে। দেবদাস একজন মহাকাব্যের নায়ক হওয়ার যোগ্য মানুষ। তার ওপর অবিচার হোক, এটা আমি চাই না।

বললাম—ঠিক আছে। আমি দেখবো চেষ্টা করে পারি কিনা লিখতে।

আনন্দ বললে—দেবদাস কেন সরকারি চাকরি করতে এসেও নিয়ম করে অফিসের কাজ করে না, কেন প্রায়ই অফিসের হাজিরা খাতায় সই করে বাইরে চলে যায়, তার এই ব্যাপার দেখেও কেউ কেন কিছু বলে না, সমস্তটাই হলো গল্প।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন কেউ কিছু বলে না?

—বলে না এইজন্যে যে যারা তাদের মাথার ওপর বসে আছে তারাও যে নিজের নিজের কাজ করে না। কেন বলবে?

তারপর একটু থেমে আনন্দ আবার বললে—আসলে দেবদাস চরিত্রহীন ছেলে নয়। সবাই তা জানে। অফিস পালিয়ে যে সে কোনো কুকর্ম করতে যায়, তা নয়। এরকম চরিত্রবান ছেলে আমি তো আমার জীবনে আর একজনকেও দেখিনি।

—কী রকম?

কথার মাঝখানে বাধা পড়লো। আনন্দ সরকার ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের একজন হেড। তার অনেক কাজ। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ টাকার হিসেব রাখতে হয় তার মাথায়। ঠিকেদাররা আসে। তাদের পেমেণ্ট করতে হয়। ইঞ্জিনীয়াররা আসে টাকার বিল নিয়ে। তাদের সঙ্গে হিসেবের কথা বলতে হয়। খানিকটা বাজে কথাও বলতে হয়। কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠলেই দু'পক্ষেরই সুবিধে। তাতে কাজ ভালো হয়।

আমার তখন চুপ করে থাকার পালা। আমি আনন্দকে ছোটবেলা থেকে চিনি। এককালে আমরা একসঙ্গে একই ক্লাসে পড়েছি।

বললাম—আমি তাহলে এখন আসি, আনন্দ—

আনন্দ বললে—বোসো না আর একটু। আমি তোমাকে দেবদাসের সম্বন্ধে আরও গল্প বলবো।

আমার পক্ষে এ প্রস্তাবটা খুব লোভনীয়।

তবু বললাম—তোমার তো দেখছি অনেক কাজ অফিসে—

আনন্দ বললে—জীবন থাকলেই কাজ থাকবে, তা বলে গল্প তো আব বসে থাকতে পারে না। কাজও থাকবে গল্পও থাকবে, তাই নিয়েই তো জীবন। আমাদের দেবদাসও তো তাই বলে—

—কী বলে?

আনন্দ বললে—দেবদাস বলে পৃথিবী চলছে বলে চিরকাল সোজা-পথেই যে চলবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। মাঝপথে হঠাৎ থেমে যেতেও পারে, কিংবা পেছু হাঁটতেও পারে। তাই পৃথিবীটাকে ঠিক পথে চালাবার ভারটা আমাদেরও নিজেদের হাতে নিতে হবে। ব্যাকা পথে চললে তাকে সোজা পথে চালানোর কাজটা আমাদেরও নিজেদের নিতে হবে—

বললাম—পাগল নাকি ছেলেটা?

আনন্দ বললে—পাগল হলে তো তবু বুঝতাম। পাগল মোটেই নয়। মাইনের দিন ঠিক সময়মতো অফিসে এসে স্ট্যাম্পের ওপর সই দিয়ে মাইনেটা নেবে।

বললাম—তাহলে সেয়ানা পাগল নাকি?

আনন্দ বললে—তাও নয়, মাইনেটা নেবে ঠিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাইনেটা বাড়িতে পৌঁছোবে কিনা তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

—কেন?

আনন্দ বললে—সেইজন্যেই তো বলছি দেবদাসকে নিয়ে তুমি লেখ না? আমার তো মনে হয় পৃথিবীর কোনো ভাষার সাহিত্যে আমাদের দেবদাসের মতো চরিত্র নেই।

—তাহলে তার সংসার চলে কী করে?

আনন্দ বললে—সংসার চালাবার জন্যে তো তার বউ-এর মাইনে আছে, তার ছোট ভাই-এর মাইনে আছে।

—তা বউ কিছু বলে না তার স্বামীকে?

আনন্দ বললে—তার বউটাও ভাই সেইরকম। অমন আদর্শ গৃহিণীও আমি আর একটা দেখিনি। অন্য স্ত্রী হলে দেবদাসকে ঝ্যাটা-পেটা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত। কিংবা ডিভোর্স করে দিত।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের দেবদাস কতো মাইনে পায়?

আনন্দ বললে—আঠারো শো টাকা—

—আঠারো শো টাকাই উড়িয়ে দেয়? কীসে ওড়ায়? মদ খেয়ে?

আনন্দ বললে—ওরে বাবা! মদটাকে ও বড় ঘেন্না করে। যারা মদ খায় তাদের সঙ্গে ও কথাও বলবে না জীবনে, ওর এত ঘেন্না মাতালদের ওপর!

—তাহলে কিসে ওড়ায় টাকা? সিগারেট খেয়ে?

আনন্দ বললে—না না, মদ বিড়ি সিগারেট গাঁজা চরস হেরোইন, ব্রাউন-সুগার, ওসব একেবারে স্পর্শ করবে না।

—তাহলে মেয়েমানুষের নেশা আছে নাকি?

আনন্দ বললে—আমরা সে-সব খবরও নিয়েছি। ওর কাছে মেয়ে-মানুষ মানেই মায়ের জাত। নিজের স্ত্রী ছাড়া আর সকলেই ওর মা!

আমি শুনে আরো অবাক।

—তাহলে মাইনের আঠারো শো টাকা নিজের সংসারে যদি না দেয়, তাহলে টাকাটা নিয়ে করে কী? রেস খেলে?

আনন্দ বললে—বলছি তো তোমাকে ওর কোনও নেশা নেই, ও জুয়াও কখনও খেলেনি। আজকাল তো সারা কলকাতা লটারির দোকানে ছেয়ে গেছে। লটারির ফার্স্ট প্রাইজ এখন এক কোটি দু'কোটিতেও উঠেছে শুনতে পাই, এমন কোনও মধ্যবিত্ত বাড়ি নেই

যারা লটারির টিকিট কেনে না। বাড়ির চাকর-ঝি'রাও লটারির টিকিট কেনে শুনতে পাই। কিন্তু ও বলে—ওটা জুয়া। জানো, একদিন কী কাণ্ড করেছে ও ?

—কী ?

আনন্দ বললে—একদিন ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেণ্টকে একটা রেজিস্টার্ড চিঠি লিখেছিল।

—কী জন্যে ?

আনন্দ বললে—তাতে লিখেছিল যে সমস্ত ইণ্ডিয়ার লোককে 'জুয়াড়ি' করে তোলা হচ্ছে লটারির টিকিট বিক্রী করবার অনুমতি দিয়ে। এতে মানুষের মর‍্যালস্ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হোক।

—তা প্রেসিডেণ্ট সে-চিঠির কী উত্তর দিলেন ?

আনন্দ বললে—প্রেসিডেণ্টের তো আর দেবদাসের মতো মাথা খারাপ নয় যে দেবদাসের মতো পাগলের চিঠির জবাব দেবেন! তাঁর অন্য অনেক বড়ো বড়ো কাজ আছে। প্রেসিডেণ্টের কাছে রোজ যতো চিঠি যায় তার সবগুলোর যদি উত্তর দিতে হয় তাঁকে তাহলে তো তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

—তা সত্যি! কিন্তু তোমাদের দেবদাস এরকম খাপছাড়া মানুষ হলো কেন ?

আনন্দ বললে—সব ঘটনাগুলো শুনলে তখন তুমি বুঝতে পারবে কেন এমন খাপছাড়া মানুষ হলো দেবদাস ? সেটা বলতে গেলে তোমারও হাতে সময় থাকা চাই, আমারও হাতে সময় থাকা দরকার।

বললাম—ঠিক আছে, একদিন সময় করে সব ব্যাপারটা শোনাও তুমি—

আনন্দ বললে—একদিনে হবে না। অনেকদিন লাগবে সবটা বলতে!

বল্লাম—তাই-ই হবে—

বলে আমি সেদিন তার অফিস থেকে বাড়ি চলে এসেছিলাম।

আসবার সময়ে আনন্দ বলেছিল—যদি দেবদাসের গল্পটা লেখবার আগ্রহ হয় তো আমাকে জানিও তুমি—'

১১১

এই-ই হচ্ছে সূত্রপাত।

সচরাচর যা হয় আমারও তাই হলো। অর্থাৎ হাজারটা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রইলাম কয়েকটা মাস। নিজের দৈনন্দিন লেখার কাজেই ডুবে রইলাম। সে-লেখার তাগিদও কম নয়। লেখাটাকে যখন নেশা ও পেশা করে নিয়েছি তখন তা একমাত্র জীবিকা হয়ে গিয়েছে।

যারা দিনের বেলা একটা চাকরি করে আর অবসর সময়ে লেখে তাদের অনেক সুবিধে। মাসকাবারী মাইনেটা তাদের বাঁধা। বিশেষ করে যদি সেটা সরকারী অফিস হয়। ঝড় হোক, ভূমিকম্প হোক, বন্যা হোক, অসুখ-বিসুখ হোক, পয়লা তারিখে তাদের মাইনে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। যদি আটকে রাখে তাহলে অফিসই উঠে যাবে।

আর যারা স্কুলের মাস্টার, তাদের চাকরি তো সরকারী চাকরি নয়, বাদশাহী চাকরি বললেই ঠিক বলা হয়। বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে আশী দিন কাজ আর বাকি সময়টাতে ঘরে বসে বসে নোট-বই লেখো, গল্প উপন্যাস লেখো। কিম্বা অন্য কিছু করো। যেমন তাস বা পাশা খেলতেও পারো। তাতে তোমার চাকরির টাকাতে হাত পড়বে না। আর তা করতে যদি ইচ্ছে না হয় তো ছাত্র-ছাত্রী পড়াও। সে-টাকার ওপর ইনকাম-ট্যাক্সও দিতে হবে না।

কিন্তু সেই যুগে দেবদাস বোস সরকারী অফিসে চাকরি করেও কী করে চিরকাল অফিসের হাজিরা খাতায় নাম সই করে প্রায় সারাদিন

বাইরেই থাকে, এটার কোনো নজির নেই।

—তারপর?

আনন্দ বললে—দেবদাসের গল্পটা একদিনে বলা যাবে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কাজ না করে অফিসে চাকরি থাকে কী করে? বড়োসাহেব কিছু বলে না?

আনন্দ বললে—তাকে কি বড়োসাহেবরা কেউ দেখতে পায় যে চাকরি যাবে? সে তো চাকরি করে রেকর্ড-সেকশনে। তার চারটে এ্যাসিস্টেণ্ট। একজনের কাজ করবার জন্যে চারজন লোক আছে। যুদ্ধের পর থেকে এইরকমই হয়েছে। যতো কাজ বেড়েছে, লোক তার চেয়ে বেশি বেড়েছে।

—তা সেই চারজন কিছু বলে না?

আনন্দ বললে—না। মজা এই যে দেবদাসের কোনও শত্রু নেই। সবাই তাকে ভালোবাসে। দেবদাসকে ভালো না বেসে উপায় নেই।

—তুমি তো সবই জানো, তুমিও কিছু বলো না?

আনন্দ হেসে ফেললে।

বললে—আমিও যে তাকে ভালোবাসি ভাই!

—কেন? তুমি ভালোবাসো কেন? কাজ না করে যে লোক মাইনে নেয় তাকে তুমি ভালোবাসো কেন? গভর্মেণ্টের লোকসান হচ্ছে না?

আনন্দ বললে—তুমি জানো না তাই ও-কথা বলছো! তুমি একজন মাত্র ছাড়া কে গভর্মেণ্টের লোকসান করছে না? দেশের যারা নেতা, দেশের যারা কর্তা তারা গভর্মেণ্টের লোকসান করছে না?

আমাকে স্বীকার করতেই হলো যে কাজ না করাই এ-যুগের ধর্ম। ভালো কাজ করলেও যে-যুগে প্রশংসা বা প্রমোশন নেই সে-যুগে কেন লোকে ভালো করে কাজ করবে? তার চেয়ে এমন একজন মুরুব্বীকে

ধরো, যাকে ধরলে বা যার কৃপা-দৃষ্টি পেলে কাজ না করেও তুমি চাকরিতে উন্নতি করবে। অর্থাৎ তোমার মাইনে বাড়বে।

তবে কি দেবদাস বোসের সেইরকম কোনও মুরুব্বী আছে?

আনন্দ বললে—না, তা নেই।

—তবে?

আনন্দ বললে—এ অফিসের সবাই যে তাকে ভালোবাসে!

—কেন? কীসের জন্যে ভালোবাসে?

আনন্দ বললে—দেবদাসের মতো মানুষ যে হয় না!

—কেন? কী গুণ আছে তার? কীসের জন্যে ভালোবাসে?

আনন্দ বললে—তার মতো এত ভালো ছেলে হয় না! সকলের দুঃখ-কষ্টে তার প্রাণ কাঁদে। যদি সে শোনে যে কেউ টাকার অভাবে তার মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না তো সে-মাসের মাইনেটা সে পুরো দিয়ে দেবে।

—তাহলে দেবদাস নিজের সংসার চালাবে কী করে? তার নিজেরও তো সংসার আছে, বউ আছে, বাচ্চা মেয়েরা আছে, ভাই আছে, তারা কী খাবে?

আনন্দ বললে—আমি তো বললুম তার বউ মোটা মাইনের চাকরি করে। তাতেই তার সংসার-খরচা চলে যায়।

—কিন্তু আজকালকার বাজারে কি একজন কি দু'জনের আয়ে কারো সংসার চলে? যে-রকম দিন-কাল চলছে এতে কি কেউ তা চালাতে পারে?

আনন্দ বললে—সেইজন্যেই তো বলছি আমাদের দেবদাসকে নিয়ে তুমি লেখো। সে এক বড়ো মজার চরিত্র। তাকে জানতে পারলে তুমিও তাকে ভালোবেসে ফেলবে! সে সকাল দশটায় এসে খাতায় নাম সই করে ঠিকই, কিন্তু তারপর যদি ইচ্ছে হয় অফিসে থেকে কাজ করবে, আর নয়তো কাউকে না বলে অফিস থেকে হঠাৎ বেরিয়ে

যাবে।

আনন্দ বললে—একদিনে তাকে বোঝানো যাবে না, সে এমন এক চরিত্র! তাকে বুঝতে গেলে তাকে মুখোমুখি দেখতে হবে। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে!

জিজ্ঞেস করলাম—কখন এলে তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবে?

আনন্দ বললে—সেটা বলা মুশকিল!

বলে একটু থেমে আবার বললে—তুমি তো শুনলে এখন ও অফিসে নেই, কিন্তু তার মানে যে সে তার বাড়িতে চলে গেছে, তাও নয়। সে হয়তো রাখালের রিকশার ওপর শুয়ে আছে!

—রাখাল? রাখাল কে?

আনন্দ বললে—রাখাল কেউ নয়, একজন রাস্তার লোক।

—তা রাস্তার লোক রাখালের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? আর তা ছাড়া রিকশার ওপর তো মানুষ বসে থাকে! রিকশার ওপরে মানুষ শোয় কী করে?

—আর, রাখালের রিকশা সাধারণ রিকশা নয়, সাইকেল-রিকশা। সাইকেল-রিকশাতে শুতে কীসের অসুবিধে!

স্বীকার করতে হলো তার কথাটা সত্যি।

বাড়িতে আসতে আসতে ভাবলাম, এ আবার কেমন মানুষ! রাস্তার রিকশা ভাড়া করে কোথাও যায় না, রিকশা ভাড়া করে সেই রিকশার ওপর শুয়ে থাকে।

১১১

শরৎবাবুর দেবদাস তো এমন করতো না! সে দেবদাস তো মদ খেতো। পার্বতীর বিরহে বিবাগী হয়ে গিয়েছিল। সে তো বিয়ে করেনি। তার তো সংসার ছিল না। সে তো চন্দ্রমুখীর বাড়িতে যেতো না।

বাদামতলাটা এই কলকাতা শহরেই একটা শহরতলী বটে। এই

বাদামতলাটা একটা অদ্ভুত জায়গা। এখানে যেমন বড়ো বড়ো প্রাসাদ-বাড়ি আছে, তেমনি আছে বস্তি-বাড়িও।

এখানে সারা ভারতবর্ষের নানান জাতের লোক এসে আস্তানা গেড়েছে। তুমি এখানে সব জাতের লোককে দেখতে পাবে। অথচ মূল কলকাতার মতো এখানে কোনও সুখ-সুবিধে নেই। এখানে কোটি-পতিও যেমন আছে, আবার তেমনি গরীবস্য গরীবও পাবে। এখানে মাটির তলায় ড্রেন নেই, কিন্তু তবু ছ'সাততলা ফ্ল্যাট-বাড়ি আছে!

যাদের গাড়ি আছে, তাদের পাশাপাশি পায়ে হাঁটা লোক দিন-রাত ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু তাতে কোনও বিদ্রোহ নেই, বিরাগ নেই। সবাই নিজেদের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে।

কিছু দুর্ঘটনা হলেই বলে ওঠে—কপাল, ভাই কপাল—

কপালের দোহাই দিলে কারো কোনও কথা বলার থাকে না। তোমার কপাল ভালো হলে তুমি বড়োলোক, ছ'তলার ওপরে পাখার তলায় শুয়ে আরাম করো, আর আমার কপাল খারাপ বলে আমি বস্তিতে মশা-মাছির কামড়ে সমস্তক্ষণ গা চুলকিয়ে মারি।

হঠাৎ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একদিন দেখলাম দূরে একটা সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। আমার তখন তাড়া ছিল। দৌড়তে দৌড়তে রিকশাটার কাছে গিয়ে দেখলাম রিকশাওয়ালা কাছেই ফুটপাতের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে আছে!

তাকে বললাম—রিকশাওয়ালা, সি-আই-টি মার্কেটে যাবে?

রিকশাওয়ালা বললে—না বাবু, এখন আমার সওয়ারি আছে—

চেয়ে দেখি একজন লোক সত্যিই রিকশার ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় বসে আছে। রিকশাওয়ালার বসবার জায়গাটার ওপর দুটো পা রেখে দিয়ে আরাম করে ঘুমোচ্ছে।

আমার মনে হলো, এ আবার কেমন সওয়ারী! শোওয়ার আর জায়গা পেলে না। ভর-দুপুর বেলা ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে লোকটা

এইভাবে শুয়ে আছে।

বললাম—উনি কি শো‌ার জন্যে তোমার রিকশা ভাড়া করেছেন?

ভদ্রলোক এতক্ষণে কথা-বার্তার শব্দে জেগে উঠলেন।

বললেন—কে?

আমি এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে।

বললাম—আমি একবার সি-আই-টি মার্কেটে যাবো—

ভদ্রলোক বললেন—এ রিকশায় আমি শুয়ে রয়েছি, এটা খালি নেই। আপনি অন্য রিকশা দেখুন—

বলে আবার দু'চোখ বুজলেন।

আমি ফিরে চলে এলুম।

আমি তখনও জানি না যে ওই রিকশাওয়ালাটার নাম রাখাল আর ওই ভদ্রলোকেব নাম দেবদাস।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা আনন্দর বাড়িতে গেলাম।

বললাম—ওরে, তোমার দেবদাসকে আজ দেখলাম।

—কোথায়?

—এই বাদামতলায়। মুন্সিগঞ্জের রাস্তায় দেখলাম একটা রাস্তায় একজন লোক সাইকেল-রিকশার ওপর গরমের মধ্যে আধ-শোওয়া অবস্থায় রয়েছে, আর রিকশাওয়ালাকে দেখলাম ফুটপাতের ওপর উবু হয়ে বসে আছে। আমি সি-আই-টি মার্কেটে যেতে বললাম। তবু সে গেল না। বললে—তার সওয়ারী আছে, সে যেতে পারবে না—

—রিকশাওয়ালাটার মুখে দাড়ি আছে?

বললাম—হ্যাঁ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। দেখে মনে হয় অনেকদিন কামায়নি।

—হ্যাঁ, ওই হচ্ছে রাখাল।

বললাম—আর যে-লোকটা শুয়ে আছে সে ফর্সা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল—

আনন্দ বললে—ওই-ই হচ্ছে দেবদাস। আজকে ও অফিসেই আসেনি। কী মেজাজ হয়েছে কে জানে!

বললাম—তা দেবদাস যে রিকশার ওপর ওইরকম করে শুয়ে আছে, তার জন্যে ওকে ভাড়া দিতে হয় না?

আনন্দ যা বললে, তা শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!

ওই রাখাল ছিল একজন রাস্তার ভিখিরী। দেবদাস তখন অফিস থেকে ফিরছিল। একটা লোক তার সামনে এসে ভিক্ষে চাইলে—এক আনা পয়সা দিন না বাবু—

চলতে চলতে দেবদাস থেমে গেল। লোকটার দিকে চেয়ে বললে—তুমি কী করো? বেকার?

—হ্যাঁ বাবু, আমার চাকরি চলে যাবার পর থেকে ভিক্ষে করে বেড়াই।

—চাকরি চলে গেল কেন তোমার?

লোকটা বললে—আমার কারখানায় যে লক-আউট হয়ে গেল।

—কতোদিন কারখানা বন্ধ হয়েছে তোমার?

লোকটা বললে—এক বছরটাক। তখন থেকেই আমি এইরকম ভিক্ষে করে পেট চালাচ্ছি—

—ভিক্ষে করে পেট চলছে?

লোকটা বললে—পেট চলছে না। কিন্তু আমার ভিক্ষে করা ছাড়া আর তো কোনও রাস্তা নেই। তাই এই পথ ধরেছি—

—কারখানার নাম কি?

লোকটা বললে—শালিমার জুট মিল—

—কবে খুলবে?

—তা জানি না বাবু। কারখানা বন্ধ হওয়ায় আমার জাতভাইরা সব দেশে-গাঁয়ে চলে গেছে। তাদের কেউ কেউ রাস্তার ফুটপাতে মাল-

পত্তর ফেরি করে, কেউ তেলে-ভাজার দোকান করেছে, কেউ চানাচুর ফিরি করে। আমার পুঁজিপাতি কিছু নেই, তাই ভিক্ষে করে পেট চালাই।

—তা এক আনা পয়সায় তোমার কী হবে?

লোকটা বললে—আপনার মতো আরো অনেকের কাছে পয়সা চাইবো। যখন আট আনা জমবে, তখন সেই পয়সা দিয়ে মুড়ি কিনবো। সেই মুড়ি বাড়িতে গিয়ে ছেলে-মেয়ে-বউ সবাই জল দিয়ে ভিজিয়ে খেয়ে নেব!

—আর কিছু খাবে না?

লোকটা বললে—রোজ তো আট আনা ভিক্ষেও পাই না। কোনও কোনও দিন দশ আনাও পেয়ে গিয়েছি। সেদিন মুড়ি একটু বেশি কিনি।

দেবদাস জিজ্ঞেস করলে—আর থাকো কোথায়?

লোকটা বললে—থাকার জায়গা কি কলকাতায় অভাব? ফুটপাত তো খোলা পড়ে রয়েছে! আরো অনেক লোক মিলে ফুটপাতেই থাকি।

—কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি-রোদ তো আছে।

লোকটা বললে—সে একটা কোনোরকমে ঝুপড়ি বানিয়ে নিয়েছি সেখানেই—

দেবদাস বললে—ঠিক আছে, এক আনা নয়, তোমাকে আমি একটা টাকা দিচ্ছি—তুমি একদিন পেট ভরে খাও গে—

বলে পকেট থেকে একটা টাকা বার করে লোকটার হাতে দিলে।

লোকটা নগদ একটা টাকা পেয়ে চমকে উঠেছে। টাকাটা পেয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে একটা কাণ্ড করে বসলো। একেবারে ঢিপ্ করে দেবদাসের পায়ের ওপর প্রণাম করে বসলো।

বললে—আপনি রাজাবাবু হোন বাবু, আপনি রাজাবাবু হোন—

দেবদাস মহা মুশকিলে পড়লো।

বললে—করো কী, করো কী! আমি রাজাবাবু হতে চাইনে বাবা, আমি রাজাবাবু হতে চাইনে। সবাই রাজা হলে তবে আমি রাজাবাবু হবো, পা ছাড়ো, পা ছাড়ো—

রাস্তা দিয়ে যারা দৃশ্যটা দেখতে পেলে তারা মন্তব্য করতে লাগলো—এই ভিখিরীদের অত্যাচারে তো রাস্তায় চলাই দেখছি দায় হলো—

তাই গা বাঁচিয়ে যে-যার গন্তব্যস্থলের দিকে পা বাড়ালো।

দেবদাসও তখন মুক্তি পেয়ে তার নিজের বাড়ির দিকে চলতে লাগলো।

১১১

দেবদাস সেদিন যখন তার বাড়িতে গিয়ে পৌছলো তখনও গীতা তার স্কুল থেকে ফেরেনি।

এতো সকাল-সকাল দেবদাস তার অফিস থেকে কখনও ফেরে না।

বড়ো মেয়ে বললে—বাবা, তুমি এতো সকাল-সকাল ফিরলে? আপিস ছুটি হয়ে গেল বুঝি?

সত্যিই সবাই অবাক হয়ে গেছে সেদিন। ছোট মেয়েটা পর্যন্ত 'বাবা' 'বাবা' বলতে বলতে দৌড়ে এসে দেবদাসের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ও-ঘর থেকে পরিতোষও কাছে এসে হাজির।

—দাদা, তুমি?

দেবদাস বললে—কেন, আসতে নেই?

পরিতোষ বললে—না, তা বলছি না। কখনও তো তুমি এতো আগে আসো না। তোমার আসতে আসতে তো রাত দশটা বেজে যায়!

দেবদাস বললে—রাস্তায় যে কতোরকম লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে

যায় তা তোরা কী করে জানবি ? জানিস, আজকে একটা লোকের সঙ্গে দেখা হলো, যে শুধু ভিক্ষের পয়সায় মুড়ি খেয়ে কাটায়। ভাত জোটে না।

পরিতোষ বললে—এ আর নতুন কথা কী ? এ খবর তো সবাই দেখেছে। আমিও দেখেছি এরকম কতো লোককে। অনেকে উপোস করে থাকে—

দেবদাস বললে—তাহলে বল্ তোরা আমরা কীরকম দেশে বাস করছি ! এর নাম কি দেশ স্বাধীন হওয়া ?

পরিতোষ বললে—তা ভাবলে তো আর বেঁচে থাকা চলে না। ওই নিয়ে ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোমার, শেষকালে পাগলা-গারদে থাকতে হবে !

—সেও এর চেয়ে অনেক ভালো, আমরা খাবো আর অন্যরা খেতে পাবে না, তা কি ভালো রে ?

পরিতোষ বললে—তুমি দেখছি সত্যিই পাগল। তুমি ওসব দিকে চেয়ে দেখ কেন ? সোজা বাড়ি ফিরে এলেই হয়।

দেবদাস বললে—তুইও দেখছি আমাদের বড়োবাবুর মতো কথা বললি। আমার অফিসের ক্যাশিয়ার আনন্দবাবুও ওইরকম কথা বলে। বলে—দেবদাস, তুমি ওসব দিকে চেয়ে দেখ কেন ?

—তা ঠিকই তো বলেন তিনি ! যারা সুস্থ লোক তারাই ওইরকম কথা বলবে।

দেবদাস বললে—ওরে, ও-রকম কথা একদিন ফ্রান্সের লোকরাও বলতো, রাশিয়ার লোকরাও বলতো। তার পরিণামে সে-সব দেশে কী হলো বল্ তো ? সে-সব কথা তো সবাই এখন জানে।

তারপর একটু থেমে দেবদাস বললে—জানিস একদিন ওরাই আমাদের মুখের গ্রাস, রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। তখন তোরা বুঝতে পারবি আমার কথার মানে।

—সে যখন হবে তখন হবে। এখন তাই নিয়ে ভাবলে পাগল হয়ে যাবো।

দেবদাস বললে—তা বললে চলবে না। এখন থেকে সবাইকে সাবধান হতে হবে। নইলে আমরা কেউ বাঁচবো না—

কথার মাঝখানেই গীতা এসে হাজির হলো। এত সকাল-সকাল দেবদাসকে বাড়িতে দেখে সেও অবাক হয়ে গেল।

সব ব্যাপারটা শুনে পরিতোষকে বললে—তুমি দেখছি তোমার দাদাকে এতোদিনেও চিনতে পারোনি। ও নিয়ে অতো তর্ক করছো কেন? কই, আমি তো কখনও তর্ক করি না। আমি ও-সব হাসিমুখে মেনে নিয়েছি—যাও, তুমি যদি পারো তো এক বোতল কেরোসিন তেল নিয়ে এসো, যেখান থেকে পারো—। স্টোভে এক ফোঁটা তেল নেই।

পরিতোষ বললে—কেন, স্টোভ জ্বেলে আবার কী করবে এখন?

গীতা বললে—বা রে, তোমরা কিছু খাবে না? সবাই কি উপোস করবে নাকি এখন? আর আজ তোমার দাদা অফিস থেকে সকাল-সকাল এসে গেছে, কিছু মুখে দিতে হবে তো!

পরিতোষ আর দাঁড়ালো না। সে গায়ে জামাটা চড়িয়ে টিনের পাত্র নিয়ে বাজারের দিকে চলে গেল।

গীতা বললে—কী গো, আজ আবার তুমি কাকে দেখলে রাস্তায়?

দেবদাস বললে—রোজই তো রাস্তায় হাজার হাজার লোক দেখি, কিন্তু জানো আজকে একজন অদ্ভুত লোক দেখলুম, সে একজন ভিখিরী—

—ভিখিরী আবার নতুন জিনিস কী? ও তো আমি রোজই রাস্তায় দেখি। কলকাতায় ভিখিরীর কি কিছু কমতি আছে—?

দেবদাস বললে—না না, এ অন্যরকমের ভিখিরী—

—কীরকম?

দেবদাস বললে—এ ভিখিরীটা ভাত খেতে পায় না। শুধু মুড়ি

খেয়ে থাকে।

গীতা বললে—তবু তো যা-হোক মুড়ি খেতে পায়, কিন্তু এমন ভিখিরীও কলকাতায় আছে যারা মুড়িও খেতে পায় না, শুধু হাওয়া খেয়ে থাকে।

—না না, ঠাট্টা নয়, সত্যিই ভাত পায় না এমন লোক যে-দেশে থাকে সে-দেশের মানুষ তো মানুষ নয়, জানোয়ার। আমরা সব লোক ভাত খাবো আর একজন লোক ভাতের বদলে শুধু শুখ্‌নো মুড়ি খেয়ে থাকবে, এটা তো ভালো কথা নয়।

গীতা চিনে গিয়েছিল তার স্বামীকে। জেনে গিয়েছিল যে লোকটা হিসেবী নয়, সব ব্যাপারেই খেয়ালী। খেয়াল হলেই একটা কিছু বেহিসেবী কাজ করে ফেলবে! তাই মানুষটাকে সহ্যও করতো, আবার স্ত্রী হিসেবে ভালোও বাসতো। কথায় কথায় বলতো—তুমি একটা আস্ত পাগল!

বলে মানুষটার সব খেয়ালীপনা সহ্য করে যেত।

পরিতোষ যদি দাদার কোনও খেয়ালীপনার বিরুদ্ধে বউদির কাছে অনুযোগ করতো তো গীতা বলতো—ছেড়ে দাও না ঠাকুরপো! তুমি তো চেনো তোমার দাদাকে, তবু ও নিয়ে অতো হৈ-চৈ করছো? মানুষটার বাইরেটাই শুধু দেখলে? মানুষটার মনটা দেখলে না?

তা বটে!

সংসারে বেশির ভাগ মানুষকে আমরা বাইরেটা দেখেই বিচার করি। কে আর কার মনের ভেতরটা দেখতে যাচ্ছে! মনটাকে তো বাইরে থেকে কেউ দেখতে পায় না। আর হয়তো দেখতে চায়ও না।

তাই গোড়াতে কিছু পারিবারিক বাদ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েও শেষ পর্যন্ত তা বিসম্বাদে পরিণত হতো না।

১১১

এমনি করেই দেবদাসের সংসারের চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল।

সংসারী মানুষ চায় যে, যারা তার নিজের সংসারে জড়িয়ে থাকে তারাও সবাই তার মতোই সংসারী হোক। চায় তারাও সংসারী হোক, তারাও একটু হিসেবী হোক। কারো একটু বেহিসেব হলেই তারা হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। বলে—তারা তার মতো হিসেবী হলো না কেন?

বিশেষ করে টাকা-পয়সার ব্যাপারেই তারা একটু বেশি সতর্ক থাকে। বিশেষ করে সে-লোকটা যদি বাড়ির কর্তা হয়! বাজার করতে গিয়ে যদি সে ঠকে আসে, কিম্বা ভালো বেগুন মনে করে কানা বেগুন কিনে আনে, বা টাটকা মাছ বলে যদি কেউ পচা বাসী মাছ কিনে আনে তাহলে তো আর কথাই নেই। তখনই সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে।

তা দেবদাস বোসের বা গীতা বোসের সংসারে সে-বিড়ম্বনার বালাই ছিল না।

কারণ দেবদাসকে সংসারের কোনও কাজই করতে দিত না কেউ। বাজার করাটা ছিল পরিতোষের নিজের এক্তিয়ারে।

আর টাকা?

টাকা আসতো গীতার স্কুল আর পরিতোষের অফিস থেকে। বলতে গেলে তাই দিয়েই দেবদাসের সংসার চলে।

কিন্তু দেবদাসের অফিসের মাইনের টাকার ওপর কারোর ভরসা ছিল না। সে কোনও দিন মাইনের আঠারো শো টাকা বাড়িতে নিয়ে আসতো না।

দেবদাস কোনো-কোনো মাসে বাড়িতে এসে বলতো—বুঝলে, এ মাসে পাঁচশো টাকা কম দিলুম—

গীতা বলতো—কেন?

দেবদাস বলতো—আর বলো কেন? আমাদের সেকসনের নিতাই, তার মেয়ের বিয়ে। বেচারি সাতশো টাকা মাইনে পায়। তাতে কি আজকাল কারো সংসার চলে? টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল না—

গীতা হাসলো। বললো—তাই বুঝি তুমি তোমার মাইনে থেকে পাঁচশো টাকা তাকে দিয়ে দিলে?

দেবদাস বললে—হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছ তো! কী করে ধরলে বলো তো?

গীতা বললে—এতোদিন তোমার সঙ্গে ঘর করছি আমি, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি ভেবেছ?

তারপর একটু থেমে আবার বললে—তা পাঁচশো টাকা তোমায় আবার ফেরত দেবে তো?

দেবদাস বললে—নিশ্চয় ফেরত দেবে। তবে একসঙ্গে হয়তো ফেরত দিতে পারবে না। মাসে মাসে একটু-একটু করে শোধ করবে।

গীতা বললে—আর শোধ করেছে! এর আগেও যারা তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে তারা তো কখনও হাত উপুড় করেনি···

দেবদাস বললে—লোকের যা অভাব, তোমায় কী বলবো! জানো, এক এক দিন কারো বাড়িতে মাছই রান্না হয় না। বাজারে মাছের কী দাম বেড়েছে বলো তো! ছোটো ছোটো পুঁটিমাছ, তারই দাম বলে কুড়ি-টাকা পঁচিশ-টাকা কিলো—দেশের কী অবস্থা হলো বলো তো! এর চেয়ে তো সেই আগেকার আমলই ভালো ছিল—

তারপর গীতার দিকে চেয়ে বললে—কী হলো, কথা বলছো না যে?

গীতা বললে—কী আর বলবো! তুমি তো আর কখনও সংসার করলে না! সংসার যে কী করে চলছে তা তো তুমি কখনও—

দেবদাস বললে—তার জন্যে তো তুমি আছো, পরিতোষ আছে।

আমি যে কারো অভাবের কথা শুনলে থাকতে পারি না—

গীতা হাসলো। বললে—সকলেরই অভাব আছে, কেবল তোমারই অভাব নেই, তাই না?

দেবদাস বললে—আরে, এই ছ্যাখো, তুমি আবার রাগ করলে আমার ওপর! আমি কী করবো বলো? আমার তো নিজের কোনও নেশা নেই যে তার জন্য খরচ করবো! শরৎ চাটুজ্জের 'দেবদাস' বই পড়েছ তো, তার তবু 'পার্বতী' ছিল, 'চন্দ্রমুখী' ছিল, তাদের জন্যে খরচ-খরচা ছিল। তার ওপর মদের নেশা ছিল। কিন্তু আমার তো সে-সব বাজে খরচা নেই। আমায় তুমি কখনও বিড়ি সিগারেট কি মদ খেতে দেখেছ?

গীতার তখন অতো সব বাজে কথা শোনবার সময় নেই। যাওয়ার সময় বলে গেল—ও-সব থাকলে বরং ভালো হতো! মনে রেখ তোমারও দু'টো মেয়ে আছে, তাদেরও তোমাকে মানুষ করতে হবে। বয়েস হলে তাদেরও ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিতে হবে···

—কী বললে? কী বললে? শোন শোন, শুনে যাও—

গীতা দাঁড়ালো। বললে—তোমারও দু-দু'টো মেয়ে আছে, বয়েস হলে তাদেরও ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিতে হবে। তখন দেখবো কে তোমাকে টাকা ধার দেয়—

বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

১১১

দেবদাসের বাবা যতোদিন বেঁচে ছিলেন ততোদিন ছেলেকে নিয়ে বিব্রত থাকতেন।

দেবদাসের বিয়ে দেওয়ার পর একটু নিশ্চিন্ত হলেন। গীতাকে বললেন—বউমা, এবার আমি নিশ্চিন্ত হলুম। তুমি ওকে দেখো একটু। ওর স্বভাব-চরিত্রটা নিয়ে তোমার মাথা-ব্যথা করতে হবে না। তবে

একটু খেয়ালী, এই যা ওর দোষ! পরিতোষকে নিয়ে আমার কোনও দিন ভাবনা নেই, কিন্তু দেবদাসকে তুমি একটু সামলে নিয়ে চোলো—

তখন থেকেই গীতা দেবদাসকে সামলে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু সেই দেবদাস যে শেষ পর্যন্ত এমন কাণ্ড করে বসবে তা কে জানতো! কাণ্ড বলে কাণ্ড! পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও দেবদাসই এমন কাণ্ড করে বসেনি। এমন কি শরৎচন্দ্রের দেবদাস অনেক অকাজ-কুকাজই করেছে, সে-ও এমন কাণ্ড কখনও করে বসেনি।

সত্যিই দেবদাসের পক্ষে সেটা কুকাজই বটে!

সংসারে টাকার অভাবে কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, টাকার অভাবে কার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ছে না, কার ছেলের কোথাও চাকরি জুটছে না, এসব কথা নিয়ে তোমার ভাবনার দরকার কী? তুমি নিজে চাকরি পেয়েছ, মাস গেলে আঠারো শো টাকা মাইনে পাচ্ছ, তোমার নিজের একটা ছোট-খাটো দোতলা বাড়ি আছে কলকাতায়, একতলায় একটা দোকান-ভাড়া থেকেও তোমার কিছু টাকা আসছে, আর তোমার দু'টো বাচ্চা মেয়ে আছে, সেই সব নিয়ে ভাবো না। ভাইটার একটা বিয়ে দেবার চেষ্টা করো না। তারও তো বয়েস হচ্ছে!

কিন্তু ওই যে গীতার শ্বশুর বলে গিয়েছিলেন—বউমা, দেবদাসের স্বভাব চরিত্র নিয়ে তোমার কিছু মাথা-ব্যথা করতে হবে না, তবে ও একটু খেয়ালী-স্বভাবের ছেলে, ওকে তুমি সামলে চোলো—

দেবদাস যে খেয়ালী-স্বভাবের মানুষ তা গীতা বিয়ের পর থেকেই জেনে গিয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যে এমন কাণ্ড করে বসবে তা কে কল্পনা করতে পেরেছিল?

এমনি রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ বস্তি-পাড়ার কাছে এসেই একজনকে দেখে থমকে দাঁড়ালো দেবদাস।

দেবদাসের মনে হলো কে যেন তাকে কোন্ দিক থেকে ডাকলে।

—কে ? কে ডাকলো আমাকে ?

অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা মেয়েলি গলার হাসির আওয়াজ এলো—আমি—

ভালো করে নজর দিয়ে দেবদাস দেখলে লম্ফ জ্বালিয়ে একটা মেয়ে তার দিকে চেয়ে হাসছে।

—আমাকে ডাকলে তুমি ?

মেয়েটা হাসতে হাসতেই বললে—হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তুমি কানে কালা নাকি ?

—কে তুমি ?

মেয়েটা বললে—আমি ময়না—

—ময়না মানে ?

মেয়েটা বললে—আমার নাম ময়না। আমার ঘরে আসবে ?

দেবদাস বললে—কিছু দরকার আছে ?

ময়না বললে—কিছু দরকার না থাকলে তোমাকে মিছিমিছি ডাকছি ?

—কী দরকার ?

—আমার ঘরে এসো, বলবো।

বলে কথা নেই বার্তা নেই জ্বলন্ত লম্ফটা হাতে নিয়ে গলি দিয়ে ভেতরের দিকে চলতে লাগলো।

দেবদাস গলির মুখে তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

ময়না পেছন ফিরে বললে—কই, আসছো না যে ? এসো—

দেবদাস সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলে—কী বলবে বলছিলে, বলো না—

ময়না বললে—আগে ভেতরে এসো, তবে তো বলবো—

—এখানেই বলো না, এখানে দাঁড়িয়েই আমি শুনবো—

ময়না কথাটা শুনে যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী,

আমার ঘরে তুমি বসবে না—

দেবদাস বললে—কথা বলতে হলে ঘরে বসবো কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না?

ময়না বললে—তুমি কেমনধারা লোক গো, আমার ঘরে বসলে কি তোমার জাত যাবে?

দেবদাস বললে—না, জাত যাওয়ার কথা বলছি না, আমার ঘরে যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার তো কষ্ট!

—কষ্ট কীসের? কষ্ট মনে করলেই কষ্ট! চলো, না হয় ঘরে না-ই বা বসলে, ঘরে ঢুকতে তো আপত্তি নেই—

ঘর না ঘর!

ঘরে ঢুকে দেবদাস অবাক হয়ে গেল। একেও লোক ঘর বলে? মাটির দেওয়াল, মাথার ওপর টিনের ছাউনি, একটা দু'ফুট বাই তিন ফুট জানালা। আর একটা তক্তপোশ। তার ওপর দু'টো মাথার বালিশ।

ঘরে ঢুকেই মেয়েটি জানালার পাল্লা দু'টো বন্ধ করে দিলে।

দেবদাস দাঁড়িয়েই ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখছিল। এমন নোংরা ঘর দেবদাস জীবনে দ্যাখেনি।

বললে—কী বলবে বলছিলে, বলো?

ময়না বললে—তুমি বসবে না?

—কোথায় বসবো?

ময়না বললে—কেন, এই খাটের ওপর।

—তোমার খাটে তুমি তো শোও, ওর ওপর বসবো?

ময়না বললে—কেন, যারা আমার ঘরে আসে তারা সবাই-ই তো আমার খাটের ওপরেই বসে। আর যদি বসতে ইচ্ছে না করে তো শুয়েও পড়তে পারো—

—এখন? এখন তো সন্ধ্যে? এখন কি কেউ শোয়?

ময়না বললে—শোয়না জানি, কিন্তু একটু আরাম তো করতে পারো—

—আরাম করতে হলে বাড়ি গিয়েই আরাম করবো। এই জামা-কাপড়ও বদলাতে হবে আমার। সারা দিন অফিসে কাজ করেছি, ঘামে ভিজে গেছে তো—

—তা ছাড়োনা কাপড়-জামা! কে জামা-কাপড় ছাড়তে বারণ করছে? ছাড়ো। আমার ঘরে যারাই আসে সবাই-ই তো জামা কাপড় ছাড়ে।

দেবদাস বললে—যারা তোমার ঘরে আসে তারা কারা?

ময়না বললে—তারা তোমারই মতো, আমার কেউ নয়—

দেবদাস বললে—তোমার কেউ নয় তো তোমার কাছে আসে কেন?

—এই তুমি যে-জন্যে এসেছ, সেইজন্যেই তারা আসে!

দেবদাস বললে—কিন্তু তুমি ডাকলে বলেই তো আমি এসেছি—তুমি আমায় ডাকলে কেন?

ময়না বললে—কেন ডাকলুম তা বুঝতে পারছো না?

—তুমি যে বললে তোমার ঘরে এলে তুমি আমাকে কী বলবে!

মেয়েটা বললে—তুমি কীরকম লোক গো? তুমি বুঝতে পারোনি আমি কী জন্যে তোমাকে ডেকেছি। তোমার মতো পুরুষ-মানুষ তো আমি এর আগে দেখিনি! তুমি বুঝতে পারো না মেয়েরা কি জন্যে পুরুষ-মানুষদের ডাকে!

দেবদাস বললে—আমি তোমার হাব-ভাব কিছু বুঝতে পারছি না—

দেবদাস কথা শেষ করতে না করতে মেয়েটা তার গলাটা জড়িয়ে ধরে তার নিজের দিকে টানতে লাগলো। বললো—আমাকে বুঝি তোমার পছন্দ হচ্ছে না? আমি বুঝি দেখতে খারাপ··· ?

দেবদাস কিছু বুঝে ওঠবার আগেই মেয়েটা জিজ্ঞেস করলে—

বাড়িতে তোমার বউ আছে ?

দেবদাস বললে—হ্যাঁ —

—তাকে আমার চেয়ে বেশি সুন্দর দেখতে ?

দেবদাস কী বলবে ! হঠাৎ তার বউ-এর প্রসঙ্গ উঠলোই বা কেন তাই-সে বুঝতে পারলে না।

—মদ খাবে ?

—মদ !

দেবদাস চম্‌কে উঠলো ! জিজ্ঞেস করলে—মদ তো আমি খাই না। তুমি মদ খাও নাকি ?

ময়না বললে—আমি খাই না—

—কেন ?

—না বাবা, অতো টাকা আমার নেই।

—তুমি যদি মদ না খাও তো আমাকে মদ খেতে বলছো কেন ?

ময়না বললে—আমার কাছে যারা আসে তারা সবাই খায় কিনা, তাই ! তাদের জন্যে মদ আনিয়ে দিতে হয়।

—কিন্তু এখন এত রাতে কি মদের দোকান খোলা আছে ?

ময়না বললে—টাকা ঢাললে বাদামতলায় দিন-রাত সব সময়েই মদ পাওয়া যায়। টাকা দাও না, টাকা দিয়ে দেখ না পাওয়া যায় কিনা—টাকা দেবে ?

দেবদাস কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পড়লো।

বাইরে দরজায় কে যেন কড়া নাড়তে লাগলো।

—এই ময়না, ময়না—

হঠাৎ মেয়েটার মুখটা ভয়ে শুকিয়ে এলো।

—এই ময়না, ময়না—

মেয়েটা বললে—খুলছি।

দেবদাস বললে—কে ডাকছে ?

ময়না কাপড়-চোপড় সামলে দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে বললে—বাড়িওয়ালা—

বাড়িওয়ালা! দেবদাস বাড়িওয়ালার ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না।

ময়না ঘরের দরজাটা খুলে দিতেই একজন মস্ত গোঁফওয়ালা মানুষকে দেখতে পেলে।

লোকটা ময়নাকে দেখেই বললে—কী রে, নাগরকে নিয়ে তো বেশ ফুর্তি করছিস, এদিকে আমার বাকি ভাড়া দেওয়ার নাম নেই! দে, টাকা দে—

ময়না বললে—এখন টাকা দিতে পারবো না বাবু, সবে আজই জ্বর থেকে উঠে ভাত খেয়েছি—

লোকটা বললে—তোর তিন মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি আছে, তা জানিস—

ময়না বললে—আপনি তো জানেন, তিন মাস জ্বরের ঘোরে আমি ঘরে খদ্দের বসাতে পারিনি। আজকে সবে আমার ঘরে খদ্দের ঢুকেছে, একসঙ্গে আমি অতো টাকা দিতে পারবো না বড়বাবু—

লোকটা বললে—তোর জ্বর হলে তুই-ই ভুগবি, তা বলে আমি কেন ভুগবো শুনি? আমার কতো টাকা লোকসান হলো বল্‌দিকিনি? আমি তিন মাসের ভাড়া একসঙ্গে চাই—আর আমি কোনও কথা শুনছি নে—দে, এখনই দে আমার তিন মাসের ভাড়া, আমি টাকা না নিয়ে আর যাচ্ছি না, ভাড়া না নিয়ে আমি এখান থেকে নড়ছি না—

তারপর একটু থেমে বললে—এই তো তোর ঘরে এই বাবুকে বসিয়েছিস, এর কাছে টাকা নে। নিয়ে আমাকে দে—

ময়না বললে—এই বাবু তো সবে ঘরে এলো। এখনও মদ খাওয়াতে পারিনি। আগে মদ খাক্, তবে তো টাকা নেব।

লোকটা বললে—তোর ভাত খাওয়ার বেলায় তো টাকা জোটে,

কেবল বাড়িওয়ালাকে টাকা দেওয়ার বেলাতেই তোর টাকার অভাব—আমি কিছু জানি না ভেবেছিস ?

—ওমা, আমি কবে ভাত খেলুম ? আমার আঁচলে একটা পয়সা নেই আর আমি ভাত রান্না করছি আর খাচ্ছি ! আপনি কবে ভাত খেতে দেখলেন আমাকে ?

লোকটা বললে—আমার কি আর কোনও কাজ নেই, কেবল তুই খাচ্ছিস কি খাচ্ছিস না তাই দেখতে আসবো ? দে, টাকা দে তুই। আমি আজ টাকা না নিয়ে যাবোই না—

—ওমা, এখন আমি কোথায় টাকা পাবো যে দেব ? সবে তো ঘরে ধুনো-গঙ্গাজল ছিটিয়ে পিদিম জ্বেলে সন্ধ্যে দিয়েছি। এখন কোথায় পাবো টাকা ? খদ্দের আগে যাক, তবে তো হাতে টাকা পাব—

লোকটা বলে উঠলো—তুই বড়ো জ্বালাস ! এই বাবুর কাছ থেকে কিছু আগাম নিয়ে নে না, আমি খালি-হাতে আজকে যাবো না বলে রাখছি—

—বা রে, আমি আগাম কী করে চাই ! আমার লজ্জা করে না ?

লোকটা বললে—ওরে আমার লজ্জাবতী রে, গলির মুখে লম্ফ জ্বালিয়ে খদ্দের ডাকবার বেলায় তো লজ্জা করে না তোর !

তারপর লোকটা দেবদাসের দিকে চেয়ে বললে—মশাই, আপনি চুপ করে আছেন কেন ? ফুর্তি করার আগে টাকা দিন্ না আগাম—

দেবদাস আরো অবাক।

বললে—আমি কীসের আগাম দেব ?

লোকটা বললে—আ-হা-হা, আপনি যেন ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানেন না। আপনি তো টাকা খসিয়ে ফুর্তি করতে এসেছেন এখানে ! আমি ঠিক বলছি তো ? না কী ?

দেবদাস বললে—তার মানে ?

—মানে আমি বলে দেব ? আপনি কিছুই জানেন না যেন। এটা

যে বেশ্যা-বাড়ি তা জানেন তো ?

দেবদাস বললে—না, তা জানতুম না। এখন জানলুম !

—এখানে এলে টাকা খসাতে হয় তা জানেন তো ? না কি তাও জানেন না ?

দেবদাস বললে—হ্যাঁ, তা শুনেছি অন্য লোকের কাছ থেকে।

—আপনি কখনও কোনও বেশ্যা-বাড়ি যাননি ?

দেবদাস বললে—না—

লোকটা বললে—তাহলে কি ভেবেছিলেন মা-কালীর মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন ? আমার বাড়ি কি আমি আগে জানলে এই বেশ্যাকে ভাড়া দিতুম ? ভাবলাম গরীব মেয়েটার থাকবার ঘর নেই ? একেই ভাড়া দিই ঘরটা ! তা তখন তো জানি না এ মেয়েটা খানকী !

দেবদাস বললে—গালাগালি দেবেন না, যা বলবার ভদ্র ভাষায় বলুন। আপনি ভদ্রলোক, এই ময়নাও ভদ্র-মহিলা। ঘর-ভাড়ার টাকা আদায় করতে এসেছেন, ঘর-ভাড়া আদায় করুন। গালাগালি দেবেন না—

লোকটা বললে—আরে, এ-যে ভুতের মুখে রাম-নাম শুনছি। খানকীকে খানকী বলেছি তো কী অন্যায় করেছি ? এতই যদি ভদ্রতা-বোধ তাহলে এখানে ফুর্তি করতে এসেছেন কেন ?

দেবদাস বললে—আমি ফুর্তি করতে আসিনি ! এই মেয়েটা আমায় ডেকেছে বলে আমি এসেছি—

—কী ? এ ডেকেছে বলে এসেছেন ?

—হ্যাঁ, এটা বেশ্যা-বাড়ি জানলে আমি আসতুম না।

লোকটা বললে—আপনি দেখছি একেবারে ধোয়া-তুলসীপাতা ! আমি এ-বাড়ির মালিক আর এই বেশ্যাটা আমার ভাড়াটে। এ যদি এখ্খুনি বাড়ি ছেড়ে দেয় তো এই বাড়িই ভাড়া দেব মাসে পঞ্চাশ টাকায়। আর যদি এ আমার বাড়ি ছেড়ে না দেয় তো আমি বাদাম-

তলার মস্তানদের দিয়ে এর খাট-বিছানা-ঘটি-বাটি সব তুলে রাস্তায় ফেলে দেব।

মেয়েটা এবার কান্নায় ভেঙে পড়লো।

বলতে লাগলো—না বড়বাবু, ও-রকম করবেন না, ও-রকম করলে আমি কোথায় যাবো, কী খাবো? সংসারে নিজের বলতে যে আমার কেউ নেই। আমি বেশ্যা নই বড়বাবু, আমি ভাগ্যের ফেরে এই রাস্তা বেছে নিয়েছি। দেশের লোকরা আমায় চাকরি দেবে বলে ধোঁকা দিয়ে এই রাস্তায় এনেছে। সত্যি বলছি বড়বাবু, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি ভদ্দর-ঘরের গেরস্ত মেয়ে। আমার মা-বাপ কেউ নেই, আমি অন্য কোনও রাস্তা না পেয়ে এই লাইনে এসেছি। আমার শরীরটাকে একটু সারতে দিন, তখন আপনাব সব টাকা শোধ করে দেব, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—এবারের মতো আমার ওপর একটু দয়া করুন। আমি অনাথ মেয়ে, আমাকে আর কিছুদিন সময় দিন, আপনার দেনা সব কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দেব।

বলতে বলতে ময়না বাড়িওয়ালা লোকটার পায়ের ওপর পড়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

এবার আর দেবদাস চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না।

মাঝখানে গিয়ে ভদ্রলোকের হাতটা ধরে ফেললে। বললে—আপনি কি কশাই না মানুষ? শুনলেন না মেয়েটা সবে জ্বর থেকে উঠেছে, ও তো বলছে, ও আপনার বাকি-বকেয়া সব টাকা মিটিয়ে দেবে, আর কিছুদিন সময় দিন না ওকে—

লোকটা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—আপনি কে মশাই? আমাদের বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের ব্যাপারের মধ্যে আপনি কেন নাক গলাচ্ছেন? আর অতোই যদি দরদ তো আপনি ওর তিন মাসের ভাড়ার পাওনা মিটিয়ে দিন না—

—কতো টাকা?

—তিন তিরিশং নব্বুই টাকা দিয়ে দিন, আমি চলে যাই। তখন আপনি যতো ইচ্ছে মদ খান, ফুর্তি করুন, আমি কিছু বলতে আসছি না—

দেবদাস শার্টের পকেটে হাত দিয়ে সব টাকাগুলো বার করলে।

—আমার কাছে এখন তো অতো টাকা নেই, এই তেরোটা টাকা আছে, এটা এখন নিন, পরে বাকিটা দিয়ে যাবো। আপনার ঠিকানাটা বলুন, আমি মাইনে পেলেই সেই ঠিকানায় গিয়ে সব টাকা মিটিয়ে দিলেই তো হলো?

লোকটা তেরোটা টাকাই গুনে পকেটে পুরলো। তারপর দেবদাসকে তার বাড়ির ঠিকানাটা লিখে নিতে বললো—

লোকটা চলে যেতেই দেবদাস মেয়েটাকে বললে—এবার ওঠো। আমি তোমার বাড়ি-ভাড়াটা মিটিয়ে দেব। ওঠো, আর কেঁদো না—

ময়না উঠে বসলো।

তারপর গলায় আঁচল দিয়ে বললে—দাঁড়ান, আমি আপনাকে পেন্নাম করি—

দেবদাস পেছনে সরে এলো। বললে—না না, প্রণাম করতে হবে না। তুমি কেন এলে এ-লাইনে?

ময়না কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো—আমি কি সাধ করে এ-লাইনে এসেছি বাবু? আমার মা ছিল না, বাপ-ভাই-বোন কেউ ছিল না। আমি গাঁয়ে ছিলুম, একদিন নয়ান পিসী এসে জিজ্ঞেস করলে—তুই চাকরি করবি ময়না? আমি তখন রাজি হয়ে গেলুম—

—তারপর?

—তার পরের কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না বাবু! তারপর বাদাম-তলায় এলুম, তখন সব্বোনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। তখন এ-লাইন ছাড়া আর গতি ছিল না—

দেবদাস আর পীড়াপীড়ি করলে না।

বললে—তুমি এ-লাইন ছেড়ে দাও—

—এ-লাইন ছেড়ে দিলে আমি কী খাবো ?

দেবদাস বললে—আমি তোমাকে খাওয়াবো ! আমি তোমাকে মাসে-মাসে খাই-খরচা দেব, আর বাড়ি-ভাড়ার টাকাও দেব—

—কিন্তু সে তো অনেক টাকা। প্রায় তিনশো টাকার ওপর—তুমি সব দেবে ?

দেবদাস বললে—তা হোক, আমি তোমাকে তোমার খাই-খরচা বাড়ি-ভাড়া সব জোগাবো !

—আর তোমার নিজের খরচ কিসে চলবে ? তোমার বাড়িতে কে-কে আছে ?

দেবদাস বললে—আমার বাড়িতে আমার বউ আছে, দু'টো ছোট-ছোট মেয়ে আছে, আর আমার এক ছোট ভাই আছে, আর আছে একজন ঝি।

—তাহলে সে-সব খরচ চলবে কী করে ?

দেবদাস বললে—তার জন্যে ভাবনা নেই। আমার বউ চাকরি করে। দেড় হাজার টাকা মাইনে পায়, ছোট ভাইটাও হাজার-খানেক টাকা মাইনে পায়—

—বাড়ি-ভাড়া কতো দিতে হয় ?

দেবদাস বললে—বাড়ির ভাড়া দিতে হয় না। আমাদের নিজেদের বাড়ি। দোতলা। একতলায় একটা দোকান আছে, তারও ভাড়া পাই।

—আর তুমি কতো মাইনে পাও ?

—আঠারো শো।

ময়না বললে—তাহলে তোমাদের বাড়িতে আমাকে একটা ঝি-এর চাকরি দাও না। আমি কোনও মাইনে চাই না। শুধু খাওয়া-পরাটা দিলেই চলবে। আমি তোমাদের সকলের কাপড় কাচবো, এঁটো বাসন-কোসন মাজবো, বাজার করে দেব, ঘর-দোর মুছবো। যা হুকুম করবে

তাই-ই করে দেব। দেবে ?

দেবদাস বললে—দেখি ভেবে—

ময়না বললে—মনে কোরো না আমি বেজাতের মেয়ে। আমি কায়স্থ। বিপদে পড়ে এই কুকাজ করছি। তুমি যদি আমাকে তোমার বাড়িতে ঝি-এর কাজ দাও তো আমি বেঁচে যাবো—দেবে ?

দেবদাস বললে—দেখি ভেবে—

—তাহলে আমাকে জানাবে তো ?

দেবদাস বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয় জানাবো। কিন্তু আজকে তো তোমাকে টাকা-কড়ি কিছু দিয়ে যেতে পারলুম না—যা ছিল পকেটে সব তো তোমার বাড়িওয়ালাকে দিয়ে দিলুম, তুমি তো দেখলে—বাকি টাকাও দিয়ে দেব কথা দিয়েছি—

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—ঝামেলার মধ্যে আজ তো তোমার খদ্দের এলো না, তাহলে আজ রাত্তিরে কী খাবে ?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি জানা-শোনা খদ্দের, আমাকে এ-পাড়ায় ধারে খাবার দেওয়ার দোকানদারের অভাব নেই—

দেবদাস আর দাঁড়ালো না। বললে—চলি—

তবু পেছন থেকে ময়না আবার কথাটা মনে করিয়ে দিলে। বললে—তা হলে কবে খবর দেবে ?

—কীসের খবর ?

ময়না বললে—ওই-যে তোমায় বললুম ! এরই মধ্যে ভুলে গেলে ? তোমাদের বাড়িতে ঝি-এর চাকরি দেবার কথা ?

দেবদাস বললে—ভেবে দেখি—

বলে হন্ হন্ করে রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

১১১

—রাজাবাবু, চার আনা পয়সা দিন না, রাজাবাবু, ও রাজাবাবু—

দেবদাসের মনে হলো গলার আওয়াজটা যেন চেনা-চেনা! তখন সন্ধ্যে নেমে এসেছে বাদামতলায়। রাস্তার আলোগুলোও সব জ্বলছে না।

—ও রাজাবাবু, রাজাবাবু—

দেবদাস লোকটার কাছাকাছি নিজের মুখটা নিয়ে গেল। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতেই কী যেন সন্দেহ হলো।

জিজ্ঞেস করলে—কে তুমি? রাখাল না?

—হ্যাঁ রাজাবাবু, চার আনা পয়সা দেবেন?

দেবদাস বললে—তুমি এখনও চার আনা পয়সা ভিক্ষে করছো? এখনও অভাব ঘোচেনি?

রাখাল বললে—আমাদের অভাব কোনও কালে ঘুচবে না রাজা-বাবু, আমাদের কথা কেউ ভাবে না—

দেবদাস বললে—সে-দিন তো তোমায় গড়িয়াহাটে দেখেছিলুম, আজ আবার এই বাদামতলায় দেখছি। তুমি কি সব জায়গায় যাও নাকি?

রাখাল বললে—আমার তো এই বাদামতলাতেই বাড়ি, আমি তো এখানেই থাকি—

—তা ভিক্ষে করতে অতদূরে যাও?

রাখাল বললে—এক এক দিন এক এক জায়গায় যাই। রোজ এক জায়গায় গিয়ে ভিক্ষে চাইলে লোকে যে বিরক্ত হয়ে যাবে!

—তা ভিক্ষে না করে ফুচকা কিম্বা চানাচুর ফেরি করতে পারো তো! তাতে তো শুনেছি অনেক লাভ হয়।

রাখাল বললে—তাতেও তো পয়সা দিয়ে মালপত্তোর কিনতে হবে! সে-পয়সা কে দেবে?

—তাহলে রিক্‌শা চালাও না কেন? সাইকেল-রিক্‌শা?

—সে রাজাবাবু কে আমাকে দেবে? আমি গরীব লোক, কে

আমাকে বিশ্বাস করবে?

এর জবাব কী দেবে তা বুঝতে পারলে না দেবদাস। তাই চুপ করে রইল।

রাখাল বললে—একবার আসবেন আমার ঝুপড়িতে?

—কোথায় তোমার ঝুপড়ি?

—এই তো পাশের ফুটপাতেই। একবার দেখেই যান না আমরা কী অবস্থায় থাকি!

—কতো দূর এখান থেকে?

রাখাল বললে—ওই তো, চেয়ে দেখুন, ওই যে চট ঝুলছে। ওইটেই আমার ঝুপড়ি—

—চলো—

সত্যিই সে এক অবাক দৃশ্য! যেখানটায় গঙ্গার ওপর দিয়ে পুল উঁচু হতে আরম্ভ করেছে সেখানেই যত রেলিং-এর ধার ঘেঁষে সার সার ঝুপড়ি বানিয়ে নিয়েছে লোকরা।

—এরা কারা?

রাখাল বললে—এরা সবাই আমার মতোন ভিখিরি। এদের মধ্যে অনেকেই পাড়ার বাবুদের বাড়িতে বাড়িতে ঝি-গিরি করে আর বেটাছেলেরা ভিক্ষে করে পেট চালায়—। কিন্তু আমার বউ-এর শরীর-গতিক খারাপ আর আমার ছেলে-মেয়েরাও ছোট, তাই কোনও কাজ পাই না বলে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে পেট চালাতে হয়—মুড়ি খেয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়।

তারপর একটু থেমে বললে—আসুন না রাজাবাবু, একবার আমার ঝুপড়িতে পায়ের ধুলো দিন না—

—আচ্ছা, চলো—

সামনে রাখাল চলেছে, আর পেছন-পেছন দেবদাস। এ-জগৎ আগে দেবদাস কখনও দ্যাখেনি। কোথাও চাটাই, কোথাও টিন, কোথাও চট,

কোথাও প্ল্যাস্টিকের টুকরো, এইসব দিয়ে ঝুপড়ি তৈরি হয়েছে। তারই মধ্যে অনেক ঝুপড়িতে রান্না হচ্ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বাতাস। তারই পাশ দিয়ে চলতে চলতে একটা জায়গায় এসে থামলো রাখাল।

বললে—এই-ই আমার ঝুপড়ি, রাজাবাবু—

দেবদাস প্রথমে কিছুই দেখতে পেলে না।

রাখাল কাকে উদ্দেশ করে বললে—ও গো, শুনছো, দেখ দেখ রাজাবাবু আমাদের বাড়ি দেখতে এসেছে, বেরিয়ে এসে দেখ—

কথাটা দু'বার বলতে হলো না। একজন মেয়েমানুষ ছাউনির তলায় মাথা নিচু করে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

রাখাল বললে—গড় করো। রাজাবাবুকে গড় করো—

তার মানে রাজাবাবুকে প্রণাম করো—

দেবদাস সরে আসবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার আগেই ভেতর থেকে বাচ্চাদের কান্না শোনা গেল—মা মুড়ি খাবো না, ভাত খাবো, ভাত দাও—

দৃশ্যটা দেখতে দেখতে তার মনটা কেমন অস্থির হয়ে উঠলো। সে আর সেখানে দাঁড়াতে পারলে না।

বললে—এখানে তোমরা কতো ঘর লোক আছো রাখাল?

রাখাল বললে—তা খান-পঞ্চাশেক ঘর আছে এখানে?

—কতো দিন ধরে সবাই আছো তোমরা?

রাখাল বললে—সেই যে-দিন থেকে দেশ ভাগ হয়ে গেল, সেই দিন থেকেই আছি সবাই—

—কতো দিন এখানে থাকবে তোমরা?

রাখাল বললে—তা কি বলতে পারি রাজাবাবু, ভগবান যদ্দিন রাখে আমাদের তদ্দিন-ই থাকবো। কে আর আমাদের ঘর-বাড়ি দিতে যাচ্ছে বলুন না—

—কেন ? গভর্নমেণ্ট ?

—গভর্মেণ্ট ? সে কে ? কোথায় পাবো তাকে ?

এর পরে আর কোনও কথা বলা চলে না। যারা গভর্মেণ্টের ঠিকানা জানে না, তাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই!

রাখাল বললে—অনেকে আমাদের ধর্মতলার দিকে দল বেঁধে নিয়ে গিয়েছে। তারা বলেছিল আমাদের ঘর বানিয়ে দেবে, আমাদের ভাত খেতে দেবে। তারা যা-যা বলতে বলেছিল আমরা তাই-তাই বলেছি। কখনও বলেছে—বলো বন্দেমাতারম, কখনও বলেছে—বলো ইনক্লাব জিন্দাবাদ। তারা যা বলতে বলেছে, আমরা তাই-ই বলেছি। কিন্তু এত বছর হয়ে গেল আমরা কিছুই পেলুম না। ঘরও পেলুম না, খেতেও পেলুম না। এর বেশি আমরা আর কী করতে পারি রাজাবাবু! তাই রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াই।

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—আর আমার ওই-যে বউটাকে দেখলেন, ও-ও হয়েছে তেমনি! দু'টো বাচ্চা বিয়োলে কেন বলুন তো? এই গরীবের ঘরে কি তোর দু'টো বাচ্চা বিয়োনো উচিত হলো? ওদের এখন কী খাওয়াই তাই বলুন রাজাবাবু? যতো নষ্টের গোড়া আমার ওই বউটা···

দেবদাস বললে—তা তার জন্যে তুমিও তো দায়ী—

রাখাল বললে—তা অবিশ্যি ঠিক বলেছেন রাজাবাবু। তাই যখন বাচ্চা-দু'টোকে খেতে দিতে পারি না, তখন বউটাকে গালাগালি দিই কিন্তু তার পরেই যখন হুঁস হয় তখন আবার আফসোস করি—

দেবদাস বললে—তুমি যদি রিক্‌শা চালাতে রাজি থাকো রাখাল তো আমি তোমাকে একটা রিক্‌শা কিনে দিতে পারি—রিক্‌শা চালাবে?

—আপনি রিক্‌শা কিনে দেবেন? সে যে অনেক দাম রাজাবাবু—

দেবদাস বললে—দামের কথা ভেবেই তো বলছি, এক মাসে হবে না। আরো অনেক খরচা আছে সামনে, তাই দু'তিন মাস সময় দাও

আমাকে, তার মধ্যেই তোমাকে একটা রিক্শা কিনে দেব আমি, কথা দিচ্ছি।

রাখাল আর তার বউ দু'জনেই দেবদাসের পা ছুঁতে এলো। কিন্তু দেবদাস তার আগেই সেখান থেকে সরে গেছে।

১১১

সেদিন পরিতোষ অফিস থেকে বাড়িতে ঢোকবার মুখে একটা দৃশ্য দেখে অবাক।

দেখলে বাড়ির একতলার পেছন দিকে খালি জমিটাতে দাদা মজুর লাগিয়ে একটা টিনের চাল লাগিয়ে দিচ্ছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা ভিখিরি। আর তার বউ, আর দু'টো বাচ্চা ছেলে।

পরিতোষ প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। ভেবেছে, দাদা বুঝি নতুন কোনও ভাড়াটে বসাচ্ছে।

—এখানে কী হচ্ছে দাদা ? নতুন ভাড়াটে বসাচ্ছো ?

দেবদাস পরিতোষকে দেখে বললে—হ্যাঁ রে—

—কতো ভাড়া ঠিক হলো ?

দেবদাস বললে—এ ভাড়া-টাড়া দিতে পারবে না, বড্ড গরীব লোক রে এ। ঝুপড়িতে থাকতো। রোজ ভাতও খেতে পেত না।

পরিতোষ অবাক।

বললে—তার মানে ? ভাড়া দেবে না ?

দেবদাস বললে—কোত্থেকে ভাড়া দেবে ? এরা কি আমাদের মতো বড়োলোক ? চেহারা দেখে বুঝতে পারছিস না ? জানিস, টাকার অভাবে ভাত না খেয়ে এরা রোজ মুড়ি খায়। এদের কাছে আবার ভাড়া নেব কী ?

পরিতোষ বললে—এ-জায়গাটা ভাড়া দিলে তো আমরা মাসে অন্ততঃ তিরিশটা টাকা পেতুম।

দেবদাস বললে—ওরে, তোর কাছে তিরিশটা টাকাই বড়ো হলো? আর এদের অভাবটা কিছু নয়?

—তা ওদের অভাব তো আমাদের কী?

দেবদাস বললে—বা রে বা, তোর তো বেশ কথা! সবাই অভাবে কষ্ট পাবে আর আমরা আরামে থাকবো, এটা হয় নাকি?

—সেইটেই তো বরাবর হয়ে আসছে। এ তো চিরকাল হয়ে আসছে!

দেবদাস বললে—তা যদি হয়ও তো তাহলে সেটা বন্ধ করতে হবে। সে-নিয়ম চলতে দেওয়া উচিত নয়—

পরিতোষ বললে—এরকম করে কতো লোকের অভাব মেটাবে?

—যতোগুলো লোকের অভাব মেটাতে পারি ততোটা আমি করি। এর পরে যা করবার তা গভর্মেণ্ট করুক—

এর পরে পরিতোষ আর কী বলবে?

তবু বললে—এরা তো পায়খানা ব্যবহার করবে, জল ব্যবহার করবে, তার খরচা কার ঘাড়ে পড়বে?

—সে-খরচ এখন আমরা যোগাবো। তারপর যখন ওদের অবস্থা ভালো হবে তখন ওরাই সেই খরচা দেবে।

—ওদের অবস্থা কোনও কালে ভালো হবে?

দেবদাস বললে—হবে হবে, ওই ভাখ্ না—ওই-যে একটা নতুন সাইকেল-রিক্‌শা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওটা ওই রাখালের। ওটা আমি আঠারো-শো টাকায় কিনে দিয়েছি। ওটা চালিয়ে যখন অনেক পয়সা উপায় করবে, তখন ও বাড়ি-ভাড়া দেবে—

পরিতোষ এ-কথার জবাবে কী বলবে বুঝতে পারলে না। হাঁ করে দেখতে লাগলো দাদার মুখের দিকে।

তারপর বার-বার সাইকেল-রিক্‌শাটার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। একেবারে টাটকা নতুন সাইকেল-রিক্‌শা।

জিজ্ঞেস করলে—তুমি ওটা কিনে দিলে? বলছো কী? আঠারো-শো টাকা দিয়ে?

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। আমার এক মাসের পুরো মাইনেটা দিয়ে দিলুম রাখালের অভাব ঘোচাবার জন্যে—

—ওই ছোটলোকটার জন্যে তুমি এত টাকা দিলে?

—ছোটলোক বলছিস কেন? বল্ অভাবগ্রস্ত লোক, বল্ গরীব লোক!

এসব কথার মানে বোঝে না পরিতোষের মতোন মানুষরা। পরিতোষ রেগে গেল দাদার ওপর।

বললে—জানো, এ-জায়গাটা ভাড়া দিলে মাসে কতো টাকা ভাড়া আসতো!

দেবদাসও রাগতে জানে!

বললো—তোরা কি পৃথিবীতে টাকা ছাড়া আর কিছুই বুঝিসনে?

—আচ্ছা, আমি বলছি গিয়ে বউদিকে তোমার কাণ্ড।

বলেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু দেবদাস বললে—তোর বউদি সব জানে রে, তুই কি ভাবছিস তোর বউদিকে কিছু না জানিয়ে নিজের খুশীমতো রাখালকে থাকতে দিচ্ছি আর তাকে আঠারো-শো টাকা দিয়ে সাইকেল-রিক্শা কিনে দিয়েছি?

কথাটা শুনে পরিতোষ খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে সেই সিঁড়ির ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। আর তার পর হন্-হন্ করে সোজা দোতলায় উঠে গিয়ে বউদির ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে—বউদি, অ বউদি—

বউদির বদলে বেরিয়ে এলো সারদা।

সারদা এ-বাড়ির অনেকদিনের ঝি। কিন্তু আগেকার মতো আর তেমন গায়ে শক্তি নেই। দেবদাস আর পরিতোষকে সে-ই মা মারা

যাওয়ার পর থেকে নিজের হাতে মানুষ করেছে।

পরিতোষ জিজ্ঞেস করলে—বউদি কোথায় গো সারদাদি ?

—বউমা তো এখনও ইস্কুল থেকে আসেনি।

—কেন ? আজ এতক্ষণ দেরি হচ্ছে কেন বউদির বাড়ি আসতে ?

সারদাদি বললে—বউমা বলে গিয়েছিল আজ ইস্কুলে কী একটা আছে, বাড়ি ফিরতে তার দেরি হবে।

—তুমি শুনেছ দাদা কী কাণ্ড বাঁধিয়েছে ?

—কী কাণ্ড ?

—বাড়ির পেছনের জায়গাটায় একটা ভিখিরিকে থাকতে দেওয়ার জন্যে টিনের চালের ঘর বানিয়ে দিচ্ছে—

সারদাদি বললে—হ্যাঁ, বউমা তো তা জানে। বউমাকে জিজ্ঞেস করেই দিয়েছে দেবু—

—বউদি সব জানে ?

—হ্যাঁ, জানে।

—কেন দিলে ? ও-জায়গাটায় ঘর করে দিলে মাসে পঞ্চাশ টাকা না হোক, তিরিশ টাকা করে ভাড়া আসতো ! সংসারের সাশ্রয় হতো।

সারদাদি বললে—তা সেটা তোমার দাদা-বউদিই জানে। আমি এ-বাড়ির কে ? আমাকে ও-সব কথা বলতে আসছো কেন ?

সারদাদি অনেকদিনের কাজের লোক। যখন পরিতোষের বাবা-মা বেঁচে ছিল তখন থেকে এ-বাড়িতে। তার ওপর কথা বলে এমন ক্ষমতা কারো নেই। এ-সংসার যে এখনও চলছে তা এই সারদাদি'র জন্যেই।

তাই পরিতোষ আর কিছু বললে না।

ওদিকে নিচে থেকে টিনের চাল লাগানো হচ্ছে। দেয়ালের গায়ে বাঁশ বাঁধা হচ্ছে। দেওয়ালে হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে—সেই শব্দ পরিতোষের কানে আসছে।

এতক্ষণে গীতা এসে হাজির হলো ইস্কুল থেকে।

পরিতোষ বললে—দেখেছো বউদি, একতলায় কী হচ্ছে ?

বউদি বললে—ওই কে এক রাখাল হালদারকে পেছনের জমিতে ঘর করে দিচ্ছে তোমার দাদা—

পরিতোষ বললে—ও ভাড়া দেবে ?

—না, ভাড়া দেবার ক্ষমতা তার নেই। খেতেই পায় না, তায় আবার ভাড়া দেবে !

পরিতোষ বললে—খেতে তো অনেক লোকই পায় না। তা বেছে বেছে এই রাখাল হালদারকেই-বা কেন ঘর করে দিচ্ছে দাদা ?

বউদি বললে—তুমি তো ঠাকুরপো চেনো তোমার দাদাকে। তাহলে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন ?

—তা তুমি এসব ব্যাপারে একটু শক্ত হতে পারো না ? তুমি শক্ত না হলে যে সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। এখন থেকে তো একটু শক্ত হতে হবে। আমার দুটো ভাইঝি'র তো একদিন বয়েস হবে, তখন তো তাদের বিয়েও দিতে হবে। আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি সোজা ব্যাপার !

এসব ব্যাপার নিয়ে বউদি কোনও দিনই মাথা ঘামায়নি। বলতে গেলে সেও প্রায় দেবদাসের মতোন স্বভাবের মানুষ। যা হবে তা হবে, তার জন্যে এখন থেকে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ ?

পরিতোষ আমাদের মতো হিসেবী মানুষ। সে সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সব কাজ করে। সে জানে ভবিষ্যতে দুর্দিন আসছে। এখন থেকে টাকা জমাও। ভবিষ্যতে জিনিসপত্রের দাম আরো বাড়বে। যে-অনুপাতে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে সে-অনুপাতে আমাদের মাইনেও বাড়বে না, পেন্‌শন্ থাকলে পেন্‌শন্‌ও বাড়বে না। সুতরাং হিসেব করে চলো, আর পারলে এখন থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করো।

১১১

এদিকে রাখাল হালদার বাড়ির পেছনে গুছিয়ে বসে পড়েছে।

ছেলে-মেয়ে-বউ আর নিজে এখন আর দু'বেলা মুড়ি খেয়ে কাটায় না। সাইকেল-রিক্‌শা চালিয়ে বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছে। আর সময় পেলেই দেবদাসকেও এখানে-ওখানে বয়ে নিয়েও যাচ্ছে।

দেবদাস যদি কোথাও রাখালকে সাইকেল-রিক্‌শা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ছাখে তো জিজ্ঞেস করে—কেমন আমদানি হচ্ছে তোমার রাখাল ?

—আপনার আশীর্বাদে এখন ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভাত খেতে পাচ্ছি—

—আগেকার মতো আর মুড়ি খেয়ে কাটাতে হচ্ছে না তো ?

রাখাল বলে—না রাজাবাবু, আপনার দয়ায় এখন ভালোই আছি। এখন আর ছাউনি দিয়ে মাথার ওপর জল পড়ে না—

দেবদাস বলে—কিছু কিছু করে পয়সা জমাও। যখন সাইকেল মেরামত করতে হবে তখন তো সারাতে হবে। তখন পয়সা কোথায় পাবে ? আমি তো আর চিরকাল থাকবো না—

রাখাল বলে—না রাজাবাবু, আপনি ও-কথা বলবেন না। ও-কথা শুনলে আমার বড়ো কষ্ট হয়।

দেবদাস বলে—না গো রাখাল, না। আমি অনেক দেখেছি, এখনও দেখছি। কে কতোদিন থাকবে কেউ বলতে পারে না। এই দেখ-না আমার সারদাদি'কে দেখেছ তো ?

—হ্যাঁ, দেখছি বই কি !

—আমার বাবা-মা যখন মারা যায় তখন ওই সারদাদি ছিল বলেই আমরা বেঁচে আছি। ওই সারদাদি'ই আমাদের মানুষ করেছে। সংসারে ওর নিজের বলতে কেউ-ই নেই। আমরাই ওর সব। সেই তারই এখন অসুখ করেছে। যার কখনও কোনও অসুখ করে না, তার অসুখই হলো বিপদের অসুখ। তার জন্যেই সকলের ভয় হয়। তাই আমরা সবাই

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছি। তাই আমি ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে যাচ্ছি—

রাখাল বললে—তা হেঁটে হেঁটে যাবেন কেন? আমার রিক্‌শাতেই চলুন না—এ তো বলতে গেলে আপনারই নিজের রিক্‌শা—

দেবদাস তার কথা না শুনে হেঁটেই চলতে লাগলো সামনের দিকে। বললে— না রাখাল, তোমার লোকসান করতে চাইনে—বেশি দূর নয়, আমি হেঁটেই যেতে পারবো—

রাখাল রাজাবাবুকে যতোই দেখতো ততোই অবাক হয়ে যেতো —এমন বাবু তো আগে বাদামতলায় কখনও দ্যাখেনি রাখাল। রিক্‌শা কিনে দিলে, বাড়ি বানিয়ে দিলে কিন্তু তার বদলে কোনও প্রতিদান নেবে না। এ কেমন রাজাবাবু!

কিন্তু ততোদিনে দেবদাসের বাড়িতে বিপদের সঙ্কেত দেখা গেছে।

কীসের বিপদ?

সেই সারদাদি'র অসুখ তখন খুব বেড়ে গিয়েছে। সারদাদি নিঃসম্পর্কীয় মানুষ। সে বলতে গেলে এ-বাড়ির কেউ-ই না। তার অসুখ-বিসুখের সঙ্গে এ-বাড়ির কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। সম্পর্ক শুধু কাজের। তাকে মাইনেও দিতে হয় না। বা সে মাইনে বলতে যা বোঝায় তা সে নেয়ও না। সুতরাং মাইনে তাকে কেউ কোনও কালেই দেয় না। নিজেদের লোককে কি কেউ মাইনে দেয়?

যেমন রাখাল। রাখাল হালদার তার কাছে কি কেউ বাড়ি-ভাড়া চায়?

তা সেই সারদাদি'র অসুখ হওয়া মানে সংসার অচল হওয়া। গীতার ইস্কুল কামাই হওয়া, দেবদাসের অফিস কামাই হওয়া, পরিতোষের বাজার করতে যাওয়া।

আর রান্না?

পাঁচটা প্রাণী তো উপোস করে থাকতে পারে না!

তাদের খাওয়া ছাড়া বাসন-কোসন মাজাও আছে তার সঙ্গে।

এসব এতকাল সারদাদি'কেই করতে হতো এককালে। কেউ বুঝতেও পারতো না সংসার চালানোর পেছনে এসব কাজ কে নিঃশব্দে করে চলেছে।

কিন্তু যেই সারদাদি'র অসুখ হলো তখন সকলের টনক নড়লো। পরিতোষের ঠিক সময়ে অফিসে যাওয়া হয় না। সে রাগে গজ্-গজ করে।

কিন্তু গজ্-গজ্ করে কী হবে? তাকেও ডাক্তারবাবুকে গিয়ে সব খবরা-খবর দিতে হয়।

আর রাখাল?

সেও বাড়ির কাজে হাত লাগায়। তার বউও এসে ঘর-দোর মুছে দিয়ে যায়। বলতে গেলে রাখালের বউও একেবারে ঘরের লোক হয়ে গেল।

শেষকালে একদিন সারদাদি'র কথা বন্ধ হয়ে গেল।

সারদাদি'কে দিনের বেলা কেউ কখনও শুয়ে থাকতে দেখেনি। সেই মানুষটা তখন নিজের ঘরে অসাড় হয়ে শুয়ে ছিল।

দেবদাস ডাকলে—ও সারদা'দি, সারদা'দি—

কেউ কোনও উত্তর দিলে না। বার-বার ডেকেও যখন উত্তর পাওয়া গেল না তখন ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হলো। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করেই বললেন—আর কিছু করবার নেই— বলে চলে গেলেন।

দেবদাসের সংসারে অন্ধকার নেমে এলো।

১১১

যতোক্ষণ মানুষ কাজ করতে পারে ততক্ষণই মানুষের কদর। যতোক্ষণ অন্ধকার থাকে ততোক্ষণই আলোর কদর। অন্ধকার কেটে গিয়ে যখন সকাল হয় তখন আলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

যাদের জীবনে বরাবরই অন্ধকার তাদের আলো বরাবরই অনিবার্য। দেবদাসের সংসারে সারদাদি'র প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। কিন্তু কেউ তার কদর বুঝতো না।

সেইজন্যেই একটা কথার প্রচলন আছে যে দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্যাদা দেয় না।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গেলে তখন সবাই বুঝতে পারলে সারদাদি এ-সংসারের পক্ষে কতখানি অনিবার্য ছিল।

কিন্তু চরম সত্য কথাটা হলো এই যে সংসারে কোনও মানুষই অনিবার্য নয়। তাই সারদাদি চলে গেলে দেবদাস আর একজন কাজের মেয়ে নিয়ে এলো।

গীতা জিজ্ঞেস করলে—একে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলে ?

দেবদাস বললে—এমনি পেলুম। কাজের লোকের কি অভাব ? টাকা ফেললে লোকের অভাব নেই কোথাও—

—এর নাম কী ?

দেবদাস বললে—রাধা।

—কতো মাইনে নেবে এ ?

রাধা বললে—আমার মাইনের দরকার নেই। শুধু খাওয়া-পরা পেলেই চলবে।

—তোমার দেশ কোথায় ?

—নবদ্বীপ।

—বাড়িতে কে-কে আছে তোমার ?

রাধা বললে—নিজের বাবা-মা-ভাই-বোন বলতে কেউ নেই। খুড়তুতো ভাইরা আছে—

—এ-বাড়িতে কিন্তু সব কাজ তোমাকে করতে হবে। আমি ইস্কুলে চাকরি করি। আমার দেওর খেয়ে অফিসে যাবে, তারপর বাবুও খেয়ে অফিসে যাবে। আর তারপর আছে রুমা ঝুমা, আমার দুই মেয়ে।

তাদের চান করানো খাওয়ানো। সকালের কাপড়-জামা কাচাকাচি, এঁটো বাসন-কোসন মাজা। ঘর-দোর ঝাঁট দেওয়া মোছা আর তার সঙ্গে আছে বাজার করা। সব করতে পারবে তো বাছা?

রাধা বললে—হ্যাঁ, আমি সব কাজ পারবো!

দেবদাসও বললে—হ্যাঁ, ও খুব বিশ্বাসী মেয়ে, আমাকে যে দিয়েছে, সে বলেছে—

তা তাই-ই হলো। সেই দিন থেকেই রাধা বহাল হয়ে গেল দেবদাসের বাড়িতে।

সবাই নিশ্চিন্ত হলো রাধার কথা শুনে। কয়েকদিন বাদে রাধার কাজে সবাই খুশী।

দেবদাস গীতাকে জিজ্ঞেস করলে—কী রকম কাজ করছে রাধা?

গীতা বললে—বড়ো কাজের মেয়ে রাধা। সারদাদি মারা যাওয়ার পর বড্ড ভাবনা হয়েছিল আমার। ভয় হচ্ছিল শেষকালে আমাকে চাকরি না ছাড়তে হয়! কিন্তু এখন দেখছি সারদাদি'র চেয়েও রাধা বড়ো ভালো মেয়ে—। কিন্তু একটা ভয়—

—কী ভয়?

গীতা বললে—যদি বিয়ে হলে কাজ ছেড়ে চলে যায়?

দেবদাস বললে—আরে, তুমিও যেমন, গরীব মেয়েদের আবার বিয়ে? ওদের কে-ই-বা বিয়ে করছে আর কে-ই-বা বিয়ে দিচ্ছে! ও-ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—

সুতরাং সবাই নিশ্চিন্ত হলো।

রাধা আসবার পর থেকে আর কারো কোনও অসুবিধে হলো না। সারদাদি যতোদিন ছিল এ-বাড়িতে ততোদিন ভালোই চলছিল এ-সংসার। কিন্তু সারদাদি মারা যাওয়ার পর সবাই যা ভয় করেছিল তা হলো না। বরং আরো সুষ্ঠুভাবে জীবন চলতে লাগলো সকলের। বরং আরো সস্তা দরে আনাজ-পাতি কিনে আনতে লাগলো বাজার

থেকে। বাজার-খরচ আরো কমে গেল। রুমা-ঝুমাকে দু'দিনের মধ্যে আপন করে নিলে রাধা। গীতা ইস্কুল থেকে অনেক দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে আসতো বাড়িতে। কিন্তু বাড়িতে এসে দেখতো তারা রাধাকে জড়িয়ে ধরে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। রাধা-ই যেন তাদের মা হয়ে উঠেছে। ঠিক সময়ে তাদের খাইয়েছে, ঠিক সময়ে তাদের ঘুম পাড়িয়েছে, ঠিক ঠিক সময়ে তাদের জাগিয়েছে। অথচ তারই মধ্যে ভাত রাঁধা, বাসন-কোসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, ময়লা কাপড়-চোপড় কাচা, শুকিয়ে তুলে রাখা, সব কিছু ঠিকঠাক করে রেখেছে।

দেবদাস বাড়িতে এসে গীতাকে জিজ্ঞেস করতো—রাধা কী রকম কাজ করছে?

গীতা বলতো—চমৎকার, চমৎকার—

পরিতোষ-যে-পরিতোষ, সেও খুশী। সেও বলতো—দাদা, তুমি যে এত ভালো কাজের লোক আনতে পারবে তা আমি ভাবতে পারিনি! অথচ, একটা পয়সা মাইনে নেয় না—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবদাস কাউকেই যে খুশী করতে পারবে না সে-কথা কি দেবদাস কোনও দিন কল্পনা করতে পেরেছিল?

সকলের ভালো করবার বাসনাও তো এক ধরনের লোভ! কথায় আছে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এ-কথাটা সবাই ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি। কিন্তু কথাটা কেউই পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি বা বিশ্বাস করতে চায়নি। যে বিশ্বাস করে তা কাজে প্রমাণ করতে চেয়েছে সে-ই শাস্তি পেয়ে এসেছে। যে-মানুষ কারো দুরবস্থা দেখে তার ভালো চাকরি করে দিয়েছে, সেই মানুষটা চাকরি পাবার পর থেকেই চাকরি-দাতার সর্বনাশ করবার প্রয়াস চালিয়ে যাবার কথা ভেবে এসেছে। এমনকি ইনকাম-ট্যাক্স অফিস থেকে আরম্ভ করে পাড়ার গুণ্ডারা পর্যন্ত সৎ লোকদের পেছনে লেগেছে। আর যারা কালোবাজারী, যারা ষাট টাকা কিলো দরের মাছ বিক্রি করে বাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুষ

দিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছে তাদেরই সমাজ গুণী-জন-সম্বর্ধনার সামিল করে গলায় ফুলের মালা তুলে দেয়।

এই তো হলো বর্তমান যুগ।

এই যুগেই হঠাৎ একদিন দেবদাসের গলাও হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে তার ওপর কামারের খাঁড়া ওঠানো হলো।

অটলবাবু বাদামতলায় মান্য-গণ্য লোক। বাদামতলার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সময়ে হাজার-হাজার লোকের সামনে তাঁকে "গুণীজন সম্বর্ধনা" জানানো হয়েছিল।

সেদিন তাঁর সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ পরিতোষের দেখা হয়ে গেল।

পরিতোষের সঙ্গে দেখা হতেই অটলবাবু গাড়ি থামিয়ে দিতে হুকুম করলেন। ড্রাইভারকে বললেন—গাড়ি থামা, গাড়ি থামা হরিপদ—

পরিতোষ তাকে গাড়ি থামাতে দেখে তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এলো।

বললে—কী অটলদা, কেমন আছেন ?

অটলদা বললেন—তুই কোথায় যাচ্ছিস ?

—বাড়ি যাচ্ছি—

—তাহলে আয়, গাড়িতে বোস—তোর সঙ্গে কথা আছে।

পরিতোষ গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে।

অটলদা বললেন—তোদের বাড়িতে একজন নতুন ঝি এসেছে ?

পরিতোষ বললে—হ্যাঁ—সারদাদি মারা যাওয়ার পর এইটে খুব ভালো ঝি পেয়েছি—আমাদের খুব ভাবনা ছিল কাজের লোক নিয়ে। ভেবেছিলুম সারদাদি মারা যাওয়ার পর ভালো কাজের মেয়ে আর পাবো না। কিন্তু দাদা কোথা থেকে একে আনার পর আমাদের আর কোনও কষ্ট নেই। আমরা তিনজনেই তো যে-যার অফিসে চলে যাই, তখন বাড়িতে ভাইঝি'দের দেখাশোনার জন্যে একজন বিশ্বাসী লোক চাই। তা সেই বিশ্বাসী ঝি-ই পেয়ে গিয়েছি—

অটলদা জিজ্ঞেস করলেন—এ ঝি'টার নাম কী?

পরিতোষ বললে—রাধা—

—কে বললে 'রাধা'? ওর নাম তো ময়না।

পরিতোষ অবাক হয়ে গেল নামটা শুনে।

বললে—আপনি কী করে জানলেন? আপনি ওকে চেনেন নাকি?

অটলদা বললেন—ময়নাকে চিনবো না? ওই তো বাদামতলার সাত নম্বর বস্তীতে থাকে।

—সাত নম্বর বস্তী?

—হ্যাঁ রে, বাড়িওয়ালাকেও চিনি। ওকেও চিনি। সেদিন দেখলুম যে, ময়না অনেক বাজার করছে। তারপর একজনকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে ময়না এখন আর ও-বস্তীতে থাকে না, ও-ঘর ছেড়ে এখন গেরস্ত বাড়িতে চাকরি করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কোন্ গেরস্ত-বাড়ির? তখন 'দেবদাসে'র নাম করলে—

পরিতোষ বললে—কিন্তু ও যে বললে ওর নাম রাধা!

অটলদা বললে—তাহলে নাম ভাঁড়িয়েছে। ওর আসল নাম 'ময়না'।—। ও একেবারে খানদানী বেশ্যা। তার হাতে ছোঁয়া জল তোরা খাচ্ছিস? যাক্‌গে, যা তোরা ভালো বুঝেছিস তাই করেছিস! আমার কথা শুনে তোদের লাভ কী?

ততোক্ষণে পরিতোষের বাড়ি এসে গিয়েছিল। গাড়ি থামতেই সে নেমে পড়লো।

বাড়িতে গিয়ে দেখলে বউদি তখন রুমা-ঝুমাকে জলখাবার খাওয়াচ্ছে। আর রাধা রান্না চড়িয়েছে উনুনে। একখানা একখানা করে পরোটা ভাজছে আর দিচ্ছে মেয়েদের, আর বউদি নিজেও খাচ্ছে।

পরিতোষকে দেখেই বউদি বললে—যাক্, ঠাকুরপো-ও এসে গেছে, ও রাধা, ছোড়দাকে দুটো পরোটা ভেজে দাও—

—না বউদি, আমি ওর হাতে খাবো না।

—কেন ঠাকুরপো, কী হলো ? খাবে না কেন ? খেয়ে এসেছ বুঝি ?

জামা ছাড়তে ছাড়তে পরিতোষ বললে—আমি বেশ্যার হাতের ছোঁয়া কিছ্ছু খাবো না আজ থেকে—

—কী বলছো তুমি ? কে বেশ্যা ? রাধা ?

পরিতোষ বললে—হ্যাঁ, রাধা—দাদা একটা বেশ্যাকে বাড়িতে ঢুকিয়ে আমাদের সকলের জাত মেরেছে। ওর হাতের ছোঁয়া তুমিও খেয়ো না, রুমা-ঝুমাকেও খেতে দিয়ো না। ও শুধু আমাদের জাত-ই মারেনি, আমাদের ইজ্জৎ-ও মেরেছে—

এমন সময়ে হঠাৎ ভেতরে ঢুকলো দেবদাস।

দেবদাস ঢুকতেই যেন জ্বলন্ত উনুনে ঘি পড়লো।

—কী হলো ? কী হয়েছে ? এত চেঁচামেচি কীসের ?

গীতা বললে—ওই শোন না, ঠাকুরপো কী বলছে।

দেবদাস পরিতোষের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী বলছে ও ?

—বলছে, ও নাকি রাধা নয়, ও ময়না !

পরিতোষ এবার বললে—বলছিই তো ও রাধা নয়, ওর নাম ময়না। বাদামতলার সাত নম্বর বস্তীতে ও বেশ্যাগিরি করতো। আমি কি মিছে কথা বলেছি ?

দেবদাস বললে—ওর নাম যদি রাধা না হয় তো নিজে কেন বলছে ওর নাম রাধা ! ও কি তাহলে মিথ্যেবাদী ?

পরিতোষ বললে—হ্যাঁ, মিথ্যেবাদী !

দেবদাস বললে—তুই বললেই আমি মেনে নেব, ও মিথ্যেবাদী ! প্রমাণ কী যে ও 'রাধা' নয় ?

তারপর দেবদাস রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে গেল রাধার আসল নাম। বললে—কী গো রাধা, তুমি কোথায় ?

রাধা তখন পাথরের মতো স্থির হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থর-থর করে